# ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা

বঙ্গমহিলা-প্রণীত।

"বাজ্‌রে শিঙ্গা বাজ্‌ এই রবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।"

কলিকাতা।

শ্রীসত্যপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী দ্বারা
প্রকাশিত।

PRINTED BY
J. N. BANERJEE & SON, BANERJEE PRESS,
119, OLD BOYTAKHANA BAZAR ROAD.

1885.

# প্রকাশকের মন্তব্য।

গ্রন্থকর্ত্রী স্বামীর সহিত ইংলণ্ডে আছেন। তাঁহার ইচ্ছায় তদীয় হস্তলিপি যথাযথ প্রকাশিত করিলাম। কদাচিৎ কোন একটি শব্দের পরিবর্ত্তন ভিন্ন তাঁহার লেখায় হস্তক্ষেপ করি নাই। নিজ গ্রন্থের প্রুব নিজে সংশোধন করিলে তাহা প্রায়ই নির্দ্দোষ হয় এবং তাহার উৎকর্ষ ও উজ্জ্বলতা বিশেষরূপে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অবস্থাগতিকে এ গ্রন্থের ভাগ্যে সে সুবিধা ঘটে নাই, কারণ গ্রন্থকর্ত্রী ইংলণ্ডে থাকায় তিনি ইহার একটিও প্রুব নিজে দেখিয়া দিতে পারেন নাই। সুতরাং মুদ্রাঙ্কনকালে তদীয় গ্রন্থের উৎকর্ষ বৃদ্ধি না হইয়া বরং অপকর্ষই ঘটিয়াছে। আশা করি, দ্বিতীয় সংস্করণের সময় তিনি ভারতবর্ষে থাকিবেন এবং তাঁহার "ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা" তিনি স্বয়ং দেখিয়া মুদ্রিত করিতে সক্ষম হইবেন।

এই গ্রন্থের ভাষা অতি সরল, প্রাঞ্জল ও মিষ্ট হইয়াছে। আমার মতে এইরূপ আড়ম্বরশূন্য ও উচ্ছ্বাসশূন্য সাদাসিদে ভাষায় পুস্তক লেখাই সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়।

গ্রন্থকর্ত্রী ইহাতে যাহা লিখিয়াছেন তাহার সকল অংশ ভ্রমশূন্য না হইলেও তাঁহার সুমহৎ ও সুপবিত্র উদ্দেশ্যের সহিত কাহারও বিরোধ বা অনৈক্য ঘটিতে পারে না। আমাদের ধর্ম্মক্ষেত্র ও কর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষ বহুকাল অধীনতাশৃঙ্খলে থাকিয়া ক্রমে একটি নির্জীব জড়পিণ্ড হইয়াছে। অন্নপূর্ণা ভারতমাতার সন্তানেরা আজি অন্নের জন্য লালায়িত। এ কষ্ট বোধ হয় সকলেই হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছেন। কিন্তু বুঝিলে কি হইবে, বহু দিন পরবশে থাকিয়া আমাদের হাড় পর্য্যন্ত মাটি হইয়াছে। এ মাটিতে পুনর্ব্বার জীবনীশক্তির

বীজ বপন করিতে হইলে সে বীজ কোন একটা জীবন্ত জাতির জলন্ত কর্ম্মক্ষেত্র হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে। ইংলণ্ড যে সেই জীবন্ত জাতির জলন্ত কর্ম্মক্ষেত্র, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ ইংলণ্ডের সহিত ভারতের অদৃষ্টসূত্রের যেরূপ সুদৃঢ় বন্ধন,তাহাতে ভারতের জন্য মৃতসঞ্জীবনী শক্তির উপাদান সংগ্রহ করিতে হইলে বর্ত্তমান অবস্থায় অগত্যা ইংলণ্ডেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। বোধ হয়, ইহাই গ্রন্থকর্ত্রীর উদ্দেশ্য। কিন্তু ইংলণ্ড হইতে সেই অমৃত-বীজ আনিবার পক্ষে একটি ভয়ানক বিপদ আছে। পাছে ভারতসন্তান অমূল্য ভারতীয় হৃদয় হারাইয়া সুধাভ্রমে গরল সংগ্রহ করিয়া আনেন, এই ভয় হয়। এ ভয়ও অমূলক নহে, কেননা দেখিতেছি যে বাহ্যজগতের প্রলোভন বড়ই দুর্জ্জয়। যে মহাপুরুষ "বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যম্" এই মহাবাক্যের অনুসরণ করিয়া বিষ হইতে অমৃত গ্রহণে সমর্থ হইবেন, তিনিই স্বাধীন ইংরাজজাতির অনুকরণ ও অনুশীলন দ্বারা ভারতের দুর্দ্দশা-মোচনে কৃতকার্য্য হইবেন; গ্রন্থকর্ত্রী এ বিষয়ও ইহাতে স্পষ্ট বুঝাইয়াছেন। এই নবীনা গ্রন্থকর্ত্রী দ্বারা আমরা মহোপকার লাভ করিলাম। তিনি একটি স্বাধীন জাতির ভিতর ও বাহির তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়াছেন—একটি স্বাধীন জাতির স্বাধীনতার নিদান উপাদানসকল এক একটি করিয়া চক্ষের উপর ধরিয়া দিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের আদ্যোপান্তই উপাদেয়; বিশেষতঃ শেষের অধ্যায়গুলি এতই উপকারী যে সে সকলের মূল্য নাই। তাঁহার "ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা" যে ভূয়োদর্শন, কঠোর পরিশ্রম ও অকৃত্রিম স্বজাতিপ্রেমের জাজ্বল্যমান প্রমাণ তাহা পাঠকমাত্রকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে।

কলিকাতা। ১লা আগষ্ট, ১৮৮৫।

শ্রীসত্যপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
প্রকাশক।

# সূচীপত্র।

### একাদশ অধ্যায়।



### দ্বাদশ অধ্যায়।



### ত্রয়োদশ অধ্যায়।



### চতুর্দ্দশ অধ্যায়।



### পঞ্চদশ অধ্যায়।



### ষোড়শ অধ্যায়।



### সপ্তদশ অধ্যায়।



### অষ্টাদশ অধ্যায়।



### ঊনবিংশ অধ্যায়।



### বিংশ অধ্যায়।



---

# ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা।

## প্রথম অধ্যায়।

### পূর্ব্ব কথা।

পাঠকপাঠিকাগণ! যদিও আমি আপনাদের নিকট একেবারে অপরিচিত এবং আপনাদের নিকট হইতে শত শত ক্রোশ দূরে রহিয়াছি, তথাপি আপনাদের চিত্তবিনোদনের আশায় আমি এত ক্ষুদ্র ও অসম্পূর্ণ অবস্থায় এই সামান্য পুস্তকখানি জনসমাজে বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমি গ্রন্থকর্ত্রী নাম পাইবার বা নিজের বিদ্যা বুদ্ধি প্রকাশ করিবার অভিলাষে এই পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করি নাই; অনেক নূতন দ্রব্য দেখিয়াছি এবং তদ্দর্শনে আমার মনে অনেক নূতন ভাবের উদয় হইয়াছে, কেবল সেইগুলি অবকাশমতে সরল ভাষায় যথাসাধ্য পরিষ্কার-রূপে বর্ণনা করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতেছি। ইহাতে সমাস, সন্ধি ও অলঙ্কারের আতিশয্য নাই, এবং এমন কোন ভাব নাই যে আপনারা নাটক বা উপন্যাস পড়িবার মত আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কেবল বই শেষ করিবার জন্য ব্যস্ত হইবেন। ইহাতে কোন মনের উত্তেজক বীরনারী অথবা বীর পুরুষের আখ্যায়িকা নাই, কোন আদি বা করুণ রসাত্মক কাব্যও নাই, কেবল স্বাধীন ও পরাধীন জীবনে কত প্রভেদ

তাহাই ইহাতে দেখিতে পাইবেন। এই পুস্তকে কোন অমূলক বিষয়ের বর্ণনা নাই, এবং আপনারা মনোযোগের সহিত ইহা পাঠ করিলে কিঞ্চিৎ উপকারও পাইতে পারেন, অন্ততঃ পড়িলে কোন ক্ষতি হইবে না। আজ কাল ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠতা ক্রমেই বাড়িতেছে। আর অনেক ভারতীয় যুবক ইংলণ্ডে আসিবার পূর্ব্বে এদেশের বিষয় জানিবার জন্য অতিশয় উৎসুক হন, অতএব অনেকে এই পুস্তক হইতে দুই একটী আবশ্যক বিষয় জানিতেও পারিবেন।

পাঠিকাগণ! আমিও আপনাদের ন্যায় একটী বাড়ীতে বদ্ধ ছিলাম; দেশের, পৃথিবীর কোন বিষয়ের সহিত সম্পর্ক ছিল না; সামান্য গুটিকতক জিনিসে মনকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিতাম কিন্তু পারিতাম না। দেশের সমস্ত ব্যাপার উত্তমরূপে জানিবার নিমিত্ত লালায়িত হইতাম, এবং কেহ বিলাত যাইতেছেন কিম্বা কেহ বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন শুনিলেই মন নাচিয়া উঠিত, বিদেশ হইতে প্রত্যাগত ব্যক্তিদের নিকটে গিয়া বিদেশ সম্বন্ধীয় নানা প্রকার নূতন বিষয় শুনিবার জন্য ব্যস্ত হইতাম; কিন্তু দুর্ভাগ্য পরাধীনা বঙ্গবাসিনীদের মনের ইচ্ছা পূর্ণ হয় না, সুতরাং চুপ্ করিয়া থাকিতাম। বোধ হয় ইংলণ্ডের বিষয় জানিবার নিমিত্ত আমার মত আপনাদের মধ্যে অনেকের মনে কৌতূহল জন্মে, সেই ইচ্ছা পরিতৃপ্ত করিবার বাসনায় আমি এই "ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলাকে" আপনাদের করে অর্পণ করিলাম।

(আমি এই পুস্তকে এদেশে ইংরাজদের ভাল মন্দ যাহা দেখিয়াছি তাহাই লিখিয়াছি; বিদেশে, বিশেষ ভারতবর্ষে ইহাদের

যে রূপান্তর হয়, তাহা সমস্ত মন হইতে দূর করিয়া যতদূর সাধ্য অপক্ষপাতীভাবে ইংরাজদের আচার ব্যবহার ইত্যাদি বর্ণনা করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যে যেরূপ অসীম প্রভেদ এবং ইংলণ্ডবাসীদের সহিত ভারতবাসীদের যেরূপ সম্বন্ধ, তাহাতে স্থিরচিত্তে ইংরাজদের গুণাগুণ পর্য্যালোচনা করা আমাদের পক্ষে অতি কঠিন ব্যাপার; অতএব পাঠকবর্গ যদি উঁহাদের সম্বন্ধে সমস্ত কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া উদারচিত্তে এই পুস্তকখানি পাঠ করেন. তাহা হইলে, অপক্ষপাত বিচারে আমি কতদূর সফল হইয়াছি ইহা বুঝিতে পারিবেন।)

এই পুস্তক রচনায় আমি কোন কোন বিষয়ে ইংরাজী গ্রন্থ, মাসিক পত্রিকা ও সংবাদপত্রের সাহায্য লইয়াছি এবং আচার ব্যবহার সম্বন্ধে দুই একজন বিশ্বাসী ইংরাজ বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়া যথার্থ কথা লিখিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমার কোন বিষয়ে ভ্রম হয় এই আশঙ্কায় ইংরাজেরা নিজে আপনাদের সম্বন্ধে কিরূপ বিচার করে এবং বিদেশীয়েরা ইহাদের দোষগুণ সম্বন্ধে কি বিবেচনা করে, তাহা জানিবার নিমিত্ত ইংরাজরচিত ও বিদেশীয় কর্ত্তৃক লিখিত কতকগুলি পুস্তক পাঠ করিয়াছি; ইহাদের মধ্যে বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত মসিও টেনের রচিত ইংলণ্ডসম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থ হইতে অনেক উপকার পাইয়াছি। শিক্ষা, রাজনীতি ইত্যাদি কয়েকটা বিষয়ে আমার স্বামী যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন; তিনি এই পুস্তকের আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া অনেক স্থল সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিয়াছেন [illegible] পরামর্শে [illegible]

বিষয় সন্নিবেশ করিয়াছি। তাঁহার যত্ন ও পরিশ্রম বিনা আমি কখনই এই পুস্তক বর্ত্তমান আকারে বাহিরে আনিতে পারিতাম না।

---

# দ্বিতীয় অধ্যায়।

## কলিকাতা হইতে বোম্বাই।

২৬শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার রাত্রি সাড়ে আট্টার সময় বোম্বাই হইয়া ইংলণ্ডে যাইবার জন্য আমার স্বামীর সহিত হাবড়া ষ্টেশনে আসিয়া কলিকাতা হইতে রওনা হইলাম। আজ আমি মুখ খুলিয়া কলের গাড়ীতে উঠিলাম। আজ আমি অনেক কষ্টে জন্মভূমির নিকট বিদায় লইয়া ইংলণ্ডে যাইতে প্রস্তুত হইয়াছি। মনে মনে কলিকাতার কাছে বিদায় লইলাম; গাড়ীর ঘণ্টা বাজিল, আমাদের ও অন্যান্য অনেক লোক লইয়া গাড়ী ঘড়্ ঘড়্ শব্দে ছুটিল; কলিকাতা, আত্মীয় পরিজনেরা সকলে পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। গাড়ীতে এত লোক আছে কিন্তু আমার মত কি কাহারও মনে এত কষ্ট হইতেছে? বোধ হয়, না। অনেকে বোম্বাই, জব্বলপুর, এলাহাবাদ ইত্যাদি স্থানে হাওয়া খাইতে ও বেড়াইতে যাইতেছে, আবার দুই এক মাস পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবে, আবার আত্মীয় লোকদের দেখিতে পাইবে, তবে তাহাদের কষ্ট হইবে কেন? আবার [illegible] [illegible]দেশ হইতে স্বদেশ যাই[illegible] ত কথাই

নাই; কিন্তু আমার মত কি কেহ স্বদেশ ছাড়িয়া অনেক দিনের জন্য বিদেশে যাইতেছে? বোধ হয়, না; তবে আমার এ কষ্টের সহিত আজ অন্য কাহারও কষ্টের তুলনা হয় না।

বাল্যসহচরী কলিকাতাকে ভাবিতে লাগিলাম; যদিও আমি কলিকাতায় জন্মাই নাই বটে, কিন্তু বিবাহ হইয়া অবধি আমি কলিকাতায় রহিয়াছি। অনেক বৎসর আমার ইহার সহিত আলাপ হইয়াছে, আজ সেই বহুদিনের বন্ধুত্বসূত্র কাটিয়া চলিলাম। দেখিতে দেখিতে হুগলী, ও বৰ্দ্ধমান ইত্যাদি ষ্টেশনে আসিতে লাগিলাম; ইহারা আমার পূর্ব্ব পরিচিত, আগে পিত্রালয়ে যাইবার সময় মুখ ঢাকিয়া এই ষ্টেশণ দিয়া যাইতাম, কই আজ আমার সে ঘোমটা কোথায়? ঘোমটা টানিতে গিয়া মাথায় টুপিতে হাত ঠেকাতে নিজের ভিন্ন পোষাক দেখিয়া মনে মনে একটু লজ্জা হইল। আজ আমাকে কোন পরিচিত লোক দেখিলে চিনিতে পারিবে না, হয়ত "মেম সাহেব" বলিয়া সেলাম করিবে অথবা ভয়ে সরিয়া যাইবে। কি আশ্চর্য্য! পোষাকে এত প্রভেদ!। ক্রমে ক্রমে রাত্রি গভীর হইল, কতক জাগিয়া ও ভাবিয়া আর কতক স্বপ্ন দেখিয়া রাত্রি কাটাইলাম। আবার দিন আসিল, দিনের সঙ্গে আমার মনও অনেক নূতন নূতন দৃশ্য দেখিতে ব্যস্ত হইল। দুই পাশে মাঝে মাঝে দু চার খানা খড়ুয়া ঘর ভিন্ন সমস্তই সবুজবর্ণ মাঠ; অৰ্দ্ধপক্ক শস্য মৃদু মৃদু মারুতভরে হেলিয়া দুলিয়া নাচিতেছে; নানাপ্রকার পক্ষী মধুর স্বরে কলরব করিতে করিতে নির্ভয়ে মাঠের উপর স্বাধীনভাবে খাদ্য অন্বেষণ করিতেছে; রৌদ্রতাপে ক্লান্ত হইয়া গাভীগুলি দলবদ্ধ হইয়া বৃক্ষ-

তলে শয়নাবস্থায় রোমন্থ করিতেছে; তাহাঁদের বৎস সকল চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া স্থিরভাবে নিজ নিজ জননীর দুগ্ধ পান করিতেছে—এই সমুদায় দৃশ্য দেখিয়া কাহার মন না মোহিত হয়?।

নূতন নূতন ষ্টেশনের ভিতর দিয়া যাইতে লাগিলাম; অনেকক্ষণ অন্তরে কেবল প্রধান ষ্টেশনগুলিতে কলের গাড়ী থামিতেছে। বেলা আট্‌টার সময় একটা ষ্টেশনে প্রায় আধ-ঘণ্টা গাড়ী থামাতে আমরা নামিয়া একটু বেড়াইলাম; মনে বড় আহ্লাদ হইল, আবার দুঃখও হইল, আহ্লাদ—আমি স্বাধীন, দুঃখ—ভারতমহিলারা এ স্বাধীনতাসুখ জানেন না। গাড়ীর ঘণ্টা বাজাতে আবার গাড়ীতে আসিয়া বসিলাম, উহা দৌড়াইয়া চলিল। ক্রমে পাটনায় আসিয়া পৌছিলাম; অদূরে দু একটী বৃহৎ বৃহৎ বাড়ীর ভগ্নাবশেষ দেখিয়া মনে নানা-প্রকার চিন্তা আসিল। আদিমকালে যখন গ্রীসের রাজা সুপ্রসিদ্ধ আলেকজাণ্ডার প্রথম ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন পাটলীপুত্র বা পাটনানগরে মগধসিংহাসনে মহানন্দ নামে রাজা আসীন হইয়া রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। সে সময়ে কত গৌরব ও তেজ ছিল, আর এখন ইহা কত হীন-প্রভ হইয়াছে ভাবিলে হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া যায়। এক সময়ে ইহা রাজধানী হইয়া বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ও দুর্গে পরিশোভিত ছিল, এখন একটী সামান্য জনপদের ন্যায় নিস্তব্ধভাবে পড়িয়া রহিয়াছে।

বিকালবেলা চারিটার সময় মোগলসরাইয়ে আসিয়া পৌছিলাম; দেখি ষ্টেশনে চতুর্দ্দিকে ভয়ানক লোকের ভিড়,

পরে জানিলাম যে ইহারা তীর্থযাত্রী, কাশীদর্শন করিতে যাইতেছে বা কাশীদর্শন করিয়া দেশে ফিরিয়া যাইতেছে। মোগলসরাই হইতে অল্প দূরে হিন্দুদের প্রধান তীর্থস্থান কাশী, এই পুণ্যভূমি দর্শন করিতে অনেক লোক যাইতেছে দেখিয়া, আমারও এই অতি প্রাচীন ও পুরাতন কাশী নগর দেখিতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। অল্পক্ষণ পরেই আবার কলের গাড়ী ছাড়িল, আমিও কাশীর বিষয় ভাবিতে ভাবিতে চলিলাম। ক্রমে রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইল, অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না বলিয়া গাড়ীর ভিতর থাকিতে বড়ই কষ্ট হইল। রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় এলাহাবাদে আসিয়া গাড়ী থামিল। এ পর্য্যন্ত যে সকল ষ্টেশন দেখিয়া আসিয়াছি, হাবড়া ব্যতীত সে সমুদায়ের অপেক্ষা এলাহাবাদের ষ্টেশন বড়; ষ্টেশনটী লোকে পরিপূর্ণ, আর কর্ম্মচারীদের মধ্যে অনেক ইংরাজ দেখিতে পাইলাম। এলাহাবাদ হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতিরই পুণ্যস্থান; গঙ্গা ও যমুনানদীর সঙ্গমস্থানে অবস্থিত প্রয়াগ নগর অতি পুরাকাল হইতে হিন্দুদের তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ, এবং এলাহাবাদকে মুসলমানেরা "আল্লা" বা পরমেশ্বরের নগর বলিয়া পবিত্র মনে করে।

এলাহাবাদ ষ্টেশনে গাড়ী বদলাইতে হইল, এইখানে আমি স্ত্রীলোকের গাড়ীতে উঠিলাম; সে কামরায় আর কোন স্ত্রীলোক যাত্রী ছিল না, আমার স্বামী আমাকে অনেক বলিয়া পাশের গাড়ীতে উঠিলেন, আমি একাকী গাড়ীতে বসিয়া রহিলাম। আজ একটী ভয়ঙ্কর রাত্রি বলিয়া বোধ হইল; আজ আমি একাকিনী স্ত্রীলোকের কামরায় বসিয়া আছি,

মনে কত ভাবনা আসিতেছে,—কলিকাতা, মা, ভাই, বোন সকলেই একে একে মনে আসিতে লাগিল, বড় কষ্ট হইল। কেবল মাঝে মাঝে ষ্টেশন ও দুই একটা আলো ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া রহিলাম; রাত্রি চারিটার সময় আকাশে আলো দেখিয়া চাহিয়া দেখি চমৎকার একটী ধূমকেতু উঠিয়াছে। অল্পদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় যে ধূমকেতু দেখিয়াছিলাম মনে হইল না যে ইহা সেইটী, কারণ ইহা তাহা অপেক্ষা বৃহৎ ও উজ্জ্বল, এবং এইটীর আলোতে সমস্ত স্থান চন্দ্রকিরণে আলোকিত বলিয়া মনে হইল। লোকে বলে ধূমকেতু অমঙ্গলের চিহ্ন, কিন্তু এরূপ শান্তমূর্ত্তি ও নিষ্কলঙ্ক গ্রহের আবির্ভাবে যে পৃথিবীর কোন প্রকার মন্দ হইতে পারে তাহা আমার এ ক্ষুদ্র চিত্তে ভাবিতে পারি না।

ক্রমে ক্রমে আলো হওয়াতে আমার মনেও আলো হইল, সমস্ত ভাবনা দূর করিয়া দিয়া গাড়ীর জানালার নিকট বসিয়া স্বভাবের শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। বেলা ছয়টার সময় জব্বলপুর আসিয়া পৌঁছিলাম, এখানে প্রায় এক ঘণ্টা গাড়ী থামে, জানিলাম যে এখানে আমাদের আবার গাড়ী বদলাইতে হইবে। বোধ হয় অনেকে জানেন যে, কলিকাতা হইতে এলাহাবাদ দিয়া দিল্লী ইত্যাদি স্থানে যে রেলওয়ে গিয়াছে তাহা এক কোম্পানীর, এলাহাবাদ হইতে জব্বলপুর পর্য্যন্ত অপর কোম্পানীর, এবং জব্বলপুর হইতে বোম্বাই আর এক ভিন্ন কোম্পানীর। অনেক ট্রেণ একেবারে কলিকাতা হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত বরাবর আসে, একবারও গাড়ী পরি-

বর্ত্তন করিতে হয় না, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা সে রকম ট্রেণ পাই নাই, এই নিমিত্ত আমাদের দুই বার গাড়ী বদলাইতে হইয়াছিল। শুনিয়াছিলাম জব্বলপুর অতিশয় সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর নগর, দেখিয়া বোধ হইল তাহা সত্য। ইহার চারিদিকে পাহাড় এবং এখানে অনেক আশ্চর্য্য দৃশ্য আছে। জব্বলপুরে দিন কতক থাকিয়া নর্ম্মদানদীর অদ্ভুত জলপ্রপাত, মার্ব্বল পাথরের পাহাড় এবং এখানকার ভগ্নাবশেষ দেখিতে ইচ্ছা ছিল কিন্তু বোম্বাই হইতে ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে ইংলণ্ডের জন্য জাহাজ ছাড়িবে বলিয়া এখানে থাকা হইল না; তাড়াতাড়ি আবার গাড়ীতে উঠিতে হইল।

জব্বলপুর ষ্টেশন হাবড়া ও এলাহাবাদ ষ্টেশন অপেক্ষা বেশী ছোট নয়, এখানে অধিকাংশ কর্ম্মচারী মাহাট্টী। বঙ্গদেশে জন্মান বশতঃ ভারতের নানাপ্রদেশের লোকেরা যে নানা প্রকার আকৃতি প্রকৃতি বিশিষ্ট ইহা পড়িয়া ও শুনিয়াও মনে ভাবিতে পারিতাম না, কিন্তু আজ তাহা নিজ চক্ষে দেখিতেছি। এলাহাবাদ, মোগলসরাই প্রভৃতি উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের নগরে এক রকম লোক দেখিয়াছি, আবার এখানে অন্য এক প্রকারের লোক দেখিতে পাইতেছি। মাহাট্টীরা দেখিতে ছোট কিন্তু ইহারা বলবান্, সাহসী ও তেজস্বী; দেখিলে মনে হয় যে ইহারা কাহারও পদানত নহে, এবং শুনিয়াছি ইহারা অতিশয় চতুর, কষ্টসহ ও কর্ম্মিষ্ঠ। ইহারা অতি মোটা কাপড় ও উড়ানী পরে এবং মাথায় এক বৃহদাকার পাগড়ী বাঁধে। প্রায় সকলেই কাঠের জুতা পায়ে দেয়, উহা দেখিতে অনেকটা খড়মের মত, কিন্তু চামড়া বা দড়ি দিয়া পায়ের সঙ্গে বাঁধা।

এক ভারতবর্ষের ভিতর এত প্রভেদ আছে ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। মনে হইল যে যদি একজন বাঙ্গালী একজন মার্হাট্টী ও একজন পশ্চিমবাসী লোক কোন বিদেশে যায়, তাহা হইলে কেহই ভাবিতে পারে না যে ইহারা তিন জন একদেশের লোক। প্রথম কারণ তিন জনকে দেখিতে তিন রকম, দ্বিতীয় কারণ তিন জনে তিন ভাষায় কথা কহে, তৃতীয়তঃ তিন জনের তিন প্রকার আচার ব্যবহার; ইহাতে কি প্রকারে অন্যে ভাবিতে পারে যে ইহারা তিন জনেই এক ভারতের সন্তান? আবার যদি কেহ তিন জনের সহিত কথা কহে, দেখিবে যে বাঙ্গালী সুচতুর, বুদ্ধিমান ও বিদ্যাবান্, ইঁহার কাছে ইংরাজরাজত্বের অনেক খবর পাইবে এবং কথা কহিয়া সুখী হইবে, কিন্তু কাজে তত নয়। পশ্চিমবাসী-দের সহিত কথা কহিলে কেবল শিবদুর্গার নাম শুনিতে পাইবে; ইহারা চালাকও নয়, বিদ্যাবান্‌ও নয়, কিন্তু ইহাদের বল ও সাহস আছে, আর একটী বিশেষ গুণ যে ইহারা কপট নয়। মার্হাট্টীরা আবার বাঙ্গালীদের ন্যায় বিদ্যাবান্ নয় বটে কিন্তু বুদ্ধিমান ও কাজের লোক, সকল বিষয়েই চালাক ও পটু এবং ইহাদের তেজ ও সাহস আছে। ইহাদের দেখিয়া শিবজী ও অন্যান্য মার্হাট্টী বীরপুরুষের কথা মনে পড়িল। ভাবিলাম যাঁহারা মোগলরাজ্যের উচ্ছেদ সাধন করিয়া পুন-রায় ভারতের স্বাধীনতাসূর্য্যকে আনিবার জন্য উদ্যত হইয়া-ছিলেন, যাঁহাদের অস্ত্রাঘাতে বহুদিন পরে যবনশোণিতে ভারত আর একবার প্লাবিত হইয়াছিল, যাঁহাদের উপদ্রবের ভয়ে প্রবল পরাক্রান্ত মোগলসম্রাটেরাও কম্পমান হইত এবং যাঁহা-

দের হইতে মোগলসাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছিল, ইহারা সেই বীরজাতির বংশ।

এই সকল বিষয় আন্দোলন করিতে করিতে জব্বলপুর হইতে প্রস্থান করিলাম। এখন হইতে পর্ব্বতময় দেশ আরম্ভ হইল; গাড়ীর দুপাশেই ছোট ছোট পাহাড়, মাঝে মাঝে অতি প্রকাণ্ড গর্ত্ত ও বন, এবং ভূমি অতি উচ্চ নীচ। বাঙ্গালাদেশে দুচারটী তৃণশূন্য পাহাড় দেখিয়া মনে ভাবিতাম পাহাড়ের উপর কোন প্রকার গাছ জন্মায় না, কিন্তু এখন দেখিতেছি যে আমার দুপাশের পাহাড়গুলি নানাপ্রকার তৃণ, লতা ও তরু দ্বারা আচ্ছাদিত। এখানকার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য অতি চমৎকার, আমি যদি কবি হইতাম তাহা হইলে এই মনোহর শোভা বর্ণনা করিয়া কত ভাল ভাল বই লিখিতে পারিতাম, বা চিত্রকর হইলে এই অপরূপ নৈসর্গিক দৃশ্যের চিত্র আঁকিয়া লোকের মনোরঞ্জন করিতে পারিতাম। দুধারে সবুজবর্ণ পাহাড়শ্রেণী দেখিয়া বোধ হয় যেন ইহারা রেলের গাড়ীকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতেছে, মনে হয় না যে কেহ এই স্বাভাবিক প্রাচীর ডিঙ্গিয়া আসিয়া আমাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারে। যতদূর যাইতে লাগিলাম তত আরো নূতন নূতন দৃশ্য দেখিতে পাইলাম; ক্রমে অধিকতর পার্ব্বতীয় দেশে আসিয়া পড়িলাম। ছোট ছোট পাহাড় ছাড়িয়া এখন বড় বড় পর্ব্বতের পাশ দিয়া গাড়ী চলিল; যে দিকে চাহি সে দিকেই দেখি দুর্ভেদ্য পর্ব্বত সমূহ বিস্তৃত রহিয়াছে। বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিল, এই সময়ে স্বভাবের শোভা আরো বাড়িয়া উঠিল। এখন নর্ম্মদানদীর একটী শাখার পাশ দিয়া গাড়ী যাইতেছে.

একদিকে সবুজ পাহাড় ও অন্য দিকে কাঁচের মত চক্‌চকে জল, আবার মাথার উপর লালবর্ণ আকাশ, মাঝখানে যেন সমস্ত কাঁপাইয়া ঘড়্ ঘড়্ শব্দে গাড়ী যাইতেছে; গাড়ীটাকে থামাইয়া কিছুক্ষণ এই শোভা দেখিতে ইচ্ছা হইল—পারিলাম না।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। দুই দিন ও দুই রাত্রি ক্রমাগত কলের গাড়ীতে বসিয়া ক্লান্ত হইয়াছিলাম এবং অল্প অল্প অন্ধকার হওয়াতে কিছুই উত্তমরূপে দেখিতে না পাইয়া আমি নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলাম; মনে নানা প্রকার চিন্তার উদয় হইল। এক সময়ে প্রকৃতির বিচিত্র শোভা ভাবিয়া অতিশয় আনন্দ লাভ করিলাম, আবার আমার দেশীয় পরাধীনা ভগিনীদের কথা মনে পড়িয়া দুঃখ হইল; তাঁহারা যদি এই সকল অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে পান তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার মত তাঁহাদেরও আনন্দ হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইচ্ছা থাকিলেও তাঁহারা এ সকল সুখে বঞ্চিত। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যাইতে লাগিলাম; অন্ধকারে সমস্ত শোভা ঢাকিয়া ফেলিল, মাঝে মাঝে ষ্টেশন ও আকাশের তারা ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। এই সময়ে আমরা দুইটা সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া গেলাম; সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া গাড়ী যাইবার সময় মনে হয়, যেন পর্ব্বতের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে গাড়ী ব্যূহভেদ করিয়া চলিতেছে। রাত্রি হওয়াতে বড় কষ্ট হইল, এমন সুন্দর দেশে আবার রাত্রি কেন?। শুনিয়াছিলাম এখানকার পর্ব্বতের দৃশ্য অতি চমৎকার, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলাম না। কাল ২৯ শে বোম্বাই পৌঁছিব এবং কলের গাড়ীর সমস্ত ক্লেশ দূর হইবে

ভাবিয়া মনকে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা দিলাম ; জাগিয়া ও স্বপ্ন দেখিয়া একরকমে রাত্রি কাটিল।

সকালবেলা আবার চারিদিকে বাড়ী ও কারখানা ইত্যাদি অনেক রকম জিনিস দেখিতে পাইলাম ; বোধ হইল যেন রাত্রির মধ্যে আমরা এক নূতন সৃষ্টিতে আসিয়াছি, আর সে রকম সবুজবর্ণ পাহাড়ও নাই বা উচ্চ নীচ ভূমিও নাই। এখন সব বাড়ী, লোক ও কারখানা দেখিতে দেখিতে চলিলাম, দুই পাশেই অনেক কল হইতে ধোঁয়া উঠিতেছে ; শীঘ্রই বোম্বাই নগর দেখিতে পাইব বলিয়া বড় আহ্লাদ হইল। এইরূপে নয়টা বাজিল, গাড়ী বোম্বাইয়ের ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। কুলিরা আসিয়া গাড়ী হইতে সব জিনিস নামাইতে লাগিল। আমরাও নামিলাম। ষ্টেশন লোকে ও নানা প্রকার দ্রব্যে পরিপূর্ণ, কোনদিকে যাইতে হইবে ঠিক করিতে পারিলাম না। আমার স্বামী আমাকে সতর্ক হইয়া সব জিনিস দেখিতে বলিয়া আমাদের থাকিবার জন্য হোটেল ঠিক্ করিতে গেলেন। আজ যদি আমি ঘোমটা দিয়া এই ষ্টেশনে দাঁড়াইতাম তাহা হইলে কত লোক চাহিয়া দেখিত, কিন্তু আমাদের দেশে ইংরেজী পোষাকের কি মাহাত্ম্য! কেহ তাকাইতেও সাহস করে না, সকলেই ভয় পায়। ষ্টেশনের সম্মুখেই অনেক ভাড়াগাড়ী দাঁড়াইয়াছিল, গাড়োয়ানেরা আসিয়া "গাড়ী চাই" বলিয়া জ্বালাতন করিতে লাগিল। আমার স্বামী ফিরিয়া আসিবার পর গাড়ী করিয়া আমরা একটা বড় হোটেলে গেলাম।

বোম্বাই কলিকাতা হইতে অনেক ভিন্ন। এখানকার রাস্তাগুলি কলিকাতার রাস্তা অপেক্ষা অনেক পরিষ্কার, কলিকাতার

চৌরঙ্গীতে যেমন রাস্তার ধারে শান্‌বাঁধান চলাপথ আছে, এখানে সেইরকম অনেক রাস্তায় দেখিতে পাইলাম এবং সমস্ত নগরটী অতি পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটী বলিয়া বোধ হইল। এখানকার বাড়ী নির্ম্মাণে ইট ব্যতীত কাঠ ও পাথর ব্যবহার করিয়া থাকে; অনেক বাড়ী ছয় সাত তোলা উঁচু, কিন্তু তোলাগুলি ছোট ছোট, আর ছাদ চূণ সুর্কির বদলে শ্লেট দিয়া ঢাকা ও গড়ানে, ছাদের উপর বসিবার বা বেড়াইবার সুবিধা নাই। এখানকার অধিবাসীরা অধিকাংশই হিন্দু মার্হাট্টা, আর পার্সী মুসলমান, ইংরাজ, ফিরিঙ্গী ইত্যাদি জাতিরও অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় সকল বড়রাস্তার দুধারে অনেক দোকান আছে, তাহার মধ্যে বেশীর ভাগ পার্সীদের।

পার্সী কাহাদের বলে তাহা বোধ হয় আমার দেশীয় ভগিনীদের মধ্যে অনেকে জানেন না। অতি পূর্ব্বকালে পারস্য দেশের অধিবাসীরা সূর্য্য ও উহার প্রতিরূপ আগুন পূজা করিত, এবং অনেকটা আমাদের হিন্দুদের ন্যায় পৌত্তলিক ছিল; পরে মুসলমানেরা পারস্য জয় করিবার পর সমস্ত অধিবাসীদের মুসলমান হইবার জন্য উৎপীড়ন করাতে প্রায় সকলেই ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। কয়েকজন আপনাদের ধর্ম্ম রক্ষা করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষে পলাইয়া আসিয়া গুজরাটের রাজার নিকট আশ্রয় চাহিয়াছিল, তাহাতে গুজরাটের রাজা তাহাদের ধর্ম্ম ও মান রক্ষা করিবার জন্য নিজের রাজ্যে ঐ পলাতকদিগকে থাকিতে অনুমতি দেন। তাহাদেরই সন্তান সন্ততিদিগকে এখন পার্সী বলে। ইহারা শত শত বৎসর আগে যেমন ছিল সেই প্রকার এখনও নিজেদের প্রাচীন ধর্ম্মা-

নুসারী হইয়া চলে। ইহারা অতি পরিশ্রমী, চতুর ও কার্য্য-ক্ষম; যেখানেই দেখ সর্ব্বদা কাজে ব্যস্ত, এবং কাজ ও স্বার্থ ভিন্ন আর কিছুই বুঝে না। ইহারা বাণিজ্য বিষয়ে বঙ্গবাসী ও ভারতের অন্যান্য সমস্ত অধিবাসীদের উপর উঠিয়াছে। কলিকাতার চীনাপটী যেমন চীন দেশীয় লোকে ও তাহাদের দোকানে পরিপূর্ণ, বোম্বাইয়ের অনেক স্থান সেই রকম পার্সী ও তাহাদের দোকানে পরিপূর্ণ। ব্যাঙ্ক, পোষ্ট আফিস, কলেজ, স্কুল ইত্যাদি সকল সাধারণ স্থানে দেখি যে পার্সীরা কাজে ব্যস্ত, আবার রাস্তাতেও অনেক পার্সীস্ত্রীলোক ও পুরুষ বেড়াইতেছে। পার্সীস্ত্রীলোকেরা আমাদের মত পিঞ্জরে বদ্ধ থাকে না; রাস্তা, ঘাটে, ষ্টেশনে, দোকানে সর্ব্বত্রই পার্সীমহিলাদের বেড়াইতে দেখিয়াছি। ইহারা অতিশয় সুশ্রী এবং অতি ভদ্র পোষাক পরিয়া বাহির হয়। পার্সীদের উৎসাহ ও অধ্যবসায় দেখিলে মনে হয় না যে ইহারা ভারতবর্ষের লোক। যেখানে যাই সেখানেই পার্সীদের দোকান ও বাণিজ্যগৃহ দেখিতে পাই; কলিকাতায় অনেক পার্সী দেখিয়াছি, পশ্চিমেও দেখিয়াছি আর বোম্বাই ত পার্সীদের রাজ্য বলিলেই হয়, আবার শুনিতে পাই এডেনে বড় বড় দোকান পার্সীদের হাতে, এবং লণ্ডনেও এই জাতির অনেক লোক কর্ম্ম ও ব্যবসা উপলক্ষে বাস করে। ভারতের অন্যান্য জাতিরা যদি ইহাদের সদ্গুণ গুলির অনুকরণ করে তাহা হইলে বোধ হয় দেশের অনেক উন্নতি হইবার সম্ভাবনা।

বোম্বাইনগর সমুদ্রের ধারে হওয়াতে সুয়েজখাল দিয়া ইংলণ্ড ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্য করিবার অতি-

শয় সুবিধা। এখানে সর্ব্বদা সমুদ্রের শীতল ও স্বাস্থ্যকর বাতাস বহাতে বোম্বাই কলিকাতার মত তত গরম নয়, এই জন্য এখানকার লোকেরা অধিক কার্য্যক্ষম। বোম্বাই স্কুল, কলেজ, চিকিৎসালয়, ডাকঘর ও ব্যাঙ্ক ইত্যাদিতে কলিকাতার নীচে নয়। শুনিয়াছি এখানকার বাড়ী, ট্র্যাম, ঘোঁড়ার গাড়ী ইত্যাদি অনেকটা ইংলণ্ডের মত; দেখিলে বোধ হয় যে কলিকাতা অপেক্ষা বোম্বাই ইংরাজরাজ্যের রাজধানী হইবার বেশী উপযুক্ত। হয়ত বোম্বাই কলিকাতা হইতে ইংলণ্ডের নিকটে বলিয়া ও এখানে অধিক দিন ইউরোপীয়েরা থাকাতে ইহা অনেকটা ইউরোপীয় নগরের মত হইয়া গিয়াছে।

আমরা যে হোটেলে ছিলাম, সেটা সাত তোলা উঁচু, প্রায় সমস্তই পাথর ও কাঠের দ্বারা নির্ম্মিত; বেশ সাজান, কলিকাতার ধনীলোকদের বৈটকখানার মত। এ হোটেলের প্রায় সকল চাকরেরা ফিরিঙ্গী কিম্বা দেশীয় খৃষ্টান। হোটেলটি সমুদ্র হইতে এক পোয়া দূরে, বারাণ্ডায় বসিয়া দেখি সম্মুখে নীলবর্ণ সমুদ্র ধূ ধূ করিতেছে—সীমা নাই, মাথার উপর উজ্জ্বল সূর্য্য, আর রাস্তাগুলা নানাপ্রকার লোক ও গাড়ীতে পরিপূর্ণ। কলিকাতা হইতে বোম্বাই সাত শত ক্রোশ দূর, আমরা প্রায় আড়াই দিনে ঐ পথ আসিয়া অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম; মনে করিলাম এই হোটেলে বসিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিব, কিন্তু শুনিলাম শীঘ্রই জাহাজ ছাড়িবে। খাওয়া দাওয়া করিয়া বেলা দুইটার সময় জাহাজে উঠিবার জন্য হোটেল হইতে রওনা হইলাম। তীরের কাছে জল কম বলিয়া বড় জাহাজ অতি নিকটে আসিতে পারে না; সে জন্য যে জাহাজে

আমাদের যাইবার কথা সেটী ছাড়িবার দু তিন ঘণ্টা আগে একটা লাঞ্চ বা ছোট জাহাজ আসিয়া সমস্ত লোক ও জিনিস পত্র কিনারা হইতে লইয়া বড় জাহাজের নিকটে গেল।

বেলা চারিটার সময় আমরা বড় জাহাজের কাছে গিয়া সিঁড়ি দিয়া উহার উপরে উঠিলাম। আমার জীবনে এ নূতন দৃশ্য, দূর হইতে কতবার জাহাজ দেখিয়াছিলাম, কিন্তু ইহার ভিতর ভাগ যে কি প্রকার তাহা আমি এই প্রথম দেখিতেছি। জাহাজটী লোকে পরিপূর্ণ, দুই পাশেই কাঠের সিঁড়ি ফেলা আছে, কত লোক আসিতেছে যাইতেছে, সকলেই ব্যস্ত ; তোরঙ্গ, বাক্স, চিঠি ইত্যাদি নানা প্রকার দ্রব্য জাহাজের উপর আনিতেছে। একদিকে চাহিয়া দেখি বোম্বাই নগর, তীরের কাছের জল ঘোলা ও সবুজবর্ণ, তাহার উপর শত শত ছোট নৌকা ভাসিতেছে ; তীরের উপরে লোক চলিতেছে, গাড়ী যাইতেছে এবং সাদা সাদা বাড়ীগুলা ঘাড় উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, দেখিয়া শেষ হয় না। আর একদিকে অসীম সমুদ্র, যতদূরে দেখ ততই গাঢ় নীলবর্ণ, কিন্তু অসীম হইলেও মাঝে মাঝে জাহাজ দিয়া যেন সীমা করিয়া দিয়াছে ; ঐ সকল দেখিলে বোধ হয় যেন সমুদ্রের উপরে কতকগুলি লোকজন পরিপূর্ণ বাড়ী ভাসিতেছে। কোনদিকে দেখিব ভাবিয়া ঠিক পাই না ; আমাদের জাহাজের চারিদিকেই নৌকা ও লোক, প্রায় সবই পার্সী, মুসলমান কিম্বা খ্রীষ্টান, হিন্দুদের যেন একেবারে তীরেই বিদায় দিয়াছি।

বোম্বাইকে আর দেখিতে পাইব কি না জানি না, ভারতবর্ষে যে আবার ফিরিব ইহাও মনে হইল না, এই ভাবিয়া

তীরের দিকে আসিয়া দেখিতে লাগিলাম। যে ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং যেখানে এত বৎসর জীবিত রহিয়াছিলাম সেই স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছি, দূরে আত্মপরিজন সকলেই পড়িয়া রহিয়াছে—এই সকল চিন্তাতে মন আকুল হইল। লোকের ভিড় আর ফুরায় না, দেখিতে দেখিতে ছয়টা বাজিয়া গেল; মনে করিতেছি এখনও জাহাজ ছাড়িল না, এমন সময়ে এক ভোঁ বাজাইয়া সকলকে জানাইয়া দিল যে পনের মিনিটের মধ্যে জাহাজ ছাড়িবে। উপ্‌রি লোকেরা তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া পলাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে দশ মিনিটে প্রায় তিন ভাগ লোক জাহাজ হইতে নামিয়া গেল, কেবল যাত্রীরা ও কর্ম্মচারীরা ইহার উপরে রহিল। এমন সময়ে আবার ভোঁ বাজিল—এইবার জাহাজ ছাড়িল।

## বিদায়।

১

আজি প্রিয় দেশ! স্বদেশরতন!
ত্যজিনু তোমারে বহুদিন তরে,
ভেবনা জননি! অভাগী কন্যারে,
কোন উপকারে এলনা যথন।

২

মনে আশা ছিল প্রিয়তম সনে,
তব হিত তরে করিব যতন,
কিন্তু সে বাসনা হয়নি পূরণ,
এখনো অন্তরে রয়েছে গোপনে।

৩

নিবিছে ক্রমে সে আশার অনল,
কিন্তু মা! যায় না স্মৃতি অনিবার,
তাইগো জননি! যাতনা আমার,
হৃদয়ে লুকান রয়েছে গরল।

৪

সুধাইবে তুমি কেন কি কারণে,
ত্যজিতেছি মোরা ভারত! তোমারে;
উত্তর কি দিব পাই না অন্তরে,
যেতেছি বিদেশে নানা আশাসনে।

৫

বহুদিন হতে হৃদয়ে আমার,
গোপনে রয়েছে এক আশালতা,
দেখিবার তরে প্রিয় স্বাধীনতা,
যাইব যে দেশে বসতি উহার।

৬

যাইব তথায় স্বাধীনতাদেবী,
বিরাজে যেখানে প্রতি ঘরে ঘরে;
পাইয়া আনন্দ প্রশস্ত অন্তরে,
বেড়ায় সকলে সুখবায়ু সেবি।

৭

নাহি মা! যে দেশে কঠোর বন্ধন
অধীনতারজ্জু মানবের গলে।
স্বাধীন জীবনে স্বাধীনতাবলে,
হৃষিত সদাই ব্রিটননন্দন।

৮

বড় সাধ মনে, কি কুহক পেয়ে,
দেখিব, ব্রিটন এতই পূজিত,
দলিছে চরণে দুঃখিনী ভারত,
সভ্যতা সুশিক্ষা হৃদয়ে ধরিয়ে।

৯

দেখিব সেথায় কি প্রভাববলে,
বারিধিবেষ্টিত অতি ক্ষুদ্র স্থান,
বিঁধে নানাদেশে তীক্ষ্ণ অস্ত্র বাণ্,
হারায় সবারে সদর্পে সবলে।

১০

দেখি ব্রিটনের ধর্ম্মনীতিচয়,
লিখিব হৃদয়ে প্রতি স্তরে স্তরে ;
করিব যতন শিখিবার তরে.
পারি যদি, তার সাহস অভয়।

১১

কত পুত্র তব বিদ্যা শিখিবারে,
যায় মা ! ইংলণ্ডে ছাড়ি প্রিয়জন ;
কত জ্ঞানরত্নে নিজ নিজ মন,
মণ্ডিত করিয়া পুন আসে ফিরে।

১২

কেন মোরা তবে হয়ে তব সুতা,
পারি না জননি ! সে দেশে যাইতে,
বিদ্যা জ্ঞানধনে হৃদয় ভূষিতে,'
দেখিয়া স্বাধীন ব্রিটন-দুহিতা।

১৩

দেখি দিবানিশি যাতনা তোমার,
ভাবি হায়! মোরা হইয়া মানব,
রয়েছি পিঞ্জরে চক্ষুহীনা সব,
করিতে পারি না কোন উপকার।

১৪

তাই বহুকষ্টে পিঞ্জর ভাঙ্গিয়ে,
হয়েছি বাহির জ্ঞানচক্ষু তরে,
লুকায়ে রাখিয়ে বেদনা অন্তরে,
মুছি অশ্রু সদা কেহ দেখে ভয়ে।

১৫

কেহই জানে না যাতনা আমার,
নাহিক কাহারে জানাতে বাসনা,
কি কাজ জানায়ে, কেহ বুঝিবে না;
পড়িতেছে অশ্রু ছিঁড়ি হৃদি তার।

১৬

অনেক কেলেশে বাঁধিয়া হৃদয়,
ভারত! জননি! প্রিয় জন্মভূমি!
ভেব না আমারে স্নেহহীনা তুমি,
অতি কষ্টে আজ লইনু বিদায়॥

---

# তৃতীয় অধ্যায়।

## বোম্বাই হইতে বেনিস।

শুক্রবার বেলা প্রায় সাড়ে ছটার সময় জাহাজ ছাড়িল, নাটকের পর্দ্দার মত আমার জীবনে একরকম ভাব উল্টাইয়া আর একরকম আসিল। আজ আমি এই প্রথম ভারতবর্ষ ছাড়িয়া চলিলাম। জাহাজ যতদূরে আসিতে লাগিল, আমার মনে তত কষ্ট বাড়িতে লাগিল; আমার এ কষ্ট ভয়ে নয়, সমুদ্র দেখিয়া আমার একটুমাত্র ভয় হয় নাই বরং নূতনরকম দেখিয়া আহ্লাদ হইয়াছে, কিন্তু এ কষ্ট অন্তর্ভেদী। যে ভারতবর্ষে জন্মাইয়াছি, ও এতদিন রহিয়াছি, যাহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসি, যাহার হীনাবস্থা দেখিয়া কোন উপকার করিতে পারি না বলিয়া আত্মাকে ধিক্কার দি, আজ সেই প্রিয়স্থান ছাড়িয়া জানি না কতদিনের জন্য চলিলাম। অনেক সাহস করিয়া মনকে শক্ত করিয়াছিলাম, কিন্তু দুঃখের বেগে এই সময়ে সে তেজ ভাসিয়া গেল, চোকে জল আসিল কাঁদিতে পারিলাম না; কেহ দেখিলে কি মনে করিবে বলিয়া লজ্জায় জল মুছিয়া অন্যমনস্ক হইতে চেষ্টা করিলাম। কি করিয়া অন্যমনস্ক হইব, এত বৎসরের ভালবাসার প্রিয় জন্মভূমিকে কি এক মুহূর্ত্তে ভুলা যায়? আত্মীয় পরিজন সকলকে মনে পড়িল, জাহাজ হইতে নামিয়া অথবা পলাইয়া যাইতে ইচ্ছা হইল; আবার মনে হইল, ইতিহাসে যুদ্ধের বিষয় পড়িতে পড়িতে কেহ রণস্থল হইতে পলাইয়া গিয়াছে দেখিলে তাহাকে কাপুরুষ বলিয়া মনে মনে ঘৃণা করিতাম;

আমি যদি আজ চলিয়া যাই তাহা হইলে অতিশয় ভীরুর ন্যায় কাজ হইবে, এবং লোকে আমাকে দুর্ব্বলা ও সাহসহীনা ইত্যাদি বলিয়া ঘৃণা করিবে। এইরূপ ভাবিয়া অনেক কষ্টে মন ঠিক করিয়া ভারতবর্ষের নিকট বিদায় লইলাম। ক্রমে ধক্ ধক্ শব্দে জাহাজ যাইতে লাগিল, আমরাও দূরে আসিতে লাগিলাম। আমাদের দেশের লোকেরা জাহাজের নামে ভয় পায় কেন? এইত এত লোক চলিতেছে, কোন কষ্ট নাই ভয় নাই, তবে বিপদ, বিপদ ত সব স্থানেই আছে; ঘরে বসিয়া রোগে মরিতে পার, বজ্রাঘাতে মরিতে পার, তবে "যদি" জাহাজ ডুবে না হয় জলে ডুবিয়া মরিবে এই প্রভেদ। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল, আজিকার সন্ধ্যা যেন আমার কাছে নূতন বলিয়া বোধ হইল।

ঐ যে বোম্বাই নগর, এখনও দেখা যাইতেছে, লোক দৃষ্ট হয় না কিছু জানা যায় না কিন্তু কেবল সাদা সাদা বাড়ী দেখিতে পাইতেছি। ঐ একটা দুটা দেখিতে দেখিতে সব আলো জ্বলিল, বাড়ীর জানালা হইতে আলোগুলি উঁকি মারিতে লাগিল। আমরা এখনও বোম্বাই উপসাগরের মধ্যে, তিনদিকে নগর ও উঁচু উঁচু বাড়ী; যেন মুনিরা শ্বেতবস্ত্র পরিয়া সমুদ্রের ধারে ধ্যান করিতেছেন আর সমুদ্রের ঢেউ গিয়া তাঁহাদের চরণ ধুইয়া দিয়া আসিতেছে; এক একবার নাচিয়া যেন বিরক্ত করিতেছে, কিন্তু তাঁহাদের গ্রাহ্য নাই, অটল ধ্যানে মগ্ন। ক্রমে ক্রমে গাঢ় অন্ধকার পৃথিবীকে ঢাকিয়া ফেলিল। আকাশে তারা উঠিয়াছে, নগরের দিকে চাহিয়া দেখিয়া বোধ হইল নগরও যেন তারার মালা পরিয়াছে,

আবার সমুদ্রের দিকে দেখি, জলের উপর জাহাজ ঘসিয়া যাওয়াতে মধ্যে মধ্যে ফস্‌ফরাস্ উঠিয়া নক্ষত্রের ন্যায় ঝক্ ঝক্ করিতেছে—আমরা যেন অসীম আকাশের মধ্যে জাহাজে করিয়া যাইতেছি।

ক্রমে বোম্বাইয়ের আলো সকল অদৃশ্য হইয়া গেল, আর দেখা যায় না; চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম যদি কোথাও দেখিতে পাই—না পাইলাম না। আবার চেষ্টা করিলাম আর দেখিতে পাইলাম না। এই এক ঘণ্টায় বোম্বাইয়ের দৃশ্য হারাইলাম, এইবার ভারতবর্ষ হইতে দূরে আসিয়াছি বলিয়া মনটা শূন্য হইল। যে স্বদেশের জন্য লোকে শত শত ক্রোশ দূর হইতে আসে, বিদেশে থাকিয়াও লোকে যে স্বদেশের বিষয় ভাবে ও যাহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হয়, যে দেশকে লোকে ছাড়িতে চায় না, আজ আমি সেই স্বদেশ ছাড়িয়া যাইতেছি, আবার কতদিন পরে দেখিব জানি না। এইরূপ চিন্তাতে মন আকুলিত হইতেছে এমন সময়ে হঠাৎ দূরে একটা আলো দেখিতে পাইলাম, মনে একটু আহ্লাদ হইল, বোধ হইল বোম্বাইকে এখনও হারাই নাই। কিন্তু আমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন যে ওটা বোম্বাইয়ের আলো নহে, জাহাজ চালাইবার সুবিধার জন্য সমুদ্রের মাঝে মাঝে, বিশেষ কিনারার নিকট "লাইট হাউস" অর্থাৎ আলোঘর আছে, উহা তাহারই আলো। উহাও আমার মনের মত একবার নিবিতেছে ও একবার জ্বলিতেছে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম; উহা কি এই নিস্তব্ধ গভীর সমুদ্রে থাকিয়া ভয় পাইয়া কাঁপিতেছে? না, বোধ হয় উহা দুর্ব্বলা বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের মত ভীত নহে,

আমাদের মত ভীত হইলে উহা এই জনশূন্য সমুদ্রে একাকী অটলভাবে দাঁড়াইয়া জাহাজচালকদিগকে পথ দেখাইয়া দিয়া এত উপকার করিতে পারিত না। শুনিলাম, উহা একবার নিবিতেছে ও একবার জ্বলিতেছে তাহার কারণ, উহার উপরে একটা আর্সীর মত কাচ আছে, সেইটা ঘোরে; সেইজন্য যখন সেই কাচে আলো পড়ে তখন সূর্য্যের মত চক্ চক্ করিয়া উঠে। আলোঘর দূর হইতে দেখিতে একটী মোটা থামের মত, কিন্তু শুনিয়াছি উহা অনেকটা কলিকাতার মনুমেণ্টের মত, উহার ভিতরে বরাবর সিঁড়ি আছে, এবং উপরে একটী বড় গোলঘর আছে, সেই ঘরে আলো থাকে, আর নীচে লোক থাকিবার ঘর আছে। তাহাতে একজন লোক থাকে, সে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় ঐ আলোটী জ্বালাইয়া দেয়; সমস্ত আলোঘরের ভার তাহার উপরই থাকে।

ক্রমে রাত্রি হওয়াতে, ক্লান্ত হইয়াছিলাম বলিয়া সকাল সকাল ঘুমাইতে গেলাম। একটু একটু জাহাজ টলিতেছিল, কিন্তু আমার কোন অসুখ করে নাই, মাথাও ঘুরে নাই। সমুদ্রে জাহাজের উপর অনেকের মন্দাগ্নি হয়, কিছুই খাইতে পারে না এবং খাইলে তৎক্ষণাৎ বমি হইয়া উঠে; শুনিয়াছি এই সমুদ্ররোগ অনেকটা ঘুরনি রোগের মত অতি কষ্টদায়ক ও দুর্ব্বলকারী; এ রোগ কাহারও কাহারও দুই চারি দিনেই সারিয়া যায়, এবং কেহ কেহ অনেক দিন পর্য্যন্ত ভোগ করে। বোধ হয় সমুদ্রযাত্রীদের মধ্যে অতি অল্পই লোক দেখিতে পাওয়া যায় যাহাদের এ রোগ হয় না। ইহার কারণ কি; তাহা ঠিক করিয়া বলা ভার। জাহাজ বরাবরই অল্প অল্প টলে,

এবং একটু বেশি বাতাস উঠিলে আরো অধিক টলে। প্রথমে এই টলা অনেকের সহে না, আর সমুদ্রের লোণা জলে ও লোণা বাতাসেও অধিকাংশ লোকের মন্দাগ্নি হয়; তাঁর উপরে আবার জাহাজের কলঘরে ও অন্যান্য অনেক স্থানে এক প্রকার দুর্গন্ধ তৈল ব্যবহার করে; হয় ত এই সকল কারণেই সমুদ্ররোগ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু একটী বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ছোট ছোট ছেলেদের প্রায় এ রোগ হয় না। তিন রাত্রি ভাল করিয়া ঘুম হয় নাই, মনে করিলাম বেশ ঘুমাইব, কিন্তু নানাপ্রকার ভাবনা আসিয়া কিছুক্ষণের জন্য নিদ্রাকে তাড়াইয়া দিল, কতক সময় পরে ঘুমাইয়া পড়িলাম, জাহাজে আমার এই প্রথম রাত্রিযাপন।

বেলা ছয়টার সময় জাগিয়া উঠিলাম, এমন সময়ে একজন "ষ্টুয়ার্ড" আসিয়া দরজায় শব্দ করাতে আমার স্বামী উঠিয়া তাহার নিকট হইতে দুজনের চা ও বিস্কুট লইলেন। আমি গাত্রোত্থান করিয়া কিঞ্চিৎ চা ও বিস্কুট খাইয়া "ডেক" অর্থাৎ জাহাজের ছাদের উপর গেলাম। এইবার চারিদিকেই সমুদ্র, আর নগরও দেখিতে পাই না—বাড়ীও দেখিতে পাই না—সব নীলবর্ণ। আকাশে পাখী পর্য্যন্ত নাই, সমুদ্রের দিকে চাহিয়া দেখ, কেবল ঢেউ, একটা মিলিয়া যাইতে না যাইতে আর একটা—আবার একটা, উহার আর শেষ নাই। কিন্তু এ ঢেউগুলি বেশি বড় নয়, এখন সমুদ্র প্রায় স্থির, কেবল জাহাজ চলাতে যেন বিরক্ত হইয়া অতি অল্প নড়িতেছে।

এ জাহাজে অধিক যাত্রী নাই, প্রথম শ্রেণীতে পঁচিশ জন, আর দ্বিতীয় শ্রেণীতে চৌদ্দ জন মাত্র। জাহাজটী বেশি বড়ও

নয়, বেশি ছোটও নয়, ইহা লম্বে প্রায় দুই শত পঞ্চাশ হাত, এবং প্রস্থে প্রায় ত্রিশ হাত। জাহাজের ছাদকে "ডেক" বলে, ইহার উপর কিছু ঢাকা নাই, বেশি রৌদ্র বা বৃষ্টি হইলে পাল টাঙ্গাইয়া দেয়। ডেকের উপর কাপ্তেনের ঘর, রান্নাঘর ও মাঝে মাঝে অনেক ছোট ছোট কলবলও আছে। নীচে একদিকে কলের গাড়ীর কামরার মত ছোট ছোট ঘর, তাহাদের "ক্যাবিন" বলে, আর প্রথম শ্রেণীর লোকদের খাইবার ও বসিবার জন্য একটী বড় সাজান ঘর আছে, তাহাকে "সেলুন" বলে। ক্যাবিনগুলি সব এক পরিমাণের নয়, কোনটীতে দুটী, কোনটীতে চারিটী, কোনটীতে বা তার অপেক্ষা অধিক বিছানা আছে, একটীর উপর আর একটী করিয়া বিছানা থাকে, অনেক সময়ে উপরটীর উপর উঠিবার সময় কুস্তি করিতে হয়। যখন আমি প্রথম ক্যাবিনে যাই, তখন মনে হয় নাই যে এই পায়রার খুব্‌রিতে রাত্রি কাটাইতে পারিব, হাত বাড়াইলে ছাদে হাত ঠেকে, আর বিছানাগুলি চওড়ায় এত ছোট যে বোধ হইল না যে নিদ্রাদেবী উহার উপর প্রসন্ন হইবেন, যাহা হউক পরে ক্রমে সবই অভ্যাস হইয়া গেল, এবং সব বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে, জাহাজের ভিতর উহার অপেক্ষা ভাল আয়োজন করা একপ্রকার অসম্ভব। ক্যাবিনগুলির সমুদ্রের দিকের দেয়ালে আমাদের দেশের গবাক্ষের মত ছোট ছোট জানালা আছে, উহাদের "পোর্টহোল" বলে। উহা ছাড়া আর গুটিকতক ক্যাবিন আছে, তাহাতে স্নানাদি করিবার উত্তম আয়োজন আছে। জাহাজের এক প্রান্তে প্রথমশ্রেণীয়দের ও কর্ম্মচারীদের ঘর, এবং অপর প্রান্তে দ্বিতীয় শ্রেণীর ও

নাবিকদের ঘর। মধ্যভাগে কলঘর; ঐ কলঘরে একটি প্রকাণ্ড এঞ্জিন আছে, তাহার জোরে এই জাহাজ চলে। কলঘরের নিকট অতিশয় গরম এবং এঞ্জিনের ঘট্ ঘট্ শব্দ ও তেলের দুর্গন্ধ বশতঃ উহার কাছে অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারা যায় না। আমাদের ঘরের নীচে আবার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুই তিনটা খোল আছে, তাহার ভিতরে জাহাজের মাল ও যাত্রীদের বড় বড় তোরঙ্গ আদি থাকে; ঐ খোলের নীচে জাহাজের তলা।

জাহাজের অধ্যক্ষকে "কাপ্তেন" বলে, তাঁহার নীচে চারি জন কর্ম্মচারী আছে, এই পাঁচজন ক্রমান্বয়ে জাহাজের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করে; অবশ্য অধ্যক্ষ জাহাজ সম্বন্ধে সমস্ত বিষয়ের জন্য দায়ী। ছয় জন এঞ্জিনিয়ার আছে, জাহাজের সমস্ত কলবলের ভার তাহাদের হাতে থাকে। সমুদ্রের উপর কোন ব্যক্তির অসুখ হইলে চিকিৎসা করিবার জন্য একজন ডাক্তার আছেন। জাহাজে প্রতি রবিবারে গির্জ্জা বসে, সেই সময়ে ঐ ডাক্তার কিম্বা কাপ্তেন পুরোহিতের কাজ করিয়া থাকেন। ইহাদের পর চারি জন লোক আছে, তাহাদের "কোয়ার্টর মাষ্টার" বলে, ইহারা পর্য্যায়ক্রমে অধ্যক্ষ ও কর্ম্মচারীদের আজ্ঞা পালন করে। জাহাজে যাহারা চাকরের কাজ করে তাহাদের "ষ্টুয়ার্ড" বলে; সর্ব্বপ্রধান ষ্টুয়ার্ডের হাতে সব খাবার জিনিসের ভার; কি রান্না হবে, কত রান্না হবে ইত্যাদি বলিয়া দেওয়া ও গৃহিণীর ন্যায় তদারক করা ইহার কাজ। অন্য সব ষ্টুয়ার্ডেরা খাবার দেয়, পরিবেশন করে, বিছানা করে, বাসন ধোয় ইত্যাদি। সর্ব্বশুদ্ধ ষোল জন ষ্টুয়ার্ড আছে, এবং স্ত্রীলোক যাত্রীদের জন্য একটী স্ত্রীলোক "ষ্টুয়ার্ডেস" আছে। তিন চারি জন রাঁধুনী,

নাপিত, ছুতার, কামার ইত্যাদি প্রায় সব প্রকার কাজেরই লোক আছে। কলের ঘরে আগুনের নিকট খাটিবার জন্য ছয় জন কাফ্রী আছে, ইহারা অতিশয় গরম সহিতে পারে। এই জাহাজে প্রায় ষাটি জন বোম্বাইবাসী নাবিক আছে, ইহারা জাহাজ পরিষ্কার করা, পাল তোলা, নঙ্গর ফেলা ইত্যাদি কাজ করে।

ক্রমে বেলা প্রায় দুই প্রহর হইল। সূর্য্যের তেজ বাড়িল, সমুদ্রের জলে সূর্য্যের কিরণ পড়ায় উহা ঝকিতে লাগিল, আর ঢেউগুলি একবার উঁচু একবার নীচু হইয়া বাহার দিয়া সূর্য্যকিরণের সঙ্গে খেলা আরম্ভ করিল। কাপ্তেন ও দুই তিন জন কর্ম্মচারী যন্ত্র দ্বারা কোথায় সূর্য্য আছে দেখিয়া সময় ঠিক করিলেন। কাল যখন বেলা দুই প্রহর ছিল, আজ তখন পৌনে দুই প্রহর; ক্রমে ক্রমে যত যাইতেছি, প্রতিদিন এক কোয়ার্টর করিয়া সময়ের প্রভেদ হইতেছে। বই লইয়া ডেকের উপর বসিয়া পড়িব মনে করিলাম কিন্তু পড়া যায় না, ঘুম আসে; জাহাজ যেন দোলাইয়া দোলাইয়া ঘুম পাড়াইয়া দেয়। ডেকের উপর অতিশয় রৌদ্রের তেজ, কিন্তু সুস্নিগ্ধ, শীতল বাতাস বহাতে সে তেজ মন্দীভূত হইয়া যায়। বই হাতে করিয়া বসিয়া রহিলাম, মনে কত রকম চিন্তা আসিল; ভারতবর্ষ—জন্মস্থান—কলিকাতা—আত্মীয়বন্ধু ইত্যাদি এক এক করিয়া ভাবিতে লাগিলাম। সকলকে যেখানে যে রকম ভাবে দেখিয়া আসিয়াছি তাহারা প্রায় সেই থানে সেই রকম ভাবে আছে, কিন্তু এই চারি দিনে আমি কতদূরে আসিয়াছি এবং আমার আহারাদির কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে! মা দেখিলে হয়ত খ্রীষ্টান

হইয়াছি মনে করিয়া কাঁদিবেন, ভাই বোনেরা দেখিলে আর দৌড়িয়া আসিয়া 'দিদি" বলিয়া হাত ধরিতে সাহস করিবে না —পাছে "জাত" যায়। অন্যান্য আত্মীয়েরা দেখিলে "মেম সাহেব" বলিয়া ঠাট্টা করিবেন। কিন্তু আমার মনের ত কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। যদিও আমি সেই ঘোমটা দিয়া বৌ হইয়া নাই বটে, আমার খাওয়া দাওয়া পোষাক ইত্যাদি সব ইংরাজী ধরণে হইতেছে, কেহ দেখিলে "হিন্দুর মেয়ে" বলিয়া জানিতে পারেন না; তবুও আমার মা, বাপ, ভাই, বোন আত্মীয় পরিজন সকলের প্রতি সেইরূপ ভালবাসা আছে; এখনও তাহাদের দেখিতে পাইলে দৌড়িয়া গিয়া গলা ধরিয়া কথা কহি। এখনও আমার ভারতবর্ষের জন্য সেই প্রকার কষ্ট হইতেছে, তবে আমাদের দেশীয় লোকেরা যে জাহাজে উঠিলে মন বদলাইয়া যায় বলেন তাহা একেবারে ভুল বলিয়া মনে হইতেছে; তাঁহারা বোধ হয় আলাদা পোষাক দেখিয়াই আলাদা মন হইয়া যায় বিশ্বাস করেন।

অল্প অল্প করিয়া সূর্য্যের তেজ কমিয়া আসিল; সূর্য্যের অস্ত যাইবার সময় হওয়াতে আকাশ লালমূর্ত্তি ধরিল, বোধ হইল যেন সমুদ্রে আগুন লাগাতে আকাশে শিখা উঠিয়াছে। ভারত-বর্ষে অনেকদিন সূর্য্যের অস্ত যাওয়া দেখিয়াছি কিন্তু সে এত মনোহারী নহে। এখন আর আমার চারিদিকে সমস্ত নীল-বর্ণ নহে, যেমন রাত্রিতে কোন পথহারা পথিক দূর হইতে কোন নগরের আলোর আভা দর্শনে আহ্লাদিত হয় আমিও সেই প্রকার মাথার উপরে রক্তময় আকাশ দেখিয়া আবার যেন লোকালয়ের নিকটে আসিয়াছি ভাবিয়া আনন্দিত হই-

লাম। দেখিতে দেখিতে সূর্য্য দূরে যাইতে লাগিল, ঐ একটু ডুবিল—আধখানা ডুবিল—সব ডুবিয়া গেল, তবু এখনও আকাশ লালবর্ণ। সূর্য্য তাহার জ্যোতি সঙ্গে করিয়া লইয়া যায় নাই; যেমন কোন সাধুলোকের মৃত্যুর পর তাঁহার যশ অনেক দিন পর্য্যন্ত এই পৃথিবীতে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকে, সেইরূপ অস্ত যাইবার পরেও সূর্য্যের আভা তাহার তেজের পরিচয় দিতে লাগিল। ক্রমে অন্ধকার আসিয়া সমস্ত আচ্ছাদিল। আবার সেই গভীর নীলবর্ণ আকাশ, কিন্তু এবার সে নীল চন্দ্রাতপ সহস্র সহস্র নক্ষত্র দ্বারা খচিত, ও তাহাদের মধ্যে চন্দ্রদেব বিরাজমান হইয়া চারিদিকে সুস্নিগ্ধ কিরণজাল বিস্তার করিতেছেন। সমুদ্রের দিকে নিরীক্ষণ কর, দেখিতে পাইবে শত শত চন্দ্রপ্রতিমা কম্পমান তরঙ্গরাজির মধ্যে নাচিতেছে, দুলিতেছে আবার বিলীন হইয়া যাইতেছে। আহা! কি চমৎকার শোভা! বসিয়া বসিয়া তারা ও নক্ষত্র দেখিতে লাগিলাম, ভাবিলাম ইহারাই কি আমাদের সেই ভারতবর্ষের তারা? ভারতবর্ষ ছাড়িয়া এত দূরে আসিয়াছি, এখানেও কি আবার সেই সকল তারা দেখিতে পাইব? কিন্তু ঐ যে আমার সেই চেনা শুক্র ও মঙ্গল নক্ষত্র; ঐ যে আমার সেই পুরাণ সাত ভাই, কালপুরুষ ও অন্যান্য তারাগুলি ঝকিতেছে। পরিচিত নক্ষত্রদের দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদ হইল। সেই কলিকাতার ছাদের উপর সকলে একত্র বসিয়া উহাদের দেখিতাম, উহাদের ত এখনও দেখিতেছি কিন্তু তাঁহারা কই, তাঁহাদের কি আবার দেখিতে পাইব?।

পরদিন সকালবেলা উঠিয়া দেখি সমুদ্র প্রায় পুকুরের মত

স্থির, ক্যাবিনের ছোট জানালা খুলিয়া সমুদ্র দেখিতে লাগিলাম; খানিকক্ষণ দেখিয়া আর ভাল লাগিল না, ঘণ্টা বাজাতে তাড়াতাড়ি পোষাক করিয়া খাইতে গেলাম। জাহাজে প্রতিবার আহারের সময় ঘণ্টা বাজায়। খাওয়ার পর আবার ডেকের উপর গিয়া সমুদ্র দেখিতে লাগিলাম, কিন্তু সেই একরকম সমুদ্র, একরকম জাহাজ, একরকম লোক; এইবার সমুদ্রের জীবন ক্লান্তিকর বোধ হইল। আমার স্বামী এই সময়ে আমার কাছে না থাকিলে বড় কষ্ট হইত, তিনি ভিন্ন আর কেহ কথা কহিবার লোক নাই। জাহাজে আরো স্ত্রীলোক আছে বটে কিন্তু তাহাদের সহিত কথা হইত না। শুনিয়াছি যখন ইংরাজেরা ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে যায়, তখন ভারতবর্ষীয়দের সহিত বেশ ভদ্রভাবে কথা কয় ও সমান সম্মান দেখে, কিন্তু যখন ভারতবর্ষ হইতে নিজদেশে ফিরিয়া যায়, তখন তাহারা ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করে, সে ভদ্রতা সব চলিয়া যায়। অতএব আমিও আর কাহারও সহিত কথা কহিতাম না।

এইরূপে ছয় দিন কাটিয়া গেল। শুক্রবার সকালে ডেকের উপর গিয়া দেখি, অনেক দূরে ধোঁয়ার মত কি একটা জিনিস রহিয়াছে; ক্রমে যত নিকটে যাইতে লাগিলাম তত উহা জমী বলিয়া বিশ্বাস হইল। মনে যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদ হইল তাহা বলিতে পারি না; ছয় সাত দিন ক্রমাগত জলের উপর থাকিয়া জমী দেখিতে পাইলে যে কত আনন্দ হয় তাহা সমুদ্রে না বেড়াইলে কেহ জানিতে পারেন্ না। এক সময়ে সমুদ্র দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইতাম এখন স্থল দেখিবার জন্য

চঞ্চল হইতেছি। ক্রমে জমী যত কাছে আসিতে লাগিল তত আহ্লাদ বাড়িল। দেখিতে দেখিতে বেলা দশটার সময় এডেন নগর আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। জাহাজে ভোঁ বাজাইয়া সকলকে জানাইল যে আমরা বন্দরের নিকটে পৌঁছিয়াছি। নাবিকেরা দৌড়াদৌড়ি করিয়া নঙ্গর ফেলিয়া দিল। জাহাজ থামিল।

অল্প দূরে এডেন নগর; কাল ও ধূসরবর্ণ পাহাড়, তাহাদের কোলে সাদা ও লাল লাল বাড়ী, তারপর রাস্তা, রাস্তার পরে আবার সমুদ্র; এডেন যেন সমুদ্র হইতে উঠিয়াছে। রাস্তার ধারে পাথর ও ইট দিয়া সমুদ্রের ঢেউকে দূরে রাখিবার জন্য অতি শক্ত বাঁধ বাঁধা রহিয়াছে। এদিকে দেখি জাহাজের দুধারে অনেকগুলি ছোট নৌকা আসিয়া লাগিয়াছে এবং জাহাজের দুপাশে সিঁড়ি ফেলিয়া দেওয়াতে অনেক নূতন লোক জাহজের উপর আসিতেছে। ইহাদের অনেকেই কিছু না কিছু বেচিতে আসিয়াছে; কেহ বড় বড় পালক দেখাইতেছে, কেহবা গহনা কিনিবার জন্য সাধিতেছে, আবার আর এক-স্থানে দেখি একজন পার্সী নানা প্রকার খেলানা সাজাইয়া বসিয়া আছে। জাহাজের ধারে আসিয়া আবার এক নূতন দৃশ্য দেখি; প্রায় পঁচিশ ত্রিশ জন ছোট ছোট ছেলে এক একটা ডিঙ্গি লইয়া জাহাজের দুপাশে "ওহো হ্যাভ এ ডাইভ্" অর্থাৎ "একটা ডুব দিতে আজ্ঞা হউক" বলিয়া চীৎকার করিয়া পয়সা চাহিতে লাগিল। সিকি কিম্বা দুআনী সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দিলে তাহা যতই কেন নীচে যাউক না উহারা অনা-য়াসে ডুব দিয়া তুলিয়া লয়। একটা ছেলে বলিল যে অন্য

পাশে সিকি ফেলিলে সে জাহাজের তলার নীচে দিয়া গিয়া উহা জলের ভিতর হইতে কুড়াইয়া লইবে; আমি একটা দুআনী ফেলিয়া দিলাম, দেখিলাম সে ডুব দিয়া গিয়া উহা কুড়াইয়া লইল, কিন্তু সে জাহাজের তল দিয়া গেল কি জাহাজের পাশ দিয়া গেল তাহা ঠিক বলিতে পারি না। যাহা হউক ইহাদের সাঁতার দিবার ক্ষমতা দেখিয়া এই বালকদের জলজন্তু বলিয়া মনে হয়। ইহাদের দেখিলে বোধ হয় না যে ইহারা কখন বাড়ে, আর সকলেই দেখিতে একরকম, অতিশয় কাল, মাথার চুলের রং বালির মত এবং চুল ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া, দেখিলে কাফ্রিদের প্রতিবাসী বলিয়া মনে হয়। এখানকার লোকেরা আরবী ভাষায় কথা কহে, কিন্তু এখানে ইংরাজ, ফরাসী ও অন্যান্য জাতিদের যাওয়া আসার দরুণ ইহারা ইংরাজী, ফরাসী ও হিন্দুস্থানী ইত্যাদি ভাষার গোটাকতক কথা শিখিয়া রাখিয়াছে, সেজন্য সকলের সঙ্গে কাজ চালায়।

বোধ হয় সকলেই জানেন যে এডেন ইংরাজদের অধিকৃত; ভারতবর্ষে যাবার আসিবার সময় ইহার পাশ দিয়া যাইতে হয় বলিয়া ইংরাজেরা এডেনের এত আদর করে এবং অনেকে এই নগরকে ভারতবর্ষের দ্বার বলিয়া বর্ণনা করে; এই নিমিত্তই ইংরাজরা এই মরুভূমিতে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে একদল সৈন্য রাখিয়াছে। ভারতবর্ষের সহিত এডেনের অতিশয় ঘনিষ্ঠতা থাকাতে ইংরাজেরা ইহাকে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভূত বলিয়া গণনা করে। এখানে প্রায় সব জাহাজই যাইবার সময় আট দশ ঘণ্টা থামে ও কয়লা লয়;

এই অবসরে জাহাজ-যাত্রীরা তীরে গিয়া এডেন নগর প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়ায়।

বেলা বারটার সময় আমরা নৌকা করিয়া তীরে গেলাম। সমুদ্রের ধারে বালি ধূধূ করিতেছে, আর তীরের উপর পার্সী ও ইংরাজদের গুটিকতক দোকান, দুই তিনটী হোটেল, পোষ্ট-আফিস ইত্যাদি আছে। আমরা একটী গাড়ী করিয়া নগরের ভিতর বেড়াইতে গেলাম। এখানে দেখিবার কিছুই নাই, কেবল কয়েকটী চৌবাচ্ছা বা পুকুর আছে। ঐ সকল চৌবাচ্ছা যে কে নির্ম্মাণ করিয়াছে তাহা কেহই জানে না। কথিত আছে, অনেক কাল পূর্ব্বে যখন এডেন আরবদের অধিকারে ছিল, তখন উহারা জলকষ্ট নিবারণের নিমিত্ত বৃষ্টির জল ধরিয়া রাখিবার জন্য ঐ সকল গভীর চৌবাচ্ছা খনন করিয়াছিল। এখন আর কেহই ঐ গুলির যত্ন করে না। এ দেশ অতি অনুর্ব্বরা ও বালিময়, সবুজ মাঠ বা গাছ পালা দেখিতে পাই না; এখানে উটেরাই সব জিনিস বয়, গুটিকতক ঘোড়া ও ঘোড়ার গাড়ীও আছে। এডেনের বাড়ীগুলা অনেকটা আমাদের বঙ্গদেশের বাড়ীর মত, ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি পাথর-নির্ম্মিত। যদিও সমুদ্রের বাতাস বয় তথাপি এখানে ভয়ানক গরম, তাহাতে আবার পানীয় জলের কষ্ট; এজন্য বোধ হয় সাধ্যমত এখানে কেহ থাকিতে চাহে না। কিন্তু কাজের জন্য অনেকের এক রকম করিয়া জীবন কাটাইতে হয়। এডেনে আরব, আফ্রিকাবাসী, য়িহুদি, ভারতবর্ষীয়, ইংরাজ, ফরাসী প্রভৃতি নানাজাতির লোক দেখিতে পাইলাম। এখানকার লোক সংখ্যা অতি অল্প, সৈন্য ব্যতিরেকে এই ক্ষুদ্র উপনিবেশের

প্রায় সকলেই বাণিজ্যে রত। পৃথিবীর চারি মহাদেশের পরস্পর বাণিজ্যস্রোত এডেনে আসিয়া একত্র মিলিত হয়; ভারতবর্ষ, চীন, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান, দক্ষিণ আফ্রিকা ইত্যাদি নানা দেশ হইতে জাহাজ সকল আসিয়া ইউরোপ বা আমেরিকা যাইবার কালে এডেন হইয়া যায়।

বেলা তিনটার সময় আবার জাহাজে আসিয়া দেখি উহা লোক ও কয়লার গুঁড়াতে পরিপূর্ণ। কিনারা হইতে নৌকা করিয়া কয়লা আনিয়া জাহাজের উপর তুলিয়া লয়, ইহাতে তিন চার ঘণ্টা লাগে, এবং এই সময়ে পাথরিয়া কয়লার গুঁড়া উড়িয়া জাহাজের উপরে সমস্ত জিনিসে পড়ে ও সব কাল করিয়া ফেলে। এই সময়ে সকল কামরার জানালা ও দরজা বন্ধ করিয়া রাখে এবং জাহাজের উপর লোকদের তিষ্ঠান ভার হইয়া উঠে। ঘণ্টা দুয়ের মধ্যে নাবিকেরা সব পরিষ্কার করিয়া ফেলিল। উপরি লোকেরা একে একে চলিয়া গেল; জাহাজ ছাড়িবার ভোঁ বাজিল। সম্মুখে এডেনের বন্দরে চাহিয়া দেখ, অনেকগুলি জাহাজ ভাসিতেছে—লাল, কাল, নীল, সাদা,—আবার প্রতি জাহাজের উপর ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের নিশান উড়িতেছে। সমস্ত জাহাজই ইউরোপীয়দের, তার মধ্যে অধিকাংশ ইংরাজদের; ভারতবাসীদের বা আসিয়ার অন্য কোন জাতির একটীও জাহাজ দেখিতে পাইলাম না। দেখিতে দেখিতে দুই তিনটা জাহাজ ছাড়িল, এইবার আমরাও চলিলাম। ক্রমে যত অন্ধকার হইতে লাগিল, এডেনকেও হারাইতে লাগিলাম।

পরদিন সকাল বেলা উঠিয়া দেখি আমরা লোহিত সাগরে

আসিয়াছি। লোহিতসাগর লাল বলিয়াই মনে বিশ্বাস ছিল, কিন্তু ভারতসাগরের মত ইহাও নীলবর্ণ। এখানে এই আশ্বিন-মাসে আমাদের দেশের জ্যৈষ্ঠমাসের মত গরম। লোহিতসাগর বেশি চেটাল নয়, বিশেষ এডেন হইতে ছাড়িয়া কতকদূর অতি অল্প প্রশস্ত। এখানে আমরা অসীম সমুদ্রের মধ্যে আছি বলিয়া বোধ হয় না, দুপাশেই দূরে আরব ও আফ্রিকার জমী দেখিতে পাইতেছি; ঐ দুই দেশের মরুভূমি হইতে মধ্যে মধ্যে ভয়ঙ্কর গরম বাতাস বহিতেছে। এই সাগর অতিশয় বিপদ-জনক, ইহার ভিতরে অনেক ছোট ছোট পাহাড় আছে, এজন্য এখানে অতি সাবধানে জাহাজ চালাইতে হয়। শুনিয়াছি, এই সাগরে অনেক জাহাজ ও লোক মারা পড়িয়াছে বলিয়া ইহাকে "লোহিত" সাগর বলে। আজ কাপ্তেন বড় ব্যস্ত, কর্ম্মচারীদের হাতে ভার না দিয়া নিজে জাহাজ চালাইতেছেন, খাবার পর্য্যন্ত অবসর নাই। এখানে দিনে সূর্য্য যেরূপ তেজাল, রাত্রিতে আকাশ সেইরূপ পরিষ্কার; তারা ও নক্ষত্রগুলি অতি-শয় ঝক্ ঝক্ করিতেছে, এবং উহাদের আভা সমুদ্রজলে প্রতিফলিত হওয়াতে সমস্ত আলোময় হইয়াছে। বাস্তবিক লোহিতসাগরে যেরূপ আকাশের শোভা দেখিয়াছি সেরূপ ভারতবর্ষে কখন দেখি নাই। এখানে আর একটী নূতন দ্রব্য দেখিলাম। দেশে শুনিয়াছিলাম, যে একরকম মাছ আছে তাহারা উড়ে, এখন সত্যসত্যই সেই উড়ামাছ দেখিতেছি। ইহারা পাখীর মত ক্রমাগত উড়িতে পারে না, কিন্তু সময়ে সময়ে হাঁসের মত জলের অল্প উপরে চার পাঁচ হাত দূর উড়িয়া গিয়া থাকে। ইহারা দেখিতে সাদা, তাহাতে কিঞ্চিৎ লালের

আভা আছে, এবং ইহাদের উপর যখন সূর্য্যকিরণ পড়ে তখন অতিশয় ঝক্‌মক্ করিয়া উঠে।

এই সকল দেখিতে দেখিতে কয়েক দিন কাটিয়া গেল। মঙ্গলবার রাত্রি প্রায় আট্‌টার সময়ে অনেক দূরে একটা আলো দেখিতে পাইলাম; অনেকে দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিতে লাগিল, কিন্তু কিসের আলো তাহা কেহই ঠিক করিতে পারিল না—কেহ বলিল, আর একটা জাহাজ, কেহ বলিল, সুয়েজনগরের আলো। আধ ঘণ্টা পরে আরো অনেকগুলা আলো দেখাতে জানিলাম যে আমরা সুয়েজনগরের নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছি; কিছুক্ষণ পরে জাহাজ থামিল। মনে করিয়াছিলাম যে সুয়েজে নামিয়া রেলে করিয়া আলেক-জাণ্ড্রিয়ায় যাইব, এবং তথা হইতে জাহাজে করিয়া ব্রিণ্ডিসি যাইব, কিন্তু তাহা হইল না। এই পথ দিয়া ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের ডাক চলিয়া থাকে, কিন্তু এই সময়ে চিঠি পত্রাদি পর্য্যন্ত লইয়া গেল না। ইহার কারণ, এতদিন মিসরদেশে যুদ্ধ চলিতেছিল, এখন যদিও যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে এবং আবার পথ খোলা হইয়াছে, তথাপি পাছে কোন গোলমাল হয় এইজন্য জাহাজযাত্রীদের কাহাকেও এখানে নামিতে দিল না। অতএব আমাদের সুয়েজখালের ভিতর দিয়া বরাবর জলপথে যাইতে হইবে। রাত্রিতে খালের ভিতরে জাহাজ চলিতে দেয় না সেজন্য সমস্ত রাত্রি আমরা বন্দরে রহিলাম। প্রায় দুই ক্রোশ দূরে সুয়েজনগর রহিয়াছে, কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইলাম না; যতক্ষণ পারিলাম আলোর দিকে চাহিয়া রহিলাম, অবশেষে ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইতে গেলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখি জাহাজের দুই দিকে অনেক ছোট ছোট নৌকা ও লোক আসিয়াছে, আর বন্দর নানাপ্রকার বর্ণের জাহাজে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এত জাহাজ আমি পূর্ব্বে কখন দেখি নাই, অল্প দিন হইল যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে বলিয়া এখনও জাহাজের ভিড় কমে নাই। প্রতি জাহাজের উপর দুই তিনটী নিশান উড়িতেছে; কোন্ জাতির জাহাজ তাহা জানাইবার নিমিত্ত একরকম নিশান আছে, আবার কোন্ কোম্পানীর জাহাজ ইত্যাদি দেখাইবার জন্যও ভিন্ন ভিন্ন নিশান টাঙ্গান আছে। দূরে সাদা সাদা বাড়ী দেখিতে পাই-তেছি; আবার নিকটে চারিদিকে দেখি লোকেরা বড় ব্যস্ত—উঠিতেছে, নামিতেছে, আসিতেছে, যাইতেছে,—দেখিলে উহাদের সঙ্গে কাজে যোগ দিতে ইচ্ছা করে। যে জাহাজগুলি রাত্রিতে খালে ছিল তাহারা একে একে বাহিরে আসিল, আর যে সকল জাহাজ আমাদের আগে বন্দরে আসিয়াছিল তাহারা একে একে খালে যাইতে লাগিল। এইরকমে বারটা বাজিল, বেলা একটার সময় আমাদের জাহাজ ছাড়িল ও আস্তে আস্তে খালে প্রবেশিল।

খালটী সরু, একখানির বেশী জাহাজ একেবারে যাইতে পারে না; জাহাজ জোরে চালাইলে দুধারের মাটী খসিয়া পড়িয়া খাল বুজিয়া যাইবে, এই জন্য অতি আস্তে আস্তে জাহাজ চলে। খালের মাঝে মাঝে কলের গাড়ীর ষ্টেশনের মত অনেকগুলি আড্ডা আছে; সেই সকল আড্ডার কাছে খালটা অধিক প্রশস্ত, দুটা জাহাজ একসঙ্গে হইলে এইখানে একটাকে থামায় আর অপরটা চলিয়া যায়। ক্রমে সুয়েজনগর

ছাড়িয়া আসিলাম; এখন খালের দুপাশে প্রায় মাঠ, অধিকাংশই বালিময় মরুভূমি, কেবল অনেক দূরে দূরে দুএকটা ঘর ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না। একেত জাহাজ এখানে অতি ধীরে ধীরে যাইতেছে তাহাতে আবার মাঝে মাঝে অনেকবার থামিতেছে আর রাত্রিতে একেবারে নিশ্চল; এই কারণে অধিক দূর যাইতে না যাইতে দুই রাত্রি কাটিয়া গেল। পরে একটী হ্রদের উপর আসিয়া পড়িলাম। এই হ্রদের সহিত খাল মিশিয়া যাওয়াতে এই ভাগটী অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত, এইজন্য এখানে জাহাজ একটু জোরে চলিতে লাগিল। বেলা এগারটার সময় আমরা ইস্মালিয়া নগরের নিকট আসিয়া পৌঁছিলাম; জাহাজ থামিল।

এখানেও দুই তিন খানা নৌকা জাহাজের কাছে আসিল, কিন্তু জাহাজের সিঁড়ি ফেলিয়া না দেওয়াতে কেহ জাহাজের উপর উঠিতে পারিল না; নৌকা হইতেই ডিম, মাছ, ফল ইত্যাদি বেচিতে লাগিল। এখানে অতি চমৎকার ফল পাওয়া যায়, আমি এখানে টাট্‌কা বেদানা, আঙ্গুর আপেল ও অন্যান্য অনেক সুস্বাদু ফল এই প্রথম খাইলাম। ক্রমাগত জল ও মাঠ দেখিয়া চক্ষুর ক্লান্তি হইয়াছিল, এখন অল্প দূরে সুন্দর সাদা সাদা বাড়ী ও সবুজ গাছপালা দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। এই ইস্মালিয়ায় একটা রাজবাড়ী আছে, এখানে মিসরের খেদিব কখন কখন আসিয়া বাস্ করেন।

এতক্ষণে আমরা অর্দ্ধেক খাল পার হইয়া আসিয়াছি, ইস্মালিয়া ছাড়িয়া আবার চলিলাম। পরদিন খালের ভিতর অনেকগুলি জাহাজের পাশ দিয়া গেলাম, তাহাদের মধ্যে

একখানি কলিকাতায় যাইতেছে দেখিয়া আমার মন টলিয়া গেল। আমি যদি ঐ জাহাজে থাকিতাম তাহা হইলে আজ আমার কত আহ্লাদ হইত, কিম্বা যদি কোন ভারতবর্ষীয় ঐ জাহাজে থাকেন, তিনি আজ কত মনের উল্লাসে দেশে ফিরিয়া যাইতেছেন! অনেক দিন বিদেশে থাকিলে স্বদেশ দেখিবার জন্য যে কি কষ্ট হয় তাহা বিদেশবাসীরাই জানেন।

(সুয়েজখাল সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় পঁয়তাল্লিশ ক্রোশ লম্বা, ইহার মধ্যে ছত্রিশ ক্রোশ দুশ আঠার হাত চওড়া, আর অবশিষ্ট নয় ক্রোশ একশ ত্রিশ হাত মাত্র চওড়া। এই খাল ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে খনন করিতে আরম্ভ করা হইয়াছিল, এবং ১৮৬৯ খৃঃ ইহার নির্ম্মাণ শেষ হইয়াছিল। মসিয়ো ফার্ডিনাণ্ড ডি লেসেপ্স নামক এক-জন বিখ্যাত ফরাসী সুয়েজখাল নির্ম্মাণের প্রথম কল্পনা করিয়া-ছিলেন এবং তাঁহার বুদ্ধি ও যত্নের বলে ইহা নির্ম্মিত হইয়া এখন সকল জাতির কত উপকার করিতেছে।) ইহা প্রস্তত করিতে প্রায় বাইশ কোটী টাকা ব্যয় হইয়াছিল, তাহা ছাড়া জমীর দাম দিতে হইয়াছিল, এবং মিসরের খেদিব বলপূর্ব্বক অনেক মজুরকে এই খালে বিনা পয়সায় খাটিতে আজ্ঞা দিয়া-ছিলেন। পূর্ব্বে লণ্ডন হইতে আফ্রিকার দক্ষিণ দিয়া ভারত-বর্ষে যাইবার পথ প্রায় ৫৫০০ ক্রোশ ছিল, সুয়েজখাল খননের পর ইহা ৩৭০০ ক্রোশ মাত্র, এবং ইহার ভিতর দিয়া যাওয়া আসা করাতে আগেকার অপেক্ষা ছত্রিশ দিন কম লাগে। লিখিত আছে যে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে এই খালের মধ্য দিয়া ১৬৫১ খানা জাহাজ গিয়াছিল, তাহার মধ্যে ১২৯১ খানা কেবল ইংরাজদের। ঐ সালে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ১৬০০০০০০ টাকা

উঠিয়াছিল, এবং এই খালের বার্ষিক প্রাপ্য প্রতিবৎসর বাড়িতেছে। ইহার সমস্ত কার্য্য একটী ফরাসী কোম্পানীর দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। মসিয়ো লেসেপ্স এই দলের কর্ত্তা, তাহাদের প্রধান কার্য্যালয় ফ্রান্সের রাজধানী পারিস নগরে অবস্থিত। যে সকল জাহাজ এই খালের মধ্য দিয়া যাতায়াত করে, তাহাদের প্রত্যেকের বোঝাই অনুসারে ঐ কোম্পানীকে টাকা দিতে হয়।

শুক্রবার সন্ধ্যা সাতটার সময় আমাদের জাহাজ খালের বাহিরে আসিয়া পোর্টসেড নগরের সম্মুখে দাঁড়াইল। এখন একটু পরিত্রাণ বোধ হইল, সমান জোরে জাহাজ চালাইলে প্রায় দশ ঘণ্টায় খাল পার হওয়া যায়, কিন্তু আস্তে যাওয়ার ও মধ্যে মধ্যে অনেকবার থামার দরুণ আড়াই দিন লাগিল। পোর্টসেডেও ভয়ানক জাহাজের ভিড়, রাত্রি বলিয়া সেগুলিকে ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম না, কেবল উহাদের আলোগুলি চক্ চক্ করিতেছে, দূর হইতে দেখিলে বোধ হয় যেন সমুদ্রের উপর হীরার মালা ভাসিতেছে। সমুদ্রের ধারেই অনেক দোকান, ঝক্‌ঝকে আলোতে তাহাদের অতিশয় শোভা হইয়াছে ; সেগুলি জাহাজ হইতে লোকের মন টানিতে লাগিল, কিন্তু রাত্রিবশতঃ কেহই কিনারায় নামে নাই। শুনিয়াছি, পোর্টসেড একটা বড় ভয়ঙ্কর স্থান, ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশের যত মন্দ লোক আসিয়া এইখানে জমা হয়।

আমরা যে জাহাজে আসিয়াছি সেটা বরাবর ইউরোপের দক্ষিণ ঘুরিয়া ইংলণ্ডে যাইবে, কিন্তু আমরা ও আর কয়েকটী যাত্রী ইটালি হইয়া ইউরোপের মধ্য দিয়া ইংলণ্ডে যাইব বলিয়া

এ জাহাজ ছাড়িলাম ও অপর এক জাহাজে উঠিলাম। এ নূতন জাহাজখানি আমাদের পূর্ব্ব জাহাজের অপেক্ষা কিছু ছোট, কিন্তু পরিষ্কার ও উঁচু। এ জাহাজে আমরা তিন চারি জন ভিন্ন আর কোন ভারতবর্ষীয় নাই; নাবিকেরা সব ইটালীয়, আর কাপ্তেন ও কর্ম্মচারী ইত্যাদিরা ইংরাজ। আধ ঘণ্টা পরে জাহাজ ছাড়িল। এইবার একেবারে আসিয়া ছাড়িয়া যাইতেছি বলিয়া মনে কষ্ট হইল। (পোর্টসেড ছাড়াইলেই আসিয়ার সহিত সমস্ত সম্বন্ধ চলিয়া যায়; পোর্টসেড পর্য্যন্ত মনে হয় না যে আমরা ভারতবর্ষ হইতে অনেক দূরে আসিয়াছি, যেহেতু এডেন, সুয়েজ ও পোর্টসেডের লোক বাড়ী ইত্যাদি দেখিয়া ক্রমাগত ভারতবর্ষকে মনে পড়ে, কিন্তু এখান হইতে সবই একেবারে ভিন্ন এবং যত দূরে যাও তত সকল স্থান ইউরোপের লোক ও নূতন রকম দ্রব্যে পরিপূর্ণ দেখিতে পাইবে।)

পরদিন উঠিয়া দেখি আমরা ভূমধ্যস্থ সাগরের উপর ভাসিতেছি। এখানেও আবার ভারতমহাসাগরের মত কেবল চারিদিকে নীল জল এবং মাথার উপর নীল আকাশ দেখিতে পাইতেছি। সোমবারে আমরা গ্রীসের নিকটবর্ত্তী ছোট ছোট দ্বীপের পাহাড় দেখিতে দেখিতে চলিলাম। সমুদ্রের আর শেষ নাই; আমরা এই দিন কতক সমুদ্রের উপর থাকিয়া এত বিরক্ত হইয়াছি, না জানি আগে যখন লোকে দেড় বৎসর, নয় মাস, ছয় মাস ও তিন মাসে ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে যাওয়া আসা করিত তখন তাহাদের মনে কত কষ্ট হইত! মঙ্গলবার ভোরের বেলা আমরা ইটালির দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে ব্রিণ্ডিসি নামক নগরের দুই ক্রোশ দূরে আসিয়া পৌঁছি-

লাম ; কিন্তু কি গেরো ! আমরা ব্রিণ্ডিসির এত কাছে তবুও নামিতে পাই না। পাছে মিসরদেশ হইতে ওলাউঠা আসিয়া ইউরোপে বিশেষতঃ ইটালিতে প্রবেশ করে এই ভয়ে ইটালীয়েরা জাহাজ হইতে তিন দিন নামিতে দিবে না। এই বন্দবস্তকে "কোয়ারাণ্টীন" বলে, এবং এই নিয়মটী বড় কড়া, এমন কি যখন ভারতবর্ষে বা মিসরে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব থাকে তখন ইহারা দশ, পনর ও কখন কখন পঁচিশ দিনও জাহাজে আটক করিয়া রাখে এবং কিনারার সহিত কোন সংস্রব রাখিতে দেয় না।

ঐ সম্মুখে ব্রিণ্ডিসি নগর, অনেক দূরে সাদা সাদা বাড়ী ও কিনারার নিকট অনেক জাহাজের মাস্তুল দেখা যাইতেছে এবং আমাদের সম্মুখ দিয়া দুই একটী ইটালীয় জাহাজ বন্দরের দিকে যাইতেছে, কিন্তু আমরা বন্দীর ন্যায় নিশ্চলভাবে বসিয়া আছি। বেলা সাতটার সময় ইটালীয় গবর্ণমেণ্টের একজন ডাক্তার ও দুইজন তত্ত্বাবধায়ক আমাদের মধ্যে কাহারও ওলাউঠা হইয়াছে কি না কিম্বা কেহ পীড়িত কি না দেখিতে আসিল ; জাহাজের সমস্ত লোককে তাহাদের সম্মুখে যাইতে হইল। আমাদের মধ্যে কাহারও কোন পীড়া হয় নাই, তথাপি তিন দিন বন্দরের নিকট কিম্বা ইটালির পার্শ্ববর্ত্তী সমুদ্রের উপর না থাকিলে কাহাকেও ইটালিতে নামিতে দিবে না। কেবল চটের থলিয়াতে পোরা চিঠি পত্রাদি আল্‌গোচে আল্‌গোচে লইয়া গেল। মিথ্যা সময় নষ্ট হওয়াতে সকলেরই বিরক্তি বোধ হইল, কিন্তু নাচার। জাহাজ তিন দিন বন্দরে না রাখিয়া কাপ্তেন উত্তর মুখে বেনিসের দিকে চালাইলেন। এখন

আমরা আড্রিয়াটিক সাগরে; ইটালীর পূর্ব্বদিকের জমী দেখিতে দেখিতে চলিলাম।

বুধবার বিকাল বেলায় চারিদিকে অনেক মাছ ধরিবার নৌকা দেখিতে পাইয়া লোকালয়ের নিকটে আসিয়াছি বলিয়া জানিলাম। ক্রমে দূরে বেনিস নগর দেখিতে পাইলাম; এখানে আবার জাহাজ থামিল। বেনিসে যাইবার জন্য সকলেই ব্যস্ত হইল, কিন্তু ব্রিণ্ডিসি হইতে এখনও তিন দিন হয় নাই বলিয়া বেনিসে নামিতে দিল না। ইটালীয় গবর্ণমেণ্টকে সকলে গালাগালি দিতে আরম্ভ করিল; ইহা ত ভারতের মত পরাধীন দেশ নয় যে ইংরাজেরা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে। এ স্বাধীন দেশ, ইহাতে অন্য কোন জাতির দাঁত ফুটাইবার ক্ষমতা নাই। এখানে এই ভাবে আর একদিন কাটিল। বৃহস্পতিবার বিকালবেলা আমরা আবার চলিলাম। এখনও আমরা একটা খালের ভিতর দিয়া বেনিসের দিকে যাইতে লাগিলাম, দুপাশে ছোট ছোট দ্বীপ, মধ্যে মধ্যে সবুজ গাছ ও সাদা লাল ইত্যাদি নানারকমের বাড়ী এবং তাহার পরে আবার জল। রাত্রি প্রায় আট্‌টার সময় আমরা বেনিসে আসিয়া পৌঁছিলাম; জাহাজ থামিল। শুনিলাম যে আবার পরদিন ভোরের বেলা বেনিস হইতে ডাক্তার আসিয়া জাহাজের লোকদের দেখিবে; মনে মনে বিরক্ত হইয়া ক্যাবিনে গেলাম।

পরদিন শুক্রবার বেলা ছটার সময় কিনারা হইতে ইটালীয় গবর্ণমেণ্টের ডাক্তার আসিয়া সমস্ত লোককে দেখিল। জাহাজে কাহারও পীড়া হয় নাই এবং ব্রিণ্ডিসি ছাড়িবার পর

তিন দিন সমুদ্রে কাটিয়াছে অতএব এইবারে জাহাজ হইতে মুক্ত হইব বলিয়া অতিশয় আনন্দ হইল। জাহাজের নঙ্গর তুলিয়া একেবারে কিনারার কাছে গিয়া লাগাইল। আমাদের দুধারে অনেক ছোট ছোট নৌকা আসিল; এইগুলিকে এদেশে গণ্ডোলা বলে, ইহাদের দেখিতে অনেকটা আমাদের দেশের ডিঙ্গীর মত। আমরা নামিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম, এমন সময়ে ইটালীয় গবর্ণমেণ্টের মাস্থলঘর হইতে দুই তিন জন লোক আসিয়া সকলের বাক্স পেঁটরাদি দেখিতে লাগিল। বিদেশের অনেক জিনিসের উপর মাস্থল দিতে হয়, বিশেষ তামাকের মাস্থল অধিক; নিজের আবশ্যকের অধিক জিনিস থাকিলে তাহার জন্য মাস্থল না দিলে কিম্বা তাহা লুকাইয়া রাখিলে জরিমানা করে বা অন্যপ্রকার শাস্তি দেয়। জাহাজ-যাত্রীদের সমস্ত জিনিস পত্র এইরূপে দেখা হইলে পর, আমরা ১৮ই অক্টোবর বেলা সাড়ে আট্টার সময় জাহাজকে বিদায় দিয়া গণ্ডোলায় করিয়া বেনিসে উৎরাইলাম।

---

# চতুর্থ অধ্যায়।

## বেনিস হইতে লণ্ডন।

আমরা গণ্ডোলায় করিয়া প্রথমে বেনিসের রেলওয়ে ষ্টেশনে গেলাম। মনে করিয়াছিলাম যে এবার সমুদ্র হইতে

নিষ্কৃতি পাইব কিন্তু তাহা না হইয়া এখনও সমুদ্রজল দেখিতেছি, সমুদ্রের জল আর ফুরায় না। এইরূপে অনেকগুলি খালের ভিতর দিয়া গিয়া ষ্টেশনে নামিলাম। সেখানে দেখি কেহই ইংরাজী জানে না, সকলেই ইটালীয়, কেহ কেহ ফরাসীতে কথা কহিতে পারে। সৌভাগ্যক্রমে আমার স্বামী ফরাসী জানাতে আমরা একরকম করিয়া কাজ চালাইলাম। জানিলাম যে রাত্রি এগারটার সময় আমাদের গাড়ী ছাড়িবে। ষ্টেশন হইতে আবার নৌকা করিয়া ছোট বড় নানারকম আকারের খালের ভিতর দিয়া গিয়া একটা হোটেলে নামিলাম। সেখানে খাওয়া দাওয়া করিয়া আমরা নগর প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইলাম। ইউরোপে আমার এই প্রথম পদার্পণ। বেনিস নগর দর্শনে আমার মনে যে কত কৌতূহল ও আহ্লাদ হইয়াছিল তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা অসাধ্য।

বেনিস ইটালীর উত্তর পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত ; ইহা একটী বড় মজার নগর, পৃথিবীতে এরকম স্থান আর কোথাও নাই। কতকগুলি ছোট ছোট দ্বীপ একসঙ্গে লইয়া এই নগর প্রস্তুত করা হইয়াছে, দেখিলে বোধ হয় যেন সমুদ্রমধ্য হইতে কতকগুলি বাড়ী ভাসিয়া উঠিয়াছে। অন্য সব নগরে যেমন রাস্তা এখানে সেই রকম খাল, কোথাও যাইতে হইলে বাড়ীর দরজার নিকট আসিয়া দেখিতে পাইবে অনেকগুলি নৌকা ভাসিতেছে, তাহাদের মধ্যে একটার উপর উঠিয়া ভাসিয়া ভাসিয়া যাইবে। প্রতি খালের দুপাশে সারি সারি বাড়ী সাজান এবং মধ্যে মধ্যে মাথার উপরে পোল ; কোন প্রকার গাড়ী ঘোড়ার শব্দ নাই, সকলেই চুপ্‌চাপ্‌। অন্যান্য নগরে ধনী-

লোকেরা যেমন গাড়ী ঘোড়া রাখে, এখানে সেই রকম গণ্ডোলা ও মাঝী রাখিয়া থাকে। এই নগরে একটীও ঘোড়া বা গাড়ী দেখিতে পাইলাম না। ঐ পোলগুলির উপর দিয়া পায়ে পায়েও সমস্ত নগর ঘুরিয়া বেড়ান যায়, কিন্তু প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর উঁচু উঁচু পোল,—অনেক সিঁড়ি ভাঙ্গিতে হয়, এজন্য এইরকমে যাওয়া আসা করা বড় কষ্টকর। শুনিয়াছি পূর্ব্বকালে একজন ইটালীয় রাজা অতিশয় সমুদ্রপ্রিয় ছিলেন, সমুদ্রের উপর বাড়ী করিতে তাঁহার বড় ইচ্ছা হইয়াছিল; তিনিই এই সামুদ্রিক নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

আমরা যে হোটেলে ছিলাম, তাহার পাশে সেণ্ট মার্ক চতুষ্কোণ নামক একটা বড় উঠানের মত পাথরে বাঁধান স্থান আছে, ইহার চারিদিকে নানাপ্রকার দ্রব্যের অনেক ভাল ভাল দোকান, সেগুলি উত্তমরূপে সাজান দেখিলে, চোক্ ফিরাইতে ইচ্ছা করে না। আমরা একটা সাধারণ বাগানে বেড়াইতে গিয়া দেখিলাম যে উহা লোকে পরিপূর্ণ, অধিকাংশই স্ত্রীলোক; গরিব, বড় মানুষ, স্ত্রী, পুরুষ সকলেই বেড়াইতেছে বা বসিয়া গল্প করিতেছে। ইহাদের দেখিয়া স্বদেশীয় অবরুদ্ধা ভগিনীদের কথা মনে পড়িয়া অত্যন্ত দুঃখবোধ হইল, তাঁহারা এ সুখ কি প্রকার তাহা একেবারে জানেন না। এদেশের স্ত্রীলোকেরা দেখিতে মন্দ নয়, বেশির ভাগই অতিশয় সুশ্রী। আমাদের মত ইহাদের মুখ চেটাল, চুল ও চোক কাল, কিন্তু রং বেশ পরিষ্কার সাদা অথচ ঘোরাল। ইহাদের দেখিলে অতি নম্র ও সরল বলিয়া বোধ হয়, এবং দিদি বলিয়া ডাকিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু দুঃখের বিষয় ইটালীয় ভাষা না জানাতে

ইহাদের সহিত কথা কহিতে পারিলাম না। পড়িয়াছি, ইটালীয় স্ত্রীলোকেরা সুশিক্ষিত নহে, কিন্তু ইহাদের দেখিলে একেবারে মূর্খ বলিয়া বোধ হয় না, এবং ইহাদের মনে যে একটা স্বাভাবিক সভ্যতা ও স্বাধীনতার তেজ আছে তাহা ইহাদের মুখে স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম।

বেলা শেষ হইলে আমরা হোটেলে আসিয়া আহারাদি করিলাম, তারপর একটু ঘুমাইয়া রাত্রি দশটার সময় ষ্টেশনে গিয়া কলের গাড়ীতে উঠিলাম এবং লণ্ডনের জন্য ছাড়িলাম। আর দু এক দিনের মধ্যেই আমাদের ভ্রমণ শেষ হইবে বলিয়া আহ্লাদ হইল। রাত্রি একরকম করিয়া কাটিয়া গেল। পরদিন প্রাতে ইটালীর উত্তর ভাগ দেখিতে দেখিতে চলিলাম। মনে হইল যদিও বেনিস আমাদের দেশের প্রায় সব নগর অপেক্ষা ধনী, তবুও ইটালী একটী গরিব দেশ; ইহাকে দেখিয়া আমাদের ভারতবর্ষকে মনে পড়ে।

ইটালীয়দের সহিত যে ভারতবর্ষীয়দের অনেক সাদৃশ্য ছিল এখনও তাহার অল্প অল্প প্রমাণ পাওয়া যায়। এখনও এখানকার গরিব স্ত্রীলোকেরা মাথায় টুপি পরার বদলে ঘোমটার মত রুমাল বাঁধে এবং অনেকে ভারতের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলবাসী স্ত্রীলোকদের মত কেবল জামা ও ঘাগ্‌রা পরে। অতি পূর্ব্বকালে হিন্দুরা ও রোমীয়েরা প্রায় এক সময়েই সভ্য ছিল, দুই জাতিই পৌত্তলিক ছিল এবং উভয়েরই আচার ব্যবহার ও পরিচ্ছদে অনেক সৌসাদৃশ্য ছিল। ইটালীয়েরা সেই সময় হইতে কত বদলাইয়াছে; আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম, পোষাক সবই একেবারে ভিন্ন। রোমরাজ্যের পতনের পর ইটালীর

অতি দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল; নিজ দেশের নাম ও গৌরব রক্ষা করা দূরে থাকুক স্বাধীনতা পর্য্যন্ত হারাইয়া ইটালীয়েরা পরস্পর বিবাদে রত হইয়াছিল। এইরূপে অনেক বৎসর অতীত হইলে উঁহারা ক্রমে নিজেদের দোষ ও হীনাবস্থা বুঝিতে পারিল এবং অবশেষে পরস্পর বিবাদ মিটাইয়া সুপ্রসিদ্ধ স্বদেশানুরাগী ম্যাট্‌সিনি, গারিবল্ডী প্রভৃতির সাহায্যে আবার স্বাধীনতা পাইয়াছে। কিন্তু অমাদের ভারতবর্ষের কি হইয়াছে? এক-জন বাঙ্গালী কবি বলিয়াছেন যে "ভারত সুধুই ঘুমায়ে রয়," ইহাই ঐ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর।

ক্রমে বেলা আট্‌টার সময় আমরা মিলান নামক নগরে পৌঁছিলাম, এখানে গাড়ী বদলাইয়া সুইট্‌জর্লণ্ড অভিমুখে চলিলাম। মিলান পরিত্যাগ করিয়া আমরা অল্পকাল পরেই পার্ব্বতীয় প্রদেশে আসিয়া পড়িলাম। আহা! কি মনোহর দৃশ্য! কলিকাতা হইতে বোম্বাই আসিবার সময় জব্বলপুরের নিকটস্থ পর্ব্বতময় দেশখণ্ডের অপরূপ শোভা দর্শন করিয়া একেবারে মোহিত হইয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু আজ যে অনুপম ও অনির্ব্বচনীয় নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য দেখিলাম এরূপ পূর্ব্বে কখনও কল্পনায় ধারণ করিতে পারি নাই, স্বপ্নেরও পর্য্যন্ত অগোচর বলিয়া বোধ হইত।

এখন আমাদের দুই ধারে উচ্চ উচ্চ পর্ব্বতরাজি শিখরদেশ দ্বারা আকাশমণ্ডল ভেদ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে; মধ্যে মধ্যে প্রস্রবণ হইতে ঝর ঝর শব্দে নির্ঝরসলিল নিঃসৃত হইয়া এই নীরব ও নিশ্চল প্রদেশের শান্তিভঙ্গ করিতেছে, এবং কিছু দূরে ঐ জলসমুচয় ক্ষুদ্র নদীর আকারে পরিণত হইয়া কল কল

শব্দে প্রবাহিত হইতেছে। কোথাও বা রাশীকৃত হইয়া হ্রদরূপ ধারণ করিয়াছে। অনতিদূরে তৃণবৃক্ষাদিপরিশোভিত শ্যামবর্ণ উপত্যকাপ্রদেশ বিস্তৃত রহিয়াছে, মধ্যে মধ্যে গরু, ঘোড়া প্রভৃতি জন্তুরা বিচরণ করিতেছে, এবং দু একটী লোকের বাসস্থানও দেখিতে পাইতেছি। এই সমস্তের উপর আবার সূর্য্যকিরণ পতিত হইয়া স্বভাবের দ্বিগুণতর শোভা সম্পাদন করিতেছে। চারিদিক নিস্তব্ধ, কেবল ঘট্ ঘট্ শব্দে অতি দ্রুতবেগে গাড়ী চলিতেছে। বা! স্বভাবের কি বৈচিত্র্য! প্রতি মুহূর্ত্তে নূতন নূতন দৃশ্য। এই পর্ব্বতের অধিত্যকা প্রদেশের উপর দিয়া গাড়ী চলিতেছে, কিছুকাল পরে আবার আমরা নিম্নাভিমুখে যাইতেছি। প্রবলবেগে অবতরণ কালে বোধ হইতেছে যেন পৃথিবী আকাশভেদী শৈলশিখর হইতে নামিয়া যাইতেছে; দূর হইতে যেগুলি পত্ররাশি বলিয়া মনে হইয়াছিল ক্ষণকাল পরে স্কন্ধভাগ নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদের বৃক্ষ বলিয়া জানিতে পারিতেছি; পূর্ব্বে যেগুলি অতি সঙ্কীর্ণ সামান্য জলরাশিবৎ দৃষ্ট হইতেছিল এখন তাহাদের স্বাভাবিক বিস্তৃতি দর্শন করিয়া সেগুলি বৃহদাকার নদী বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। পাহাড়ের পর পাহাড়, যত যাইতেছি ততই অভিনব দৃশ্য দেখিতে পাইতেছি। স্বভাবের মূর্ত্তি ক্রমে আরো গম্ভীর হইয়া আসিল। সম্মুখে একটা অতি উচ্চ পর্ব্বত দৃষ্ট হইতেছে, মনে হইল এইবার কলের গাড়ীর গতি রুদ্ধ হইয়া যাইবে, কিন্তু দেখিতে দেখিতে উহা পর্ব্বত ভেদ করিয়া চলিয়া গেল; এইরূপ কত সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া আমরা ঊর্দ্ধ-শ্বাসে যাইতে লাগিলাম।

ক্রমে ইটালীর উত্তরকোণে এক উপত্যকা প্রদেশে উপস্থিত হইলাম। এখানে আবার এক নূতন দৃশ্য। সহসা প্রকৃতি যেন প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিল। পর্ব্বতগুলিকে অনেক দূরে ফেলিয়া আসিয়াছি এবং সম্মুখেও অতি অন্তরে দুই একটী পাহাড় অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে। চারিদিকে বৃক্ষলতাদিপরিপূর্ণ ক্ষেত্র; অদূরে এক রমণীয় জলাশয় বিস্তৃত রহিয়াছে; তাহার চারি পার্শ্বে কয়েকটী শুভ্রবর্ণ বাসভবন উত্থিত হইয়াছে। হ্রদতীরে স্ত্রী পুরুষ সকলে মনের আনন্দে বেড়াইতেছে, বালক বালিকারা স্বচ্ছন্দভাবে খেলা করিতেছে, হংস প্রভৃতি জলচরগণ জলের উপর সুখে সন্তরণ দিতেছে। শরত কাল উপস্থিত কিন্তু এখনও এই শীতপ্রধান দেশে তরুলতাদি মলিন হইয়া যায় নাই; মারুতহিল্লোলে ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া ফুলরাজি প্রকৃতিকে হাস্যবদনা করিয়া দিতেছে। কিছু দূরে দুই একজন কৃষক কৃষিকর্ম্মে ব্যাপৃত রহিয়াছে, এখনও এই স্থানে দুর্দ্দান্ত শীত ঋতু আসিয়া বসুমতীকে ফলহীনা করে নাই। উপরদিকে আকাশে মধ্যে মধ্যে মেঘ উড়িতেছে, তাহার প্রতিবিম্ব স্বচ্ছ ও কম্পমান সরোবরজলে পতিত হইয়া উহার মনোহারিতা অধিকতর বর্দ্ধিত করিতেছে। এখন কার্ত্তিকমাসের প্রারম্ভ, কিন্তু ইহার মধ্যেই সূর্য্যের প্রখরতা মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে; বেলা দুই প্রহর হইলেও মৃদু মৃদু সুশীতল সমীরণ বহিয়া শরীর জুড়াইয়া দিতেছে। এই কমনীয় শোভা পর্য্যালোচনা করিতে করিতে আমার তন্দ্রা উপস্থিত হইল; কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত আমি নিদ্রাভিভূতা হইয়া রহিলাম।

হঠাৎ আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। উঠিয়া দেখি এক ভীষণ অন্ধকার পর্ব্বতময় স্থানে আসিয়া পড়িয়াছি; দুই পাশে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষহীন পর্ব্বত উঠিয়াছে, যতই উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করি গিরিশিখরের প্রান্তভাগ আর সম্যক্‌রূপে নয়নগোচর হয় না। এমন দুরূহ ও নয়নের অপ্রীতিকর শৈলসমূহ পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। একটীও সবুজবর্ণ লতা বা পাতা দৃষ্ট হয় না। অধিত্যকাপ্রদেশে প্রস্তরখণ্ডগুলি যেন স্খলিত হইয়া পড়িতেছে; মনে হইল এই পতনোন্মুখ পাষাণ সমুদায় অবিলম্বেই আমাদের অস্থি চূর্ণ করিবে। মধ্যে মধ্যে ভীমাকার পর্ব্বতগুহা মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছ; সূর্য্যের রশ্মি এস্থলে কখন প্রবেশিতে পারে না। কোথাও কোথাও পর্ব্বতের উচ্চপ্রদেশ হইতে অতি প্রচণ্ডবেগে এবং ঘোরতর গর্জ্জনপূর্ব্বক নির্ঝরজল পতিত হইয়া চারিদিক শব্দময় করিয়া দিতেছে, তাহাতে আবার গাড়ীর ঘট্‌ ঘট্‌ শব্দ পর্ব্বতব্যূহে প্রতিধ্বনিত ও পুনঃ প্রতিধ্বনিত হইয়া কর্ণ বিদারিতেছে। মনে হইল প্রকৃতির কি বিপর্য্যয়, এ নির্জ্জন স্থানে এমন ভয়ঙ্কর কোলাহল! নিকটে চাহিয়া দেখি আমাদের অনেক নীচে ভূতল পড়িয়া রহিয়াছে; আমরা একটী অতি সঙ্কীর্ণ সেতুর উপর দিয়া যাইতেছি, নিম্নদিকে দৃষ্টিপাত করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

ক্রমে আমরা আরো উচ্চদেশে আসিলাম। অতিশয় শীত বোধ হইতে লাগিল, আমাদের নিকটে অধিক গরম কাপড় ছিল না, যাহা ছিল তাহাই জড়াইয়া গাড়ীর জানালা বন্ধ করিয়া বসিয়া রহিলাম। কিন্তু স্বভাবের অপূর্ব্ব শোভা দর্শনে যার পর নাই আনন্দিত ও স্তম্ভিত হইয়া সে শীতকষ্ট সব

ভুলিয়া গেলাম। এখন আমরা আল্পস পর্ব্বতের পাদদেশে উপস্থিত হইয়াছি। পূর্ব্বকার দৃশ্যসকল এখন ইহার কাছে তুচ্ছ বোধ হইতে লাগিল। প্রকৃতির ঐশ্বর্য্য ও মহিমা নিরীক্ষণ করিয়া একেবারে বাক্‌শূন্য হইয়া একদৃষ্টিতে ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া রহিলাম। শৃঙ্গের উপর শৃঙ্গ উঠিয়াছে কোথাও একটু বিচ্ছেদ দেখিতে পাই না। পর্ব্বতের নিম্নভাগ নানাপ্রকার বিচিত্র লতাবৃক্ষাদি দ্বারা আচ্ছাদিত, কিন্তু যত ঊর্দ্ধে দেখি ততই তরু লতা বিরল হইয়া আসিয়াছে; কিছু উপরে আর একটীও সবুজ দ্রব্য দেখিতে পাই না—কেবল ধূসরবর্ণ অনাবৃত পাষাণরাশি। উচ্চ উচ্চ শৃঙ্গগুলি ধবলবর্ণ তুষারে আবৃত, তাহার উপর অরুণ-কিরণ পতিত হওয়াতে হিমানীপুঞ্জ অতিশয় ঝক্ মক্ করিতেছে; দূর হইতে মনে হয় যেন পর্ব্বতরাজ হীরার মুকুট পরিয়া বসিয়া আছেন। আমি এই প্রথম বরফ দেখিলাম, এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া যে কত চমৎকৃত ও আনন্দিত হইলাম তাহা প্রকাশ করিতে পারি না। মধ্যে মধ্যে নির্ঝর-নির্গত জল শুভ্রবর্ণ বেণীর ন্যায় অতি কুটিলভাবে পর্ব্বতের পৃষ্ঠদেশে প্রবাহিত হইতেছে, কখন বা ঐ জলস্রোত পাষাণখণ্ডে প্রতিহত হওয়াতে চারিদিকে জলকণা উৎক্ষিপ্ত হইতেছে, আর তাহার উপর সূর্য্যকিরণ পতিত হইয়া রামধনুর বিচিত্র শোভা সম্পাদন করিতেছে। কোথাও আবার একেবারে মরুভূমির মত উদ্ভিদ্‌শূন্য স্থান অনেক দূর অবধি ঢালু হইয়া গিয়াছে; কোথাও বা অতিশয় বন্ধুর ও দুরারোহ, মনে হয় না যে কোন প্রাণী এইস্থানে বাস করিতে পারে।

এই সকল অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় দৃশ্য অবলোকন

করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার অচিন্ত্য শক্তি ও অনুপম কীর্ত্তি ভাবিতে ভাবিতে চলিলাম; এই অদ্ভুত দৃশ্য সমুদায় তাঁহারই ঐশ্বর্য্য ও মহিমার পরিচয় দিতেছে। এরূপে আমরা আল্‌স পর্ব্বতের সেণ্টগথার্ড নামক শৃঙ্গের অতি নিকটে আসিয়া পড়িলাম। একেবারে সম্মুখে অতি উচ্চ, প্রকাণ্ড ও ভীষণাকার পর্ব্বত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; দেখিয়া বোধ হইল যেন উহা অতি গম্ভীর মূর্ত্তিতে আমাদের দূরে রহিতে বলিতেছে,—পাছে আমাদের স্পর্শে উহা কলঙ্কিত হয়। মনে হইল এইবার মানুষ প্রকৃতির নিকটে হারি মানিল, এই দুর্গম পর্ব্বত আর উল্লঙ্ঘন করিতে পারিব না। কিন্তু মানুষের বিদ্যা ও বুদ্ধিকে শত শত ধন্যবাদ! এই দুর্ভেদ্য আল্‌স পর্ব্বত ভেদ করিয়া মানুষের বিজ্ঞান ও কৌশল বলে এত সুড়ঙ্গ নির্ম্মিত হইয়াছে। আমরা এই সেণ্টগথার্ড সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া চলিলাম এবং ইটালী অতিক্রম করিয়া সুইটজর্লণ্ড দেশে আসিয়া পৌছিলাম।

সুড়ঙ্গের পাশেই ষ্টেশন; শুনিলাম এখানে গাড়ী প্রায় আধ ঘণ্টা থামিবে। আমরা নামিয়া আহারাদি করিয়া ষ্টেশনের চারিদিকে বেড়াইতে লাগিলাম। সম্মুখেই প্রকাণ্ড পর্ব্বত, নীচে সুড়ঙ্গটীকে একটা অন্ধকার ছিদ্রের মত দেখা যাইতেছে। এই ভীষণ পর্ব্বতের ভিতর দিয়া আমরা আসিয়াছি; মনে করিলাম মানুষ কি না করিতে পারে। সুড়ঙ্গের বিষয় ভাবিতে লাগিলাম। ইহার অন্যদিকে ঐরোলো নামে একটী ইটালীয় ছোট নগর, আর এদিকে সুইটজর্লণ্ডদেশের ঘোষেণেন নামক একটী গ্রাম। সুড়ঙ্গটী লম্বে প্রায় পাঁচ ক্রোশ এবং পনর হাত মাত্র চওড়া, কেবল দুইটী গাড়ী একসময়ে

পাশাপাশি যাইতে পারে। ইহার ভিতর দিয়া আসিতে আমাদের প্রায় পঁচিশ মিনিট লাগিয়াছিল। ভিতরে কিছুই দেখিতে পাই নাই, একেবারে ঘোর অন্ধকার; কেবল কলের গাড়ীর শব্দ ভিন্ন আর কিছুই শুনিতে পাই নাই। ইটালী ও সুইটজর্লণ্ড দুই দিকেই একসময়ে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে এই সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এবং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ইহার নির্ম্মাণ শেষ হয়। ইহার নির্ম্মাণে প্রথমে নয় কোটি টাকা খরচ হইবে হিসাব হইয়াছিল কিন্তু শেষ হইলে পনর কোটি টাকা ব্যয় পড়িয়াছে ঠিক হইল। ইটালী ও ফ্রান্সের মধ্যে আল্‌প্স পর্ব্বতের ভিতর দিয়া মণ্টসেনিস নামক আর একটী এইপ্রকার সুড়ঙ্গ আছে, কিন্তু সেটী সেণ্টগথার্ড সুড়ঙ্গ অপেক্ষা ছোট, এইটী প্রস্তুত করিতে তাহার চেয়ে অধিক বুদ্ধি ও কৌশলের আবশ্যক হইয়াছিল। ইউরোপীয় ইঞ্জিনিয়ারদের বিদ্যা ও বুদ্ধির ক্ষমতা ভাবিতে ভাবিতে আবার আমরা বেলা চারটার সময় গাড়ীতে উঠিলাম।

এখন আমরা পর্ব্বতময় সুইটজর্লণ্ড দেশের ভিতর দিয়া যাইতে লাগিলাম। চারিদিকেই পূর্ব্বকার মত পর্ব্বতমালা; কখন পাহাড়ের উপরে, কখন ভিতরে, কখন বা পাশ দিয়া গাড়ী চলিতেছে। ফিরিয়া দেখিলাম আর সেণ্টগথার্ডের উচ্চ শৃঙ্গ নয়নগোচর হয় না। কলের গাড়ীর পথ নিরীক্ষণ করিয়া বোধ হইল যেন ঠিক সাপ খেলাইয়া গিয়াছে, এই একটা পাহাড়ের উপর দিয়া আসিতেছিলাম, কিছুক্ষণ পরে আবার সেই পর্ব্বতের নীচে আসিয়া পড়িলাম। এইরূপ দুর্গম ও বন্ধুর দেশে রেলপথ নির্ম্মিতে যে কত কৌশল ও কত পরিশ্রম লাগি-

যাছে তাহা ভাবিয়া ইউরোপীয়দের বিজ্ঞানবলকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না। আবার কলের গাড়ীর কল্যাণে আমরা কত শীঘ্র চলিতেছি। এই সকাল বেলা ইটালিতে ছিলাম আর এখন বিকাল বেলায় সুইটজর্লণ্ডের ভিতরে রহিয়াছি; তখন এক ভাষায় কথা শুনিতেছিলাম এখন আবার এক সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষার কথা শুনিতেছি। এইরূপে সুইটজর্লণ্ডের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিলাম।

এখানকার মাটী অতি উর্ব্বরা বলিয়া বোধ হইল; দুই দিকে ঝরণার জল পড়িয়া মাঝে মাঝে ছোট নদী ও হ্রদ হওয়ায় এদেশ অতিশয় ফলশালী হইয়াছে। এ প্রদেশে অতিশয় শীত—বৎসরের মধ্যে আট মাস শীতকাল; এখন কার্ত্তিক মাসের আরম্ভ, ইহার মধ্যেই এদেশে বরফ পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে, তথাপি উপত্যকাখণ্ডে নানাপ্রকার সবুজ-বর্ণ লতা বৃক্ষাদি দেখিতে পাইতেছি। মধ্যে মধ্যে বৃহৎ বৃক্ষ উঠিয়াছে, এই বিকাল বেলার মন্দ মন্দ বাতাসে তাহাদের শ্যামপর্ণাবৃত শাখাগুলি অল্প অল্প দুলিতেছে, দেখিয়া চক্ষু জুড়াইয়া যায়। এখানকার অধিকাংশ বাড়ী পাথরের এবং কোন কোনটা কাঠের নির্ম্মিত, ছাদগুলি গড়ানে, আর সকল বাড়ীর ছাদের উপর বড় বড় ধোঁয়ানল বসান আছে। পর্ব্বতের উপরে সাদা সাদা বাড়ীগুলি দেখিয়া গাড়ী হইতে দৌড়াইয়া গিয়া ঐ বাড়ীর নিকটে যাইতে ইচ্ছা করিতেছে। শীত হইলেও এ পর্ব্বতময় দেশে বাস করিতে কি সুখ! আ! কি পবিত্র স্থান! মনে হয় এই পুণ্যস্থানে কখন পাপ প্রবেশিতে পারে না, লোকেরা মুনির মত পবিত্রভাবে অবস্থান করে।

ক্রমে বেলা অবসান হইল। আমরা পর্ব্বতময় দেশ ছাড়াইয়া সমতল দেশে আসিয়া পড়িলাম। অনেক পশ্চাতে পর্ব্বতগুলিকে ফেলিয়া আসিলাম। মনে হইল যেন স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে অবতরণ করিলাম। সূর্য্য অস্ত গেল, সন্ধ্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। এইরূপে রাত্রি প্রায় নয়টার সময় আমরা সুইটজর্লণ্ডের উত্তরপশ্চিম প্রান্তে রাইন নদীর তীরবর্ত্তী বাসল্ নামক নগরে পৌঁছিলাম। এখানে আমরা গাড়ী বদলাইয়া সুইটজর্লণ্ড ছাড়িয়া আবার উর্দ্ধশ্বাসে চলিলাম। এখন অন্ধকার, কিছুই দেখিতে পাই না; কেবল জানি যে আমরা জর্ম্মাণি দেশের দক্ষিণ পশ্চিম ভাগের ভিতর দিয়া যাইতেছি। কিছুকাল পরে ক্লান্তিবোধ হওয়াতে ঘুমাইয়া পড়িলাম। গভীর রাত্রিতে উঠিয়া দেখি একটী ষ্টেশনে গাড়ী থামিয়া রহিয়াছে, আর লোকজন চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কিছুক্ষণ পরে একজন কর্ম্মচারী আমাদের কাছে কোন শুল্ক দিবার দ্রব্য আছে কি না দেখিতে আসিল। জানিলাম আমরা আবার একটা দেশ ছাড়াইয়া অন্য একটা ভিন্ন দেশে পৌঁছিয়াছি। এতক্ষণ কর্কশ জর্ম্মণভাষা শুনিতেছিলাম এখন শ্রুতিমধুর ফরাসী ভাষায় কথা বার্ত্তা শুনিতে পাইতেছি। এইবার আমরা ফ্রান্সে প্রবেশিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে ফ্রান্সের উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ভিতর দিয়া চলিলাম। এখানকার ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা, দুই পাশেই সবুজবর্ণ শস্যপরিপূর্ণ ক্ষেত্র দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু এখন আমরা ক্রমাগত সমতল দেশের ভিতর দিয়া যাইতেছি, আর পূর্ব্বদিনের ন্যায় অদ্ভুত স্বাভাবিক দৃশ্য দেখিতে পাই না। অবশেষে বেলা একটার

সময় ফ্রান্সের উত্তর পশ্চিম কোণে কালে নামক নগরে আসিয়া পৌঁছিলাম।

এই নগরটী একটী প্রসিদ্ধ বন্দর, একেবারে সমুদ্রের ধারে অবস্থিত। বাড়ীতে বসিয়া দেখ সম্মুখে প্রশস্ত সমুদ্র; কত জাহাজ আসিতেছে—যাইতেছে, কত রকম জিনিসের আমদানি ও রপ্তানী হইতেছে, দেখিলেই মনে হয় যে ইহারা কাজের লোক বটে। নগরটী চারিদিকে দেয়ালে ঘেরা। শুনিয়াছি ফ্রান্সের রাজধানী পারিস ও অন্যান্য অনেক প্রধান নগর আমাদের দেশের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের জয়পুর, দিল্লী প্রভৃতি নগরের মত প্রাচীরে বেষ্টিত। কালে নগর দেখিলে বোধ হয় যেন এটী জাহাজের নগর; চারিদিকে শত শত লোক জাহাজের কাজ করিতেছে—জাহাজ নির্ম্মাণ বা মেরামত করিতেছে। এই সকল দেখিলে ফরাসীদের ধন ও প্রভাব জানা যায়।

ফরাসীদের সহিত কথাবার্ত্তা করিলে ইহাদের বেশ চালাক ও সামাজিক বলিয়া বোধ হয়। বুদ্ধি ও শিল্পকৌশলের জন্য ইহারা সর্ব্বত্র বিখ্যাত, সেজন্য ইহাদের সম্বন্ধে আমার অধিক লিখিবার প্রয়োজন নাই। ফরাসী পুরুষদের মধ্যে অনেককে দেখিতে অতি সুশ্রী; এবং স্ত্রীলোকেরা অতিশয় নম্র ও লজ্জাশীলা। ইহারা 'বাবু' নহে, গরিব স্ত্রীলোকেরা স্বামীর সঙ্গে সমান কাজ করে, লাঙ্গল বহে, জল টানে—এইরূপে অনেক শক্ত কাজে স্বামীর সাহায্য করে। ইহাদের মুখে কেমন একটা সরলতা ও স্বাধীনতার ভাব আছে তাহা দেখিলে ফরাসী-মহিলাদের ভালবাসিতে ইচ্ছা করে। শুনিয়াছি ফরাসী-মাতারা আমাদের ভারতীয় জননীদের মত সন্তানের প্রতি

অতিশয় স্নেহময়ী, ইঁহারা নিজ সুখের জন্য ছেলেদের অবহেলা বা অযত্ন করেন না। ফরাসী স্ত্রীলোকেরা বাল্যকাল হইতেই জ্ঞান ও সভ্যতায় শিক্ষিত হয়। ইহাদের রুচি অতি চমৎকার, যাহার যেটী মানাবে সে সেই পোষাকটী পরে, কেবল দেখাই-বার জন্য কতকগুলা পোষাক পরিয়া আপনাকে কুৎসিত করে না। শুনিয়াছি ইহারা পিতা মাতার বাধ্য, তাঁহাদের অসম্মতিতে কখন বিবাহ করে না। ফরাসীরা বাহিরের চাকচিক্য বড় ভাল বাসে। এখানকার গির্জ্জা ও বড় বড় সাধারণ স্থান দেখিতে অতি সুন্দর, এইগুলির শিল্পকৌশল দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ফরাসীরা স্বার্থপর নহে; গরিব, ধনী, মধ্যবিত্ত সকল রকম লোকেই এক সঙ্গে মিলিয়া কথা কহে ও গল্প করে। ইহারা এত সামাজিক যে কেহ অপরিচিত হইলেও তাহার সহিত বন্ধুভাবে কথা কহিবে ও আলাপ করিবে। এখানকার গরিব লোকেরা পর্য্যন্ত অতিশয় বিনয়ী, এবং শুনিয়াছি ইহারা ইংরাজ দরিদ্রদের মত মাতাল হইয়া পশুর ন্যায় ব্যবহার করে না। ফরাসীরা অত্যন্ত মিতব্যয়ী; যাহার যে প্রকার আয় সে তদনুরূপ বাঁচাইতে চেষ্টা করে; এই মিতব্যয়িতার জন্যই ইহারা অনেক সময়ে দুর্ভিক্ষের কষ্ট পায় না। ফ্রান্স নগরের বাড়ীগুলি পাথর ও ইটে নির্ম্মিত, দেখিলে আমাদের দেশের কাশী ইত্যাদি নগরের বাড়ী মনে পড়ে। এখানকার বাড়ীগুলি ছয় সাত তোলা উঁচু, কিন্তু ছোট ছোট তোলা। শুনিয়াছি ফ্রান্সে শীতকালে ইংলণ্ড অপেক্ষা অধিক শীত এবং গ্রীষ্মকালে সময়ে সময়ে ভারতবর্ষের মত গরম হয়।

কালে হইতে খাওয়া দাওয়া করিয়া বেলা তিনটার সময়

আমরা জাহাজে উঠিলাম। ডোভরপ্রণালী পার হইয়া বেলা পাঁচটার সময় ইংলণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে সমুদ্রতীরস্থিত ডোভরনগরে আসিয়া পৌছিলাম। প্রণালীটী অতি অপ্রশস্ত, অতি নিকটে একদিকে ইংলণ্ড ও অন্যদিকে ফ্রান্স থাকায় জল বেশি খেলিতে পায় না, আর আটলাণ্টিক মহাসাগর ও বিস্কে উপসাগর হইতে প্রায়ই ভয়ঙ্কর ঝড় তুফান আসে, এজন্য এই প্রণালীতে ক্রমাগত প্রচণ্ড ঢেউ উঠে। এখানে প্রায় সকলেরই সমুদ্ররোগে মাথা ঘুরিয়া বমি হইয়াছিল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে বোম্বাই হইতে ছাড়িয়া ইংলণ্ডে পৌছান পর্য্যন্ত আমার এক মুহূর্ত্তেরও নিমিত্ত সমুদ্ররোগ হয় নাই।

ডোভরনগরে আসিয়াই একেবারে তীরের উপর কলের গাড়ী দেখিতে পাইলাম, এবং কোন বিলম্ব না করিয়া গাড়ীতে উঠিলাম ও লণ্ডন অভিমুখে চলিলাম। যতক্ষণ কলের গাড়ীর ভিতর বসিয়াছিলাম ততক্ষণ মনে এক রকম নূতন ভাবের উদয় হইতে লাগিল। (আজ আমি সেই অবগুণ্ঠনবতী বঙ্গমহিলা ইংলণ্ডে! যে ইংলণ্ডের বিষয় কত আগ্রহের সহিত পড়িয়াছি ও শুনিয়াছি, আজ আমি সেই বহুদূরস্থিত ইংলণ্ডে উপস্থিত।

২০শে অক্টোবর রবিবার রাত্রি সাড়ে আটটার সময় আমরা লণ্ডনে আসিয়া পৌছিলাম। লণ্ডনে আসিয়া আমরা চেয়ারিং ক্রস ষ্টেশনে নামিলাম। নামিয়া দেখি ষ্টেশনে দিনের মত আলো হইয়াছে, চারিদিকে বৈদ্যুতিক আলো সূর্য্যের ন্যায় ঝকিতেছে। আজ রবিবার বলিয়া অন্য কোন

স্থানে যাওয়া সুবিধা নয়, এজন্য ষ্টেশনের নিকটেই একটী বৃহৎ হোটেলে গেলাম। ক্রমাগত চব্বিশ দিন জলে, ও স্থলে ভ্রমণ করিয়া অতিশয় ক্লান্ত হইয়া ছিলাম, আজ বহুদিন পরে একটী নিশ্চল গৃহে বসিয়া নিরুদ্বেগ চিত্তে বিশ্রাম লাভ করিলাম।

---

# পঞ্চম অধ্যায়।

## নানাপ্রকার চিন্তা।

আমি কয়েক মাস হইল ইংলণ্ডে আসিয়াছি। আমার খাওয়া দাওয়া, পোষাক ইত্যাদি সব ইংরাজী ধরণে চলিতেছে; হয়ত কোন দেশীয় লোক দেখিলে আমাকে 'পাকা মেম সাহেব' বলিয়া উপহাস করিবেন—করুন, সে ঠাট্টা আর আমার গায়ে লাগিবে না। উপহাস সকলেই করিতে পারে, এবং অনেক স্থলে কুসংস্কার ও অনভিজ্ঞতাই উহার সূত্র। আমাদের দেশীয় লোকদের উপহাসই আমাদের দেশের উন্নতিপথের কণ্টক হইয়াছে। কেহ যদি কোন নূতন বিষয়ে হস্তার্পণ করেন, তাহা হইলে অমনি দেশশুদ্ধ লোক তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া উড়াইয়া দেন, ভাল মন্দ বিচার না করিয়া তাঁহার উপর একেবারে খড়্গহস্ত হন, এবং সেটা পরে ভাল বলিয়া প্রমাণিত হইলেও কেহ তাঁহার সহিত সে বিষয়ে যোগ দিতে অগ্রসর হন না, বরং পশ্চাৎ ফিরিয়া যান। সকল দেশেই কোন নূতন বিষয় অবলম্বন করিলে

লোকে প্রথমে বিদ্রূপ করে, কিন্তু প্রভেদ এই, যে আমাদের দেশে সে অবলম্বিত বিষয় ভাল হইলেও লোকে তাহা হইতে বিমুখ হয়, আর এ সব দেশে তাহার আদর করে। অবশ্য যাঁহারা কেবল বাহ্য বিষয়ের অনুকরণ করেন এবং আন্তরিক গুণ কিম্বা সৎ আচার ব্যবহার বাছিয়া না লইতে পারেন, তাঁহারা যথার্থ উপহাসের পাত্র। কিন্তু আবার দেখিতে হইবে, যে পোষাক ইত্যাদি বাহিরের জিনিস বদলাইলেই মন বদলায় না, এবং বিদেশীয় পরিচ্ছদ পরিলেই নিজদেশ হইতে মন চলিয়া যায় না। বিশেষ যদি কেহ বিদেশ হইতে ফিরিয়া গিয়া ভিন্ন পোষাক পরেন, তাহা হইলে আমাদের ইহা দেখা উচিত যে, তাঁহার অন্যান্য বিষয়ে কোন উন্নত পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি না—সভ্য ও স্বাধীন দেশে থাকিয়া তাঁহার মনে কোন উন্নত ভাবের উদয় হইয়াছে কি না—এবং তিনি বিদেশীয়দের কোন ভাল গুণ অনুকরণ করিয়াছেন কি না। মনে কর সব ভিন্নজাতীয় পোষাক মন্দ, কিন্তু সে লোকটী যদি মানসিক ও আন্তরিক উন্নতি লাভ করিয়া থাকে তাহা হইলে সামান্য বাহ্যিক মন্দের সহিত আন্তরিক সদ্‌গুণ লাভ শ্রেয় কি না।

অনুকরণ করিলেই যে দোষ হয় তাহা যুক্তিযুক্ত নহে, অনুকরণ দুই প্রকার, ভাল ও মন্দ। লোকে শীঘ্রই মন্দ অনুকরণ করে, বিশেষ আমরা বিজাতীয়দের মন্দ আচার ব্যবহার সহজেই অনুকরণ করি; এজন্য ভারতবাসীরা একেবারে সব অনুকরণে বিমুখ, ভাল মন্দ বিবেচনা করিয়া দেখেন না। আমারও এক সময়ে অনুকরণে ঘৃণা ছিল, কিন্তু

এখন দেখিতেছি যে ভাল অনুকরণ না করিলে লোকের ও দেশের উন্নতি হয় না। ইউরোপীয়দের যে এত সভ্যতা ও উন্নতি, তাহা কি করিয়া? বোধ হয় দেখিলে অনেকে বুঝিতে পারিবেন, যে কেবল অনুকরণ করিয়া। ইহাদের মধ্যে কোন জাতি অন্য জাতির কোন ভাল বিষয় দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহা নিজেদের মধ্যে প্রচলিত করে। মন্দ বিষয়ে সকল জাতিই প্রায় একরকম, সেজন্য প্রথমে সমস্ত জাতিকে ভাল করিয়া দেখা উচিত যে আমদের অপেক্ষা তাহারা কোন বিষয়ে উন্নত কি না—এবং কি কারণে তাহারা ঐ সকল বিষয়ে আমাদের অপেক্ষা উন্নত; যদি এই দুটী বিষয় যথার্থ জানিতে পারি, তাহা হইলে সেই সেই ভাল বিষয়গুলি আমাদের নিজ জাতির মধ্যে ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করাইতে পারিলে প্রশংসার কাজ হয়, এবং উহাই উন্নতির একমাত্র উপায়।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা কুসংস্কার ও মূর্খতায় আচ্ছন্ন। আবার আমাদের দেশীয় লোকেরা যেরূপ গোঁড়া, তাহাতে তাঁহাদের মধ্যে কোন নূতন বিষয় প্রচলিত করা ভয়ানক কঠিন ব্যাপার, বিশেষ তাঁহারা কাহাকে বিদেশীয়দের কিছু অনুকরণ করিতে দেখিলে হিতাহিতবিবেচনাশূন্য হইয়া একেবারে তাঁহার প্রতি শত্রুভাব অবলম্বন করেন। কেহ যদি ১৬ বৎসর অবধি কন্যাকে বিদ্যালয়ে পাঠান, তবে লোকে অমনি তাঁহাকে সমাজচ্যুত করিবার জন্য অগ্রসর হন; কেহ ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত কন্যাকে অবিবাহিতা রাখিলে লোকে তাঁহাকে "একঘরে" করিবার পন্থা দেখিয়া বেড়ান। এইরূপ শত শত ঘটনা

আমাদের দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষের ভিতরে নিরন্তর ঘটিতেছে। অমি জানি, আমার কোন একজন আত্মীয় লোক "ষষ্ঠীপূজা" করেন নাই বলিয়া তাঁহার পুত্রের অন্নপ্রাশনের সময় কোন লোক তাঁহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণে যান নাই। দেখ, এই সামান্য পরিবর্ত্তনের জন্য প্রায় দু হাজার লোক তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া কত নিন্দা করিয়াছিল। ইহা কি অল্প দুঃখের বিষয়!।

আমাদের দুর্দ্দশার প্রধান কারণ যে আমরা নিজেদের দোষ জানি না এবং জানিলেও তাহা শুধ্রাইবার চেষ্টা করি না। নিজের দোষ দেখিতে পাওয়াই ভার, এবং দেখিতে পাইলেও কেহ শীঘ্র স্বীকার করিতে চান না। নদীর জলে ডুবিয়া থাকিলে যেমন নদীর গভীরতা বা প্রশস্ততা কিছুই জানা যায় না, সেইরূপ আমরা স্বাধীনতার সহিত অনেক উত্তম গুণ হারাইয়া একপ্রকার অন্ধকারে মগ্ন রহিয়াছি, সেজন্য আমরা কোন্ বিষয়ে হীন এবং কত পরিমাণে হীন তাহা কিছুই জানি না। একটা আদর্শ দেখিয়া লোকে ভাল মন্দ ঠিক করে, অতএব আমরা যদি কেবল নিজেদের দেখি, আর অন্য কোন স্বাধীন ও উন্নত জাতির সহিত নিজেদের তুলনা করিয়া না দেখি, তাহা হইলে আমরা কি অবস্থায় আছি এবং আমাদের কোনটী দোষ আর কোনটী গুণ তাহা কখনই ঠিক করিয়া জানিতে পারি না। ক্রমাগত একভাবে ও একস্থানে থাকিলে কখন কাহারও মনের পরিবর্ত্তন হয় না। নানাদেশে ও নানা জাতির সহিত না মিশিলে লোকে কখন নিজেদের দোষ সকল ছাড়িয়া অন্যজাতির ভাল গুণগুলি শিখিতে পারে

না। আমরা নিজেদের দোষ ও দুঃখের জীবন ঠিক জানি না বা বুঝিতে পারি না বলিয়াই জড়বস্তুর ন্যায় এক অবস্থাতে আছি, কোন দিকে নড়িতে পারি না বা নড়িতে চাহি না। আমরা যদি একটী স্বাধীন মানুষের জীবনের সহিত নিজেদের জীবনের তুলনা করিয়া দেখি, তাহা হইলে ঠিক করিয়া জানিতে পারি, দুই প্রকার জীবনে কত প্রভেদ এবং আমাদের জীবন কি কষ্টকর!।

আজ কাল অনেকে বলেন যে ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষীয়েরা ফিরিয়া গিয়া কেবল স্বদেশের নিন্দা আর স্বদেশকে ঘৃণা করেন। ইহা কতদূর সত্য তাহা জানি না, কিন্তু আশা করি এমন কেহই নাই যে মাতৃভূমিকে ঘৃণা করিবে। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে যাঁহারা ইউরোপে আসেন, তাঁহারা অবশ্য (যাঁহাদের বুদ্ধি আছে) স্বাধীন ও সভ্য দেশে থাকিয়া অনেক বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেন এবং এসকল দেশের বিষয় জানিয়া নিজ দেশের অবস্থা ভাল করিয়া দেখিতে পান। এখানে আসিয়া তাঁহাদের চক্ষু খুলে, তাঁহারা তখন স্বদেশের মন্দ অবস্থা ভাবিয়া কষ্ট পান; এবং বোধ হয় সেই জন্য দেশে ফিরিয়া যাইবার পর, তাঁহারা ভারতের দুর্দ্দশার কথা উল্লেখ করেন বলিয়াই লোকে তাঁহাদের ঐরূপ অপবাদ দিয়া থাকে।

বিদেশে গিয়া অনেক নূতন নূতন জিনিস দেখিতে পাই,—নূতন দেশ, নূতন সহর, নূতন গাছ, নূতন পর্ব্বত ইত্যাদি। নূতন দেশ দেখিয়া আমরা অতিশয় আনন্দ লাভ করি; অদ্ভুত অদ্ভুত স্বাভাবিক শোভা দেখিয়া পরিতৃপ্ত হই; বৃহৎ বৃহৎ রাজবাটী ও অট্টালিকা দেখিয়া আশ্চর্য্য হই; এক কথায়—

নানাপ্রকার অভিনব বস্তু দেখিয়া অতি সুখী হই। কিন্তু কি হইতে আমরা অধিক শিক্ষা পাই?—এই সকল জড় বস্তু হইতে—না মানুষ ও তাহার প্রকৃতি হইতে? স্বভাবের শোভা বল—আমাদের দেশের হিমালয় পর্ব্বতের নিকট গেলে যেমন অনির্ব্বচনীয় দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে সেরূপ নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইবে না। আর রাজবাটী, অট্টালিকা ইত্যাদির কৃত্রিম শোভা বল—আমাদের দেশের ইলোড়ার মন্দির, তাজমহল প্রভৃতির সহিত অন্য কোন দেশের অট্টালিকার তুলনা হইতে পারে না। তবে কিসে আমাদের মন বেশি আকর্ষণ করে?—জড় বস্তুতে—না মানুষে?

অনেক দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা প্রায় এক প্রকার, কিন্তু সে সকল স্বভাবতঃ একরকম হইলেও অন্যান্য বিষয়ে উহাদের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষের বিভিন্নতাই সেই প্রভেদের মুখ্য কারণ। অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকার জল বায়ু বলিয়া মানুষের প্রকৃতিও অনেকাংশে অসদৃশ হইয়া যায়, কিন্তু আমরা চারিদিকে দেখিতে পাই যে দুই জাতির প্রায় সমান সুযোগ থাকিলেও দুই দেশের অবস্থা দুই প্রকার। ইহার কারণ—দুই দেশের মানুষ দুই প্রকার। আবার দেখিতে পাই যে এক দেশেরই ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ঘটিয়াছে; ভারতবর্ষই ইহার একটী প্রধান উদাহরণস্থল। অতি পুরাকালে ভারতে যে সকল স্বাভাবিক দ্রব্য ছিল এখনও তাহাই আছে, কিন্তু ভারতবাসীদের তখন কিরূপ অবস্থা ছিল এবং এখনই বা কিরূপ হইয়াছে!

ইটালির কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; গ্রীসদেশেও ঐ বিষয়ের একটী স্পষ্ট দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। অতি প্রাচীন কালে গ্রীকেরাও হিন্দুদের মত সভ্য ও জ্ঞানী বলিয়া জগদ্বিখ্যাত ছিল। এই গ্রীকদেরই বিদ্যা ও সভ্যতা রোমীয়েরা গ্রহণ করিয়া সমস্ত ইউরোপে বিস্তার করিয়াছিল। কালে হিন্দুদের ন্যায় গ্রীকেরা স্বাধীনতার সহিত বিদ্যা বুদ্ধি ও মানুষের সদ্‌গুণ সকল হারাইয়াছিল; উহারা বিদেশীয়দের পদদলিত হইয়া বহু শতাব্দী ধরিয়া একেবারে ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল; এমন কি গ্রীসের নাম পর্য্যন্তও বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। আবার অল্প অল্প করিয়া সেই গ্রীসের এখন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, পুনরায় স্বাধীনতার সহিত গ্রীকদের মধ্যে জ্ঞান ও সভ্যতার আবির্ভাব হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র গ্রীকজাতির মধ্যে কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কিন্তু গ্রীসদেশ পূর্ব্বকালে যেমন ছিল এখনও সেইরূপ আছে।

এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্টরূপে জানা যায় যে কেবল মানুষের পরিবর্ত্তন হইতেই দেশের অবস্থান্তর ঘটিয়া থাকে। বিশেষ মানুষের নিকটে মানুষের আলোচনা করা অতীব কৌতূহলজনক ও ফলদায়ক; কেহ বিদেশ হইতে আসিলে লোকে তাহার নিকট সর্ব্বাগ্রে বিদেশবাসী মানুষেরই বিষয় জানিতে উৎসুক হয়। দেশবর্ণনা আনন্দদায়ক বটে কিন্তু মানুষ ও তাহার প্রকৃতির আলোচনা অধিকতর জ্ঞানদায়ক ও উপকারক। অতএব (বিদেশভ্রমণে অনেক নূতন দৃশ্য দেখিতে পাই, অনেক নূতন বিষয় জানিতে পারি ও অনেক উপকার পাইয়া থাকি, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকার

বিদেশবাসী লোকদেরই পর্য্যালোচনা হইতে পাইতে পারি; এই হেতু বিদেশপর্য্যটন বা বিদেশে অবস্থান কালে বিদেশীয়-দের সম্বন্ধে সমস্ত অবগত হওয়া আমাদের বিশেষ কর্ত্তব্য।

---

# ষষ্ঠ অধ্যায়।

## লণ্ডন।

লণ্ডন একটী প্রকাণ্ড নগর, এরূপ বড় নগর পৃথিবীর আর কোন দেশে নাই। ইহা লম্বে প্রায় পাঁচ ক্রোশ এবং প্রস্থে চার ক্রোশ; লণ্ডন কলিকাতার প্রায় চারিগুণ জায়গা জুড়িয়া অবস্থিত, এবং বসতিতে লণ্ডন কলিকাতার আটগুণ— এখানে চল্লিশ লক্ষ লোকের বাস। একটা গাড়ী করিয়া পাঁচ ছয় দিন ক্রমাগত লণ্ডনের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইলে এই নগর দেখিয়া শেষ করিতে পারা যায়, কিন্তু রাস্তা চেনা ভার। লণ্ডন এত বড় তবু এখনও বাড়িতেছে, যে দিকে যাও দেখিবে, শত শত নূতন বাড়ী নির্ম্মিত হইতেছে আর পার্শ্বস্থ পল্লীগুলি ইহার সহিত এক হইয়া যাইতেছে। পাঁচ বৎসর আগে লণ্ডনের চারি পাশে যে সকল মাঠ ছিল. এখন তাহাদের উপর ঘাসের পরিবর্ত্তে রাশি রাশি বাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়, এবং দেখিয়া বিশ্বাস হয় না যে কয়েক বৎসর আগে সে স্থান একেবারে পল্লিগ্রাম ছিল।

একজন ভারতবর্ষীয় লণ্ডনকে এক কথায় 'বিজ্ঞাপনের নগর' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বোধ হয় তিনি লণ্ডনের

যেখানে সেখানে বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি দেখিয়া ঐরূপ নাম দিয়াছেন, কিন্তু লণ্ডনে বিজ্ঞাপন ব্যতীত নানা প্রকার রাশি রাশি জিনিস আছে। ইহাকে প্রথম দেখিয়া "দোকানের নগর" বলিতে পার, "নাট্যশালার নগর" বলিতে পার, কিম্বা "ধনের নগর" বলিতে পার, কিন্তু কিছুদিন থাকিয়া লণ্ডনকে যে কিসের নগর বলিবে তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পার না, সেজন্য আমি ইহার একটী কোন বিশেষ নাম দিতে পারিলাম না। লণ্ডনের যেখানে যাও দেখিবে রাস্তার দুধারে একাকৃতি ধূসরবর্ণ বাড়ী সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, আমাদের দেশের মত বাড়ীগুলির মধ্যে মধ্যে খোলা জায়গা বা ফাঁক নাই। আবার রাস্তার দুধারে যেমন বাড়ী সেইরকম অনেক রাস্তার দুপাশে কেবল দোকান, এরকম বাড়ী ও দোকান আমাদের দেশে নাই। বোধ হয় কলিকাতায় সর্ব্বশুদ্ধ যত গুলি বাড়ী আছে, এখানে কেবল দোকানের সংখ্যা তাহার অপেক্ষা অনেক বেশি। রাত্রিতে দোকানের শোভা দেখিতে বড় চমৎকার, এখানে অতি সুন্দর ও সুচারুরূপে দোকান সাজায়, আর গ্যাসের আলোতে দোকানের জিনিস গুলা ঝক্ ঝক্ করিয়া এত লোভ দেখায় যে, বোধ হয় দরিদ্র লোকেরা দোকান দেখিয়া অনেক কষ্টে লোভ সংবরণ পূর্ব্বক মনের দুঃখে বাড়ী ফিরিয়া যায়। যথার্থই অনেক টাকা না থাকিলে লণ্ডনে থাকিতে সুখ নাই, ইহা যেমন ধনের ভাণ্ডার সেইরূপ ধনী লোকেরাই লণ্ডনের সুখ ও জীবন ভোগ করিতে পারে।

লণ্ডন আট ভাগে বিভক্ত; উত্তর, পূর্ব্ব, পশ্চিম-দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম, পূর্ব্ব-দক্ষিণ, পূর্ব্ব-মধ্য ও পশ্চিম-মধ্য—

এইগুলিকে ডাক সম্বন্ধীয় বিভাগ বলে। কাহাকেও চিঠি লিখিতে হইলে বাড়ীর নম্বর ও রাস্তার নাম ছাড়া আবার লণ্ডনের কোন ভাগে সে রাস্তা আছে তাহাও দিতে হয়। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বিভাগে প্রায় মধ্যবিত্ত লোকেরাই বাস করে, দুচার জন ধনী ও দরিদ্র লোকও থাকে। এদিকে বাড়ীর ভাড়া বেশি নয় এবং এ ভাগে ভাল ও শস্তা ঘর ভাড়া পাওয়া যায়। "ঘর" পাওয়া বোধ হয় আমাদের দেশীয় লোকেরা না শুনিলে বুঝিতে পারিবেন না। এখানে অনেকে এক একটা বাড়ী ভাড়া লইয়া তাঁহার ঘরগুলি আবার দুচারিটী করিয়া ভাড়া দেয়, এবং অনেক গৃহস্থলোকেও তাহাদের বাড়ীর দুই তিনটী ঘর সাজাইয়া বা না সাজাইয়া ভাড়া দিয়া থাকে। যাহারা সাজান ঘর ভাড়া দেয়, তাহারা সব করিয়া দিবে, রাঁধিয়া দিবে, বিছানা করিবে ও ঘর পরিষ্কার রাখিবে ইত্যাদি। তুমি তাহাদের জিনিস ব্যবহার করিবে, তাহাদের বাসনে খাইবে, বিছানায় শুইবে ইত্যাদি। যে দিন যাহা খাইতে ইচ্ছা যাইবে গৃহকর্ত্রীকে বলিলেই সে সব করিয়া দিবে, তোমাকে কেবল প্রতি সপ্তাহে ঘরভাড়া ও খাওয়াদাওয়ার হিসাব মত টাকা দিতে হইবে। এই ভাড়া-ঘরের কর্ত্রীকে "ল্যাণ্ডলেডী" বলে। যে রকম পয়সা দিবে সেই রকম ঘর পাইবে, যদি সপ্তাহে পঁচিশ শিলিং অর্থাৎ প্রায় চোদ্দ টাকা দাও, তাহা হইলে বেশ ভাল ও ভদ্রলোকের পাড়াতে দোতালার উপর দুটা সাজান ঘর পাইবে। শোবার ঘরে ভাল খাট ও বিছানা, হাত মুখ ধোবার জিনিস, কাপড় রাখিবার দেরাজ, আর্শি ছবি ইত্যাদি থাকে। বসিবার ঘরে টেবিল চার পাঁচখানা ছোট ছোট গদি দেওয়া চৌকী, দুটা

বড় ঠেসান দেওয়া চৌকী, কৌচ, বড় আর্শি ছবি ইত্যাদি; এবং দুটী ঘরের মেজেতেই কার্পেট বা গালিচা পাতা থাকে। অল্প টাকাতেও ঐ রকম সাজান ঘর পাওয়া যায় কিন্তু তত ভাল হয় না ও হয় ত ছোটলোকের পাড়াতে হয়। সাজান অপেক্ষা অসাজান ঘর প্রায় অর্দ্ধেক দামে পাওয়া যায়, কিন্তু অসাজান ঘর ভাড়া লইলে ঘর সাজাইবার জন্য উপরি উক্ত সমস্ত আস-বাব ও বাসন কিনিতে হয়, আর কাজ করিবার জন্য চাকরাণী রাখিতে হয়, এজন্য বিদেশীয় ও নবাগত ব্যক্তিদের পক্ষে সাজান ঘর ভাড়া লওয়াই অধিক সুবিধা। এ রকম সাজান ঘর ভাড়া কেবল লণ্ডনে নয়, ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র ও ইউরোপের অধিকাংশ দেশেই পাওয়া যায়। এই রকম ঘর পাওয়াতে অনেক ক্লেশ নিবারণ হয় ও সময় বাঁচে; কোন দূরপথ হইতে আসিয়া একেবারে এক ঘণ্টার মধ্যে নিজের ঘরে বসিয়া আরামের সহিত আহারাদি করিতে পার। হোটেল প্রায় সব দেশে আছে বটে, কিন্তু হোটেলে থাকিতে এই ভাড়া ঘরের অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ বেশি খরচ পড়ে।

পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমভাগে লণ্ডনের অধিকাংশ বড়মানুষ থাকে। এখানে 'ঘর' পাওয়া দুষ্কর এবং পাইলেও অতিশয় দাম দিতে হয়। এই ভাগের রাস্তায় দাঁড়াইয়া দুপাশে দেখ, অতি উচ্চ উচ্চ ও পরিষ্কার বাড়িগুলি রাজপথের দুধারে শ্রেণী-বদ্ধ পাহাড়ের মত হইয়া রহিয়াছে, যত দেখিবে ততই উহাদের দেখিতে ও ঐখানে থাকিতে ইচ্ছা করিবে। কিন্তু ঐ সকল বাড়ীর অত্যন্ত অধিক ভাড়া—মাসে দুই তিন শত টাকা। এই ভাগের রাজপথগুলি অন্যান্য ভাগের অপেক্ষা ভাল ও

পরিষ্কার, দোকানগুলি অপেক্ষাকৃত অধিক ও দামী জিনিসে সাজান। বাস্তবিক এখানটা এত ধনী লোকে ও বহুমূল্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ যে দেখিলে মনে হয় না যে লণ্ডনে একটীও দরিদ্র লোক আছে। এই ভাগেই মহারাণী ও প্রিন্স অফ্ ওয়েল্‌সের রাজবাটী, পার্লিয়ামেণ্ট গৃহ, রাজকীয় কর্ম্মালয় ইত্যাদি বড় বড় অট্টালিকা আছে।

পূর্ব্ব-মধ্য ও পশ্চিম-মধ্য ভাগে যত কাজের স্থান; পশ্চিম-মধ্য ভাগে বহুসংখ্যক নাট্যশালা, স্কুল, কলেজ ও বড় বড় কার্য্যালয় আছে, আর দোকানের ছড়াছড়ি। এখানে অধিকাংশ ব্যবসায়ী ও কতকগুলি মধ্যবিত্ত লোক বাস করে। পূর্ব্ব-মধ্য বিভাগকে 'সিটী' বলে; এই স্থানটী দেখিয়া কলিকাতার বড়বাজারের কথা মনে পড়ে, অবশ্য তত অপরিষ্কার ও অস্বাস্থ্যকর নয়। ইহা যত ব্যাঙ্ক, বড় বড় কারখানা, অসংখ্য দোকান ইত্যাদিতে পূর্ণ; প্রত্যেক বাড়ীতেই দোকান বা বহুসংখ্যক কার্য্যালয় আছে। এ স্থানে অনেক ছোট ছোট গলি ও সরু সরু রাস্তা আছে, দুপাশের বাড়ীগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আর দেখিতে এত কাল যে মনে হয় যেন উহাদের সমস্ত শরীর পাঁক দিয়া আবৃত রহিয়াছে। এখানে সমস্ত দিন এত ভিড় যে, কোন কাজ না থাকিলে কেহ ইচ্ছামত বাহিরে যাইতে চাহে না। রাস্তার উপর সমস্ত দিন গাড়ীর স্রোত বহিতেছে, একবারও বিশ্রাম নাই; আবার দুধারে চলাপথের উপর এত লোকের ভিড় যে অতি আস্তে ও সাবধানে চলিতে হয় এবং অনেক সময়ে দাঁড়িয়া থাকিতে হয়। এই ভাগের জমী ও বাড়ীর ভাড়া আমাদের বড়বাজারের প্রায় দ্বিগুণ।

লণ্ডনের পূর্ব্ব ভাগ অন্যান্য বিভাগ হইতে একেবারে বিভিন্ন। এখানকার বাড়ীগুলি ছোট ও অপরিষ্কার; রাস্তা সকল সরু ও ময়লা এবং অধিকাংশই অপ্রশস্ত গলি; বেশি দোকান নাই, আর যে গুলি আছে তাহাও মন্দ জিনিসে পূর্ণ। এখানে যত মজুর, মুটে ও মেতুয়া প্রভৃতি শ্রমজীবী লোকদের বাস; এবং অনেক গুলা জাহাজের আড্ডা ও কারখানা আছে। এ ভাগে একটীও ধনী বা ভদ্রলোক দেখিতে পাইবে না, যত ছোটলোকেরা বাস করে। এদেশের দরিদ্রদের গরিবমানুষের বদলে "ছোটলোক" বলিতে হয়. কারণ আমাদের দেশের ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের গরিবলোকেরা নম্র ও লোকের মান রাখিয়া চলে; কিন্তু ইংলণ্ডের, বিশেষ লণ্ডনের দরিদ্র-লোকেরা একেবারে পশুর মত। কেহ এই ভাগে গেলে মনে করিবে না যে লণ্ডনে একটীও ভদ্রলোক আছে বা ইংলণ্ড একটী সভ্যদেশ এদিকটা এত বড় যে, যত দূর যাও শেষ নাই, ছোট ছোট ও অপরিষ্কার বাড়ীর সংখ্যা আর ফুরায় না। এ স্থানে এক একটী ক্ষুদ্র বাড়ীতে চার পাঁচ দল ভিন্ন পরিবার থাকে, প্রতি দলের চার পাঁচটী করিয়া ছেলে। এক একটী পরিবারে দুই একটীর বেশী ঘর লইতে পারে না এবং আমা-দের দেশের মত ছেলেদের বেড়াইবার জন্য খোলা স্থান বা উঠান নাই, সেজন্য দুই একটী ঘরে সাত আট জন লোকে ছাগল কুকুরের মত বাস করে। লণ্ডনে যেমন ধনী লোক আছে, সেইরূপ দরিদ্রও আছে; ইংলণ্ডের মত পৃথিবীর আর কোন স্থানে এত অসংখ্য ধনী ও এত অসংখ্য দরিদ্র-লোক দেখিতে পাওয়া যায় না। লণ্ডনের এই ভাগের লোক

দের মধ্যে মারামারি ও খুনাখুনি প্রায়ই ঘটিয়া থাকে, আর মদ খাইয়া তাহারা যে কিরূপ ব্যবহার করে ও তাহাদের যে কি অবস্থা হয় তাহা পরে ভাল করিয়া বলিব। এদিকের রাস্তাগুলা এত ছোট, অন্ধকার ও অপরিষ্কার যে, দুর্গন্ধের ত কথাই নাই, তাহাদের ভিতর যাইতে সাহস হয় না। শুনিয়াছি, কোন একজন বিদেশীয় লণ্ডনের এই ভাগের লোকদের অবস্থা ভাল করিয়া জানিবার জন্য উহাদের বাড়ীর কাছে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু পাহারাওয়ালা তাঁহাকে তথায় যাইতে নিষেধ করিয়াছিল; কারণ উহারা একে ইতর জন্তুর মত, তাহাতে মদ খাইলে একেবারে জ্ঞানশূন্য হয়, সেই জন্য কোন অপরিচিত বা বিদেশীয় লোক উহাদের নিকট গেলে তাঁহার বিপদ ঘটিতে পারে।

লণ্ডনে কলিকাতার ইডনগার্ডেনের মত অনেকগুলি বেড়াইবার স্থান আছে। ইহাদিগকে লোকে লণ্ডনের 'গলার নলী' বলিয়া থাকে, কারণ লণ্ডন এত প্রকাণ্ড ও ইহার ভিতর এত বাড়ী ও লোকের ভিড় যে অনেকে এই বাগানগুলিতে গিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে। এইগুলির মধ্যে সকলের অপেক্ষা বড়টার নাম "রিজেণ্টস পার্ক"। ইহা লণ্ডনের উত্তর-পশ্চিম ভাগে স্থিত এবং বেড়ে প্রায় দেড় ক্রোশ। শীতকালে এখানে বেড়াইতে কোন আমোদ নাই; গাছগুলি পাতাহীন —ভূমিতে কেবল শুষ্ক ঘাস—কোন রকমের ফুল নাই—দেখিতে অতি শোচনীয়। দূর হইতে দেখিলে মনে হয়, যেন সম্মুখে একটা শ্মশানভূমির ন্যায় ধূসরবর্ণ ও পত্রহীন বৃক্ষপূর্ণ মাঠ পড়িয়া রহিয়াছে, ভিতরে যাইতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু যদি

একবার ভিতরে প্রবেশ কর, তাহা হইলে অন্যমনা হইয়া সেই শ্মশানপ্রায় মাঠের উপরও একপ্রকার সুখ অনুভব করিবে। কোন দিন বিকালে ঐ পার্কের ভিতর ঝিলের পাশে একটী বেঞ্চের উপর গিয়া বসিলে দেখিবে, সম্মুখে জলের উপর পালে পালে হাঁস সাঁতর দিতেছে—আবার উহারা উঠিয়া নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট বাসায় যাইতেছে—ক্ষণকাল পরে আবার আসিতেছে। উত্তর দিক হইতে বাতাস বহাতে ঐ কৃত্রিম ঝিলেও যথার্থ নদীর মত ছোট ছোট ঢেউ খেলিতেছে। জলের মাঝখানে একটী কৃত্রিম দ্বীপের উপর নানাপ্রকার শোভাহীন গাছ পালা রহিয়াছে। এইখানে বসিয়া মনে হয় যে, একেবারে লণ্ডন হইতে দূরে গিয়া পল্লীগ্রামের মধ্যে বাস করিতেছি; লণ্ডনের গোলমাল আর কিছুই শুনিতে পাই না, অনবরত গাড়ী চলার শব্দে আর আমার কাণ জ্বালাতন হয় না, মানুষের কোলাহল পর্য্যন্ত আমার কাণে পশিতেছে না। এই বাগান মানুষের দ্বারা প্রস্তুত হইলেও এখানে স্বভাবের সুখ পাওয়া যায় এবং কিছুক্ষণের জন্য শব্দময় লণ্ডনকে ভুলিয়া যাইতে হয়। শীতে হাত পা কাঁপিলেও এই নির্জ্জন স্থান পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না।

গ্রীষ্মকালে রিজেণ্টস্ পার্ক আবার একটী ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করে। ধূসরবর্ণ গাছগুলি যেন মলিন বস্ত্র ছাড়িয়া সবুজ পত্রে সজ্জিত হইয়াছে; মাঝে মাঝে ফুলের কেয়ারি, তাহাতে নানা রকমের ফুলে মনোহর শোভা ধরিয়াছে। এদেশে আমাদের দেশের মত সেরূপ গন্ধযুক্ত ও বিবিধ প্রকার ফুল নাই, কিন্তু যাহা আছে তাহা ইহারা অতি যত্ন করিয়া রাখে ও সাজাইয়া এমন চমৎকার কেয়ারি করে যে, দেখিলে বোধ হয় যেন তুলি দিয়া

আঁকিয়াছে। লণ্ডনের যতগুলি বাগানে গিয়াছি, সকল গুলিতেই ইংরাজদের অতিশয় যত্নের চিহ্ন দেখিয়াছি। আমাদের দেশে বিনা কষ্টে ফল ফুল উৎপন্ন হয়, কিন্তু এদেশে বিনা পরিশ্রমে অতি সামান্য জিনিসটীও গজায় না, তাহাতে আবার এই লণ্ডনের ধূমময় বায়ুতে ফুলের কেয়ারি করা সামান্য যত্ন ও অধ্যবসায়ের কাজ নয়। আমি যেখানে যাই সেই খানেই স্পষ্ট দেখিতে পাই যে, ইংরাজেরা যাহা করে তাহা অতি যত্ন, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সহিত করে; কোন দ্রব্য অর্দ্ধশেষ করিয়া রাখে না, এবং কোন দোষ দেখিলে তাহা অতি ক্লেশ-সহকারে সংশোধন করে। আমি ইংলণ্ডে ছাপা কয়েকখানি সংস্কৃত পুস্তক দেখিয়াছি; ইহারা যে কিরূপে এইগুলি এমন বিশুদ্ধ ও সুন্দররূপে ছাপায় তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। ইংরাজেরা ভাষা না জানিয়াও কেবল সংস্কৃত অক্ষরের ছবি মাত্র দেখিয়া একটীর পর আর একটী টাইপ্ সাজায়, তাহাতে যে কত পরিশ্রম ও ধৈর্য্যের আবশ্যক হয় তাহা বলা ভার। এই-রূপে ছাপা হইলেও পুস্তক গুলিতে অতি অল্পই ভুল দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু আমাদের দেশে বাঙ্গালা ভাষার পুস্তক গুলি বাঙ্গালীর দ্বারা ছাপা হইলেও তাহাদের মধ্যে অধিকাং-শেই কত ছাপার ভুল দেখিতে পাওয়া যায়!

গ্রীষ্মকালে পার্কে যে দিন যখন যাইবে তখনই অনেক লোক দেখিতে পাইবে, বিশেষ ছুটীর দিনে দেখিবে যে লোকে লোকারণ্য। এদেশে বৎসরের মধ্যে কেবল চার মাস ফুল থাকে, সুতরাং এই সময়েই গাছের ও বাগানের বাহার, এবং ইহারা এই চার মাসেই সমস্ত বৎসরের সুখ ভোগ করিয়া লয়।

এই বাগানে গ্রীষ্ম কালের তিন মাস সপ্তাহে তিন দিন করিয়া তাল বাজনা হয়, যার ইচ্ছা সেই শুনিতে যায়; দেশীয় বিদেশীয়ে কোন প্রভেদ নাই, নেটিব ও সাহেব বলিয়া কোন ঘৃণা-সূচক বাক্য নাই, সকলেই এক ভাবে ও একরূপে ভোগ করে। কলিকাতায় এক ইডন গার্ডেন আছে, কিন্তু তাহা ইংরাজদের নির্ম্মিত, এবং তাঁহারা ইচ্ছা করেন না যে, বাঙ্গালীরা সেখানে গিয়া তাঁহাদের সহিত মিশিয়া একসঙ্গে সুখভোগ ও আমোদ করে। রিজেণ্টস্ পার্কের ঝিলে অনেক স্ত্রীলোক ও পুরুষে গ্রীষ্মকালে নৌকা বাহিয়া ব্যায়াম করে। এখানে খেলিবার জন্য একটী স্থান আছে, সেখানে লোকেরা ব্যাট ও গোলা এবং "লনটেনিস" ইত্যাদি খেলিয়া থাকে। এই পার্কের মধ্যভাগে একটী উদ্ভিদের বাগান আছে, উহা অতিশয় ক্ষুদ্র এবং কেবল শিক্ষা দিবার নিমিত্ত নির্ম্মিত হইয়াছে। আর এক দিকে পশু-শালা, সেটী যদিও কলিকাতার নিকটস্থ আলিপুরের পশু-শালার অপেক্ষা অনেক ছোট, তবুও তাহাতে অনেক দেশের নানা প্রকার জন্তু আছে।

লণ্ডনের "ফগ" অর্থাৎ গাঢ় কোয়াশা—এ রকম কোয়াশা-ময় দিন কাহাকে বলে, তাহা আমাদের দেশের লোকেরা মনেও ভাবিতে পারেন না। ইংলণ্ডের অন্যান্য ভাগেও কোয়াশা হয় বটে কিন্তু উহা লণ্ডনের ফগের মত এত গাঢ় ও অপরিষ্কার নয়। এই ফগ আমাদের দেশের পৌষ মাসের ভোর পাঁচটার সময়ের কোয়াশা অপেক্ষা চারিগুণ ঘন। এখানে নভেম্বর, ডিসেম্বর ও জানুয়ারী, এই তিন মাসই বেশী ফগের সময়। এই ফগের কারণ ধোঁয়া। লণ্ডনে এত কলের গাড়ী ও কারখানা

আছে এবং শীতকালে প্রতি বাড়ীর চিম্‌নী বা ধোঁয়াঘর হইতে এত ধোঁয়া উঠে যে, কোন কোন দিন আকাশের বাতাসের অপেক্ষা ধোঁয়া ভারী হওয়াতে উহা উপরে উঠিতে না পারিয়া নগরের অল্প উপরেই থাকে এবং সময়ে সময়ে নগর ব্যাপিয়া সমস্ত অন্ধকার করিয়া দেয়। কোন কোন দিন এ প্রকার ফগ সমস্ত দিন থাকে এবং নানা বর্ণ ধারণ করে—কখন বা ধূসর—কখন বা কাল—কখন বা হলদে। একদিন বেলা আটটার সময় উঠিয়া দেখি, যে সমস্ত অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না, আলো জ্বালিয়া কাজ করিতে হইতেছে। রাস্তায় যাহাদের না চলিলে নয় কেবল তাহারাই হাত্‌ড়িয়া চলিতেছে, বাড়ী ঘর কিছুই দেখিতে পাই না, সব দোকানেই আলো জ্বলিতেছে কিন্তু ধোঁয়াতে আর কিছুরই শোভা নাই। ট্রাম ও ওম্নিবাস নামক বড় বড় গাড়ী ও অন্যান্য গাড়ী সকল আস্তে আস্তে চলিতেছে; সকলেই ভয়ে ভয়ে গাড়ী চালাইতেছে, পাছে অন্ধকারে ঠেকাঠেকী হইয়া লোক মারা যায় বা অন্য কোন বিপদ ঘটে এই ভয়ে সকলেই শঙ্কিত। লণ্ডনে শত শত কলের গাড়ী চলিলেও আজ বেশি শব্দ শুনা যাইতেছে না, সব নিস্তব্ধ, নগর যেন জীবনশূন্য হইয়াছে। রাস্তায় চলিবার সময় কিছুই দেখা যায় না, একরকম হাচা করিয়া চলিতে হয়। দিনের বেলায় রাত্রির অপেক্ষা জঘন্য অন্ধকার, আর ফগের অন্ধকারকে কোন কৃত্রিম আলোর দ্বারা দূর করা যায় না। নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হয়, নাকের ভিতরে একরকম কাল কাল তৈলাক্ত জিনিস গিয়া শ্বাস রুদ্ধ করিয়া দেয়। আলোর তেজ নাই, ভাল করিয়া কোন কাজ করিতে পারি

না, সমস্ত হাত্ড়িয়া বেড়াইতে হয়। অন্ধকারের সঙ্গে মনে বিষাদ উপস্থিত হয়, কোন কর্ম্মে মন লাগে না, মানুষে একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এ সময় লোকের বিশেষ বিদেশীয়দের নিকট অতিশয় দুঃখজনক, মনে হয় যেন নরক-কুণ্ডে রহিয়াছি। এরকম কষ্টকর দিনে লণ্ডন হইতে দূরে পলাইয়া যাইতে ইচ্ছা করে। আজ আর লণ্ডনের সে মনোহর ভাব নাই, ধনজন-পরিপূর্ণ স্বর্ণময় লণ্ডন আজ ঘৃণিত অন্ধকার-আবরণে আচ্ছাদিত।

শীতকালে কোয়াশা প্রায়ই হইয়া থাকে, অবশ্য অত্যন্ত গাঢ় ফগ বৎসরের মধ্যে অতি অল্পদিনই হইয়া থাকে, রোজ হইলে কেহ লণ্ডনে বাস করিতে পারিত না। সব দিন সমস্ত দিন ধরিয়া থাকে না, মাঝে মাঝে ছাড়িয়া যায়, কোন কোন দিন দুতিন ঘণ্টা মাত্র থাকে। অনেক সময় বেশ সূর্য্য উঠিয়াছে দেখিতেছি, আকাশ পরিষ্কার, এমন সময়ে হঠাৎ সমস্ত অন্ধকার হইয়া গেল, আমরা যেন পৃথিবী হইতে পাতালপুরীতে নামিলাম। ফগের সময় ঘরের জানালা খোলা যায় না, খুলিলেই ধোঁয়াতে ঘর পুরিয়া যায়। লোকেরা নীরব হইয়া একরকম নাক চোক বুজিয়া কাজ করে। লোকের হাসি, আমোদ, কথা, আর কিছুই নাই। সকলেই "বিশ্রী ফগ, উঃ কি কষ্টকর!" ইত্যাদি বলিয়া ক্লেশ প্রকাশ করিতেছে।

এদেশে শীতকালের প্রারম্ভে যেমন কোয়াশার প্রাদুর্ভাব, শেষে আবার সেইরূপ কোন কোন বৎসরে অতিশয় তুষার পড়িয়া থাকে। ইহাকে ইংরাজীতে "স্নো" বলে; ইহা যদিও সুখকর নয়, কিন্তু ফগের মত অত কষ্টকর ও ঘৃণাজনক নহে, এবং ইহা দেখিতে আমোদ আছে। ইংলণ্ডের সমস্ত জায়গাই

বরফ পড়ে কিন্তু উত্তর দিকে অধিক। ডিসেম্বর, জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী স্নো পড়িবার সময়, কিন্তু কখন কখন মার্চ ও এপ্রেল মাসেও পড়িয়া থাকে। যখন স্নো পড়ে, তখন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ার মত শব্দ হয়, পরে দেখিতে দেখিতে রাস্তা, বাড়ীর ছাদ, জানালার কার্ণিশ ইত্যাদি সব সাদা হইয়া যায়। বাঃ! কি চমৎকার! আর কোন শব্দ নাই, রাস্তায় চলিলে, যেন ময়দার উপর দিয়া চলিতেছি বলিয়া বোধ হয়; পায়ের শব্দ হয় না, গাড়ী চলার শব্দ নাই, এত শব্দময় লণ্ডন হঠাৎ নিস্তব্ধ হইয়া গেল। বরফ পড়িবার পর লণ্ডনের রাস্তায় চলা বড় ভয়ানক হইয়া উঠে, পাথরবসান চলাপথের উপর স্নো পড়াতে উহা অতিশয় হড়্‌হড়ে হয়, সেজন্য প্রতিপদেই পা পিছলিয়া পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। শীতেতে লোকে সাধ্যমত বাড়ীর বাহিরে যাইতে চাহে না, তথাপি কোন কাজের স্থান বন্ধ নাই। সকলেই আপন মনে যে যার কাজ করে। এই সময়ে ছোট ছোট ছেলেদের বড় আহ্লাদ. এত শীত হইলেও তাহারা রাস্তা হইতে স্নো কুড়াইয়া গোলা বাঁধিয়া খেলা করে। যথার্থই প্রাতঃকালে স্নো দ্বারা আচ্ছাদিত শুভ্রবর্ণ লণ্ডন দেখিলে অতিশয় আহ্লাদ হয়। আবার রেলে করিয়া পল্লীগ্রামে গেলে দেখিতে পাইবে, যে, ক্রমাগত ক্রোশের পর ক্রোশ ভূমি তুষারকণায় আচ্ছন্ন, চারিদিকে সাদা, ঘাস একেবারে দেখা যায় না। আর বড় বড় গাছের পাতাগুলি এরকম ভাবে বরফে ঢাকা যে, দেখিলে বোধ হয় যেন, গাছের গায়ে সাদা সাদা পালক ঝুলিতেছে। এখানে শিলাবৃষ্টি অতি কমই হইয়া থাকে, অধিক শীত বশতঃ শীতকালে প্রায় স্নোই পড়ে।

এদেশে আমাদের পক্ষে অনেক জিনিস নূতন বটে, কিন্তু লণ্ডনে একটী দৃশ্য আমার অত্যন্ত নূতন বলিয়া বোধ হয়। শুনিয়াছি সকল বিদেশীয়েরাই এই লণ্ডনের রবিবার দেখিয়া চম্‌কিয়া যান। আজ লণ্ডনে রবিবার, সকলেই বেলা আট নয়টা পর্য্যন্ত ঘুমাইতেছে, কেহ কেহ আবার আরো বেলা পর্য্যন্ত শয্যাসুখ ভোগ করিয়া থাকেন। উঠিয়া দেখি নগর নিস্তব্ধ, রাস্তায় আর দোকানের বাহার নাই, সব বন্ধ। ফিরি-ওয়ালারা চীৎকার করিয়া আজ আর কাণ ঝালাপালা করি-তেছে না, সকলেই নীরব। সেই ভয়ঙ্কর লণ্ডনের কোলাহল আজ কিছুই শুনিতে পাইতেছি না, মনে হয় লণ্ডন ছাড়িয়া যেন সব লোকজন পলাইয়া গিয়াছে। আমোদের স্থান ইত্যাদি সব বন্ধ, রাস্তায় বেড়াইয়া কোন সুখ নাই, সমস্ত বিষাদজনক। ক্রমে বেলা হইল, লোকজনের শব্দ অল্প অল্প শুনা যাইতে লাগিল, বোধ হইল, এইবার লণ্ডন দীর্ঘ নিদ্রা হইতে উঠিতেছে। কিছু পরে যত গির্জ্জার ঘণ্টা বাজিতে আরম্ভ করিল, জানিলাম এইবার সকলে গির্জ্জায় যাইবে। রবিবার খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদের উপাসনার দিন, অধিকাংশ লোকেই উত্তম বেশভুষা করিয়া গির্জ্জায় প্রার্থনা করিতে যায়। কি ধনী, কি নির্ধন সকলেরই, আমাদের দেশের পর্ব্বের মত, রবিবারের জন্য আলাদা পোষাক আছে, বিশেষতঃ আজ স্ত্রীলোকদের পোষা-কের বড় ঘটা। বৃদ্ধা, যুবতী সকলেই পরিচ্ছদ লইয়া ভয়ানক ব্যস্ত, আর অবিবাহিতা যুবতীরা কি করিয়া অন্যের অপেক্ষা আপনাকে ভাল দেখাইবে, এইজন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। আজ সকলেই নূতন চক্‌চকে পোষাক পরিয়া বাহির হইতেছে।

ওদিকে ঢং ঢং করিয়া গির্জ্জার ঘণ্টাগুলা বাজিতেছে, ক্রমে লোক চলার শব্দ হইতে লাগিল। স্ত্রীলোকেরা নানাপ্রকারের পরিচ্ছদ পরিয়া চলিতেছে, পুরুষদের বস্ত্রে কোন আড়ম্বর নাই, সকলেরই কাল পোষাক। আমাদের দেশের অনেক পুরুষের মত এখানকার স্ত্রীলোকেরা বেড়াইতে যাইবার সময় "ফুলবাবু" সাজে। পুরুষেরা কোন গন্ধ দ্রব্য বা বাহারী পোষাকের জন্য গ্রাহ্য করে না। রাস্তায় যে সকল লোক চলিতেছে, তাহার মধ্যে স্ত্রীলোকের ভাগ অধিক। সকল দেশেই দেখিতে পাই স্ত্রীলোকেরা পুরুষ অপেক্ষা ধর্ম্মকার্য্য ও পূজা আর্চ্চায় বেশী রত এবং সকল দেশেই স্ত্রীরা অধিক গোঁড়া। এখানে অনেক স্ত্রীলোক কেবল ধর্ম্ম দেখাইবার জন্য গির্জ্জায় যায়, এবং অবিবাহিতা স্ত্রীরা অনেক সময়ে আপনাদের বেশভূষা দেখাইবার ও বর খুঁজিবার জন্য উপাসনালয়ে গিয়া থাকে। ক্রমে ক্রমে সকলেই দুম্‌দাম্ করিয়া দরজা দিয়া চলিল, কেবল চাকরাণীরা বাড়ীতে রহিল, তাহাদের এখনও বিশ্রাম নাই।

এদেশে প্রতি রবিবারে তিনবার করিয়া গির্জ্জা বসে, —এগারটা, তিনটা ও সাতটার সময়। গির্জ্জার প্রার্থনাদি কার্য্য অনেকটা আমাদের দেশের ব্রাহ্মসমাজের রীতি অনুসারে সমাপিত হয়। সমস্ত লোক সপ্তাহের ছয়দিন খাটিয়া "বাইবল" অনুসারে রবিবারে বিশ্রাম করে। গোঁড়া লোকেরা আজ কোন কাজ করে না, অনেকে শনিবারে রবিবারের জন্য রাঁধিয়া রাখে। আজ লোকেরা ধর্ম্মপুস্তক ভিন্ন অন্য বই পড়িবে না, ধর্ম্ম সঙ্গীত ভিন্ন অন্য গানবাজনা করিবে না, এবং শুনিয়াছি স্কটলণ্ডে রবিবারে সংবাদপত্র পর্য্যন্ত পড়ে না।

আবার অনেকে ধর্ম্মকথা ভিন্ন অন্য কথা কয় না। লণ্ডনে আজ কাল অনেক নব্য দলের লোকে এত বিচার করে না। এসকল কুসংস্কার হইলেও ইহাদের মধ্যে অনেক যথার্থ ধার্ম্মিক আছে। ইহারা খৃষ্টের উপাসনা করিলেও ঈশ্বর ইহাদের ধর্ম্মের প্রধান উপাস্য। কোন কোন লোক কেবল দেখাইবার জন্য গির্জ্জায় যায় বটে কিন্তু অধিকাংশই প্রার্থনাকে একমাত্র মুক্তি বলিয়া স্বীকার করে ও গির্জ্জায় গিয়া ধ্যান করে। আজ যদি কোন ব্যক্তি পীড়া বশতঃ গির্জ্জায় যাইতে না পারেন, কিম্বা নির্জ্জনে প্রার্থনা করিতে ভাল বাসেন, তাহা হইলে তিনি স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদির সহিত ঘরে বসিয়া উপাসনা করেন। পীড়িত পিতা বা মাতা শুইয়া আছেন, কন্যারা সকলে চারি-দিকে বসিয়া প্রাতঃকালে মধুর স্বরে ধর্ম্মসঙ্গীত গাইয়া তাঁহার চিত্তবিনোদন করিতেছে আর রোগ উপশমের জন্য প্রার্থনা করিতেছে, এ দৃশ্য দেখিলে কাহার মনে না আনন্দের সঞ্চার হয়?

আজ ভাল দিন হইলে বিকালে ও সন্ধ্যার সময় অধিকাংশ লোকে বেড়াইতে যায়, সকল বড় বড় রাস্তা লোকে পরিপূর্ণ, অনেক স্থানে গরিব ও চাকরচাকরাণীদের দল বেশী। বাগান-গুলাতে অতিশয় লোকের ভিড়, সকলেই যেন সপ্তাহের মধ্যে একদিন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিতেছে। কিন্তু সব লোকেই আজ অন্যান্য দিন অপেক্ষা পরিষ্কার এবং ভাল পোষাক পরে। সকলেরই ছুটী, দাসদাসীদের পর্য্যন্ত রবিবারে সন্ধ্যার সময় তিন চার ঘণ্টা করিয়া ছুটী হয়। বড় বড় রাস্তায় এখন নানা প্রকার লোক নানা রকমের পোষাক পরিয়া বেড়াইতেছে,

কে ভদ্র লোক আর কে ছোট লোক তাহা চেনা ভার। সব দোকানই বন্ধ, কিন্তু কেবল মদের ও তামাকের দোকান খোলা। মদের দোকান দিনের বেলায় কিছুক্ষণের জন্য এবং সমস্ত সন্ধ্যার সময় খোলা থাকে। কি আশ্চর্য্য জাতি! এত দোকান থাকিতে কেবল মদের দোকান খোলা। সকাল বেলায় যেমন গির্জ্জার ঘটা, সন্ধ্যার সময় তেমনি আবার সুরা-লয়ের ঘটা!

আজ যদি কোয়াসাময় দিন হয় কিম্বা বৃষ্টি পড়ে তাহা হইলে সকলেই অসুখী। কেহ বাড়ীর বাহিরে বা বাগানে গিয়া আমোদ করিতে পারে না, সকলকেই নিজ নিজ বাড়ীতে বন্ধ থাকিতে হয়। গির্জ্জায় যাইবারও ধূম্‌ধাম্ নাই, স্ত্রীলোক-দের বাহার দিয়া বেড়াইবারও ধূম্‌ধাম্ নাই। রাস্তায় দুএকটী লোক ছাতা মাথায় দিয়া চলিতেছে; "স্কোয়ার" রাস্তা, বাগান —সব জনশূন্য, নিস্তব্ধ ও বিষাদময়; দেখিলে কবরস্থানের ন্যায় ভয়ঙ্কর বোধ হয়। এরূপ হৃদয়ভেদী দৃশ্য বর্ণনা করা আমার অসাধ্য, কিন্তু এরকম দিন লণ্ডনে প্রায়ই হইয়া থাকে। বৃষ্টি গুঁড়ি গুঁড়ি, কিন্তু ঘন হইয়া পড়িতেছে, সর্ব্বত্রই কাদা, আর মাঝে মাঝে জল দাঁড়াইয়াছে। বৃষ্টি আর থামে না, তাহাতে আবার সর্ব্বস্থানে ধোঁয়া ও ঝুলের গন্ধ। একে রবি-বার, তার উপর সমস্ত দিন বৃষ্টি হইতেছে, ইহাতেই রক্ষা নাই, আবার কখন কখন ফগও হইয়া থাকে। সমস্ত ধূসর বর্ণ, রাস্তার দুধারে কাল কাল বাড়ীগুলা স্তূপাকার হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে আর গাঢ় হল্‌দে কোয়াসা সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। বাতাস বহিতেছে না, কোয়াসার সহিত যত ঝুল

ও ময়লা উপর হইতে নীচে নামিতেছে—এ দৃশ্য অতি কষ্ট-দায়ক ও ভয়ঙ্কর। আজ কেহ কোন একটী প্রধান রাস্তায় এক ঘণ্টা বেড়াইলে মনের কষ্টে আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিতে অগ্রসর হয়। বিশেষ আমরা আলোময়, পরিষ্কার ও শ্বেতবর্ণ অট্টালিকায় শোভিত দেশ হইতে আসিয়াছি, সেজন্য আমাদের কাছে লণ্ডনের রবিবারের এ প্রকার দৃশ্য মারাত্মক বলিয়া বোধ হয়।

---

# সপ্তম অধ্যায়।

## ইংরাজ জাতি ও তাহাদের প্রকৃতি।

ইংরাজদের দেখিলেই বলিষ্ঠ, সাহসী, পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া বোধ হয়। ইহাদের মধ্যে অনেকে অতিশয় দৃঢ়রূপে গঠিত, বলবান্ এবং বৃহদাকার—চার হাত বা তাহার অপেক্ষা অধিক লম্বা ও তদনুরূপ প্রশস্ত। এই প্রকার গঠনের লোক সৈন্য, শান্তিরক্ষক ও উচ্চপদবীস্থ ব্যক্তিবর্গের শরীররক্ষকদের মধ্যে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। সকল দেশেই যুদ্ধ, প্রহরিতা প্রভৃতি কঠিন কর্ম্ম করিবার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ ও দীর্ঘকায় লোক নিযুক্ত হইয়া থাকে। এদেশের ধনীদের প্রধান ভৃত্যেরা অধিকাংশ এই দলের লোক। বোধ হয় প্রভুরা নিজ মহত্বের পরিচয় দিবার নিমিত্ত বাছিয়া এইরূপ মহাকায় পুরুষদিগকে নিযুক্ত করেন। তাঁহারা ইহাদের বল-বান্ ও হৃষ্টপুষ্ট রাখিতে যথেষ্ট যত্ন লন আর ইহারাও নিজ

শরীরের পূর্ণ আয়তন বজায় রাখিতে সাধ্যমত চেষ্টা করে। বাস্তবিক, চকচকে পিতলের বোদাম বসান কোট, সাদা দস্তানা ও লম্বা টুপি পরা সাজান পুতুলের মত ভৃত্যদের দেখিলেই এদেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিদের বাহ্যিক আড়ম্বর বুঝা যায়। ভদ্র ও সাধারণ লোকদের মধ্যেও উল্লিখিত আকৃতির অনেক পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের উন্নত দেহ, বিশাল বক্ষঃস্থল ও সুদীর্ঘ বাহুযুগল দেখিলে বোধ হয় যেন ঐ সকল ব্যক্তি কেবল যুদ্ধ করিবার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে।

ইংলণ্ডে ঐরূপ দীর্ঘাকৃতিবিশিষ্টা ও বলবতী স্ত্রীও দেখিয়াছি; আর তাহারা যখন বেশবিন্যাস করিয়া ঘোড়ার উপর চড়িয়া অতি দ্রুতবেগে চলে,তখন তাহাদিগকে যুদ্ধোদ্যতা চামুণ্ডা বলিয়া বোধ হয়। এদেশের বালকবালিকাগুলি অতি সুন্দর ও বলবান্, তাহাদের ঈষৎ রক্তিম কিশোর মুখ অবলোকন করিলে নব প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুলের সহিত তুলনা দিতে ইচ্ছা করে। সহরের অপেক্ষা পল্লীগ্রামের ছেলেরা অধিক সুস্থকায় ও হৃষ্টপুষ্ট। ইংরাজ বালকদের স্থূল ও বৃহৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি দেখিলে বোধ হয় যে, সময়ে ইহারা দৃঢ় ও দীর্ঘাকার মানুষে পরিণত হইয়া বৃদ্ধ পিতামাতাদের নাম রক্ষা করিবে। সাত আট বৎসরের বালকের বল ও কর্ম্মক্ষমতা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়, আর এই বয়সে ইহাদের তেজ দেখে কে? ইংরাজ যুবকেরা সাহস ও বিক্রমের জন্য সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ; ইহারা সুস্থ, সবল ও ব্যায়ামপ্রিয়। অলস ভাবে বসিয়া থাকিতে ইহাদের বিরক্তি বোধ হয়; ভাল খাওয়া, ঘুসাঘুসি করা, ব্যাট ও বল খেলা, দাঁড় বহা ও ঘোড়ায় চড়াতে

ইহারা অধিক রত থাকে এবং এই সকল শরীরসঞ্চালক ক্রীড়াতেই অতিশয় নিপুণ হয়। জীবনের প্রারম্ভেই ইহারা কষ্টসহ, সাহসী ও ধৈর্য্যশালী হইতে শিক্ষা করে এবং নানাপ্রকার অসমসাহসিকতার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে। ইংরাজ যুবকেরা অতি আহ্লাদ ও উৎসাহ সহকারে বিপদ্‌কে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হয়। জলে ডুবিয়া বা মাথা ভাঙ্গিয়া প্রাণনাশ হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও ইহারা বিপদ্‌সঙ্কুল স্থানে শিকার করিতে, বন্ধুর পর্ব্বতের উপর উঠিতে বা উচ্চণ্ড জলপ্রসবণের মুখে সাঁতার দিতে কখন বিমুখ হইবে না।

এদেশে আবার এরূপ কতকগুলি মধ্যমাকৃতি এবং শান্ত ও ধীরপ্রকৃতি লোক আছে যে, দেখিলে উপরি লিখিত জাতির লোক বলিয়াই মনে হয় না। ইহারা ভারতবর্ষীয়, পারসীক, ফরাসী, ইটালীয় প্রভৃতি জাতিদের হইতে একেবারে বিভিন্ন। এইরূপ শীতলপ্রকৃতির মানুষ পূর্ব্বে কখন দেখি নাই। এই ইংরাজদের দেখিতে জীবনশূন্য শরীরের ন্যায়, মুখে কোন ভাব নাই; চক্ষু সর্ব্বদাই স্থির ও নিস্পন্দ, কোন প্রকার চাঞ্চল্য বা চতুরতা নাই। ইহাদের হৃদয়বিহীন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, অন্তঃকরণ থাকিলেও তাহার চৈতন্য বা বিকারের কোন চিহ্ন লক্ষিত হয় না। তুচ্ছ কারণে কখন ক্রোধ বা অন্য কোন রিপু ইহাদিগকে বশীভূত করিতে পারে না। ইহাদের হাত, পা ইত্যাদির চালনা দেখিলে বোধ হয় কলে নড়িতেছে, আর ইহারা সর্ব্বদা এপ্রকার বাক্‌শূন্য ও গম্ভীরাকৃতি যে দেখিবামাত্র মনে হয় যেন সকল সময়েই কঠোর ব্রতে নিমগ্ন রহিয়াছে। দয়া দাক্ষিণ্যাদি কোমল গুণ

ইহাদের অন্তরে অতি বিরল। ইহারাই আবার ঘোর বিপদ্-গ্রস্ত হইয়াও স্থির মনে ও অবিচলিত ধৈর্য্যে ভয়ঙ্কর বিপদ্-সমূহকে অতিক্রম করিতে যত্নবান্ হয়।

ইংরাজদের মধ্যে সচরাচর আর এক প্রকারের লোক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের শরীরের গঠনে অনেক বৈলক্ষণ্য আছে, কেহ বা অতি দীর্ঘাকৃতি ও বলবান্, কেহ বা অতি ক্ষুদ্রকায় ও বলহীন; কিন্তু সাহস, উদ্যম, সহিষ্ণুতা, কার্য্য-ক্ষমতা প্রভৃতি গুণের জন্য বিখ্যাত। বারবার, শতবার নিরাশ হইলেও ইহারা কোন কঠিন কর্ম্ম সাধিতে বিরত হয় না। ধনলাভই ইহাদের জীবনের একটা সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য। ইহারা অর্থ উপার্জ্জনের নিমিত্ত নানা প্রকার বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অতি দুঃসাধ্য কর্ম্ম সকল সম্পাদন করে এবং প্রাণ-নাশের সম্ভাবনা থাকিলেও অর্থের লালাসায় অতি বিষম বিপদ্‌সঙ্কুল দেশে যাইতেও অগ্রসর হয়। এই প্রকার লোকেরাই সর্ব্বদা বিদেশ গমন পূর্ব্বক বাণিজ্য করিয়া ও কারখানা খুলিয়া সমস্ত জাতিকে সম্পত্তিশালী করে।

ইংরাজজাতির স্বার্থই সর্ব্বত্র সর্ব্বদা পূজিত হয়। ইহারা প্রতি কথাতেই স্বার্থ অন্বেষণ করিয়া থাকে এবং যেরূপেই হউক স্বার্থলাভ করা ইহাদের নিজের প্রধান লক্ষ্য। নিজের মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা ব্যতিরেকে ইংরাজেরা কখন কোন কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করে না এবং নিজের অভীষ্টসিদ্ধির জন্য, এমন কোন কাজ নাই, যাহাতে ইহারা অগ্রসর হয় না। ইহাদের বিশ্বাস এই যে, পৃথিবীর সকল দেশ ও সকল জাতিই কেবল ইহাদের মনোবাঞ্ছা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য সৃজিত হইয়াছে। অন্য

কেহ যে, নির্বিঘ্নে নিজের উচিত অংশ ভোগ করিবে কিম্বা ইহাদের ভাগ লইবে, তাহা এই গৃধ্নু ইংরাজেরা কখন সহিতে পারে না। অন্য জাতিদের অপেক্ষা অধিক বিভবশালী হইয়াও ইহারা সন্তুষ্ট নয়, সর্ব্বগ্রাস করাই ইহাদের একান্ত ইচ্ছা। 'সকলই আমি লইব' 'সকলই আমি গ্রাস করিব'—ইহাই নিরন্তর ইংরাজহৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে। এই মহালালসা চরিতার্থ করিবার জন্যই ইংরাজেরা পৃথিবীর সকল স্থানে ব্যাপিয়া পড়িয়াছে এবং ইহারই প্রভাবে ক্রমে ক্রমে আপনা-দের সাম্রাজ্য এত বাড়াইয়াছে ও আরো বাড়াইতেছে।

টাকা ইংরাজদের প্রধান আরাধ্য দেবতা। ইহারা যে টাকার কেমন আদর করে ও টাকা পাইবার জন্য পাগল হইয়া বেড়ায়, তাহা কিছুদিন ইংলণ্ডে বাস করিলে সহজেই বুঝা যায়। কি স্বদেশ কি বিদেশ, সর্ব্বত্রই টাকা ধরিবার জন্য জাল পাতিয়া রাখিয়াছে, এবং যেখানে অর্থের গন্ধ পায়, সেই খানেই ধনলোলুপ ইংরাজ আমিষলোভী গৃধ্রের ন্যায় ধাবমান হয়। বোধ হয় এমন দেশ নাই যে স্থান হইতে ইহারা অর্থ চুষিয়া আনিতেছে না। টাকা করিবার সময় ইহাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান থাকে না। অর্থলাভের জন্য বিদেশে গিয়া কোন প্রকার নিন্দনীয় উপায় অবলম্বন করিলেও ইহাদের মনে আত্মগ্লানির উদয় হয় না। ভারতবর্ষের কথা দূরে থাকুক অন্যান্য দেশেও ইহারা টাকার জন্য কি না করিয়া থাকে? দুর্ভাগ্য চীনেদের মধ্যে বলপূর্ব্বক আফিং প্রবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত ইংরাজেরা কত রক্তপাত ও অর্থব্যয় করিয়াছে, আর ধনলাভের আশায় নির্দ্দোষী চীনদিগকে এইরূপ গরল পান করাইয়াও

ইহারা বিন্দুমাত্র মনঃক্লেশ পায় না! ইংরাজদের উপর অর্থ-পিশাচের এতই পরাক্রম!! ভারতবর্ষ, চীন, জর্ম্মণী, ফ্রান্স—সকল দেশেই বিদ্যাবুদ্ধির অধিক আদর করে, কিন্তু ইংলণ্ডে টাকাই সর্ব্বেসর্ব্বা। আমাদের দেশে একজন দরিদ্র শিক্ষিত ব্রাহ্মণ রাজার নিকটও আদৃত হন এবং মহারাজ ব্রাহ্মণকে দেখিবামাত্র সিংহাসন হইতে উঠিয়া গলবস্ত্রে প্রণাম করিতে হীনতা বোধ করেন না। এদেশে কিন্তু, কেহ যতই জ্ঞানবান্ ও বুদ্ধিমান্ হউন না, লোকে তাঁহাকে ফেলিয়া একজন অপদার্থ বড়মানুষের অধিক সমাদর করিবে। টাকার এত প্রভাব দেখিয়া এখানে শিক্ষিতেরাও অর্থলোলুপ হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

এই টাকাতেই আবার ইংরাজদের এত অহঙ্কার। বিস্তৃত সাম্রাজ্য ও প্রভূত অর্থরাশি ইহাদিগকে একেবারে গর্ব্বোন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে। ইহারা মনে করে সমস্ত ভূমণ্ডল ইহাদের পদানত এবং পৃথিবীর সকল জাতিই ইহাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট। ইহারা সমস্ত সভ্য জাতির অগ্রগণ্য এবং বিদ্যা, বুদ্ধি, বল ইত্যাদিতে সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইহাই ইংরাজদের দৃঢ় বিশ্বাস। কোন অপর জাতি ইহাদের হইতে কোন বিষয়ে প্রভিন্ন হইলে ইংরাজেরা তাহাদের প্রতি অতিশয় অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকে। এমন কি, ফ্রান্স, জর্ম্মণী প্রভৃতি দেশ সভ্যতায় ইংলণ্ড হইতে কোন ক্রমেই হীন নয় এবং ফরাসীরা বা জর্ম্মণেরা বিদ্যা, বুদ্ধি, তেজ, পরাক্রম ইত্যাদিতে ইংরাজদের অপেক্ষা কখনই নিকৃষ্ট নয়, বরং অনেক বিষয়ে ইহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তথাপি গর্ব্বিত ইংরাজেরা ঐ সকল জাতির ভিন্ন রীতি, নীতি

ও চালচলনে ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া থাকে। ইউরোপের অন্যান্য দেশে বেড়াইবার সময় ইহারা অনেক বিষয়ে হেয়জ্ঞান করিয়া বিদেশীয়দের সহিত দর্পিত ভাবে কথাবার্ত্তা কয়ে এবং তাহাদের নিকটে আপনাদের শ্রেষ্ঠতার পরিচয় দিতে যত্নবান্ হয়। ইংলণ্ডে বিদেশীয়দের সহিত আলাপ করিবার সময় ইহারা গম্ভীরমূর্ত্তি ধরে ও বড় চালে কথা কহে। আর সাধারণ লোকে বিদেশীয়দের দুইচক্ষে দেখিতে পারে না; ইংরাজেরা সকল দেশে গিয়া সর্ব্বস্ব লইয়া আসে, কিন্তু কোন বিদেশীয় এদেশে না বাস করে—ইহাই ইহাদের একান্ত ইচ্ছা।

এই জাতির লোকেরাই যে আমাদের দেশের সমস্ত বস্তুকে জঘন্য জ্ঞান করিবে এবং অসভ্য ভাবিয়া আমাদের প্রতি পশুর যোগ্য আচরণ করিবে ইহাতে কেহই বিস্ময়াপন্ন হইবেন না। ভারতের শোণিতেই ইংলণ্ড এত স্ফীত হইয়াছে এবং ভারতের জন্যই ইংরাজেরা এত গর্ব্বে টলিয়া পড়িতেছে! পড়িবার আগেই বাড়াবাড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। এই গর্ব্ব হইতেই রোমরাজ্যের অবনতি ও পতন হইয়াছিল এবং এই গর্ব্ব হইতেই অতি অল্পদিন হইল, বিভবশালী ফ্রান্স অন্যায় যুদ্ধে জর্ম্মণীর নিকট পরাস্ত হইয়া হতদর্প হইয়াছে।

হিন্দুদের মত ইংরাজদের মধ্যে জাতিভেদ নাই, কিন্তু এখানে ভয়ানক শ্রেণীভেদ দেখিতে পাই। এই শ্রেণীভেদ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নয়, অর্থই ইহার একমাত্র মূল। লর্ডেরা তাহাদের সন্তানদের কখন সামান্য লোকদের ছেলেমেয়ের সহিত বিবাহ দেয় না, ধনীরা সমাজচ্যুত হইবার ভয়ে কখন দরিদ্রদের সহিত নিজ পুত্রকন্যার বিবাহ দিতে অগ্রসর হয় না।

বিশেষ এখানকার বড়মানুষেরা গরিব লোকদের যেরূপ ঘৃণা করে, তাহা দেখিলে আমাদের ভারতের জাতিভেদ এই শ্রেণী-ভেদ হইতে কোন কোন সময়ে ভাল বলিয়া বোধ হয়। এ-দেশে একজন গণ্ডমূর্খ ধনী আপনাকে অতি শ্রেষ্ঠ ভাবিয়া একজন বিদ্বান্ ও মার্জ্জিতবুদ্ধি দরিদ্র ব্যক্তিকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে। এখানে যাহার মাসে পাঁচশত টাকা আয় সে, একজন মাসে তিন শত টাকা বেতনধারী লোককে ঘৃণিত ভাবে দেখে; একজন দশ টাকাওয়ালা লোক আপনাকে বড় মনে করিয়া একজন আট টাকাওয়ালা লোকের সঙ্গে কথা কহিতে চাহে না।

এদেশের এই শ্রেণীভেদ অনেক অপকারের কারণ হইয়াছে। সাধারণ লোকে দুর্ভাগ্য দরিদ্রদের বিষয় না ভাবিয়া সর্ব্বদা লর্ড ও ধনীদের খোসামোদ করিয়া বেড়ায়। বড়-মানুষেরা কেবল স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত, গরিবদের প্রতি একবারও দৃক্‌পাত করেন না বলিলেই হয়। এই ঘৃণার জন্যই ইংলণ্ডের সামান্য লোকে এত সুবিধা থাকিতেও সভ্য ও সুশিক্ষিত হয় না। তাহারা জীবনে কখন ভদ্রলোকের সহিত মিশিতে বা আলাপ করিতে পায় না, সুতরাং ভদ্র ব্যবহার কাহাকে বলে তাহাও জানে না। এদেশের শিক্ষিত ভদ্র লোক দেখিয়া যেরূপ আহ্লাদ হয়, অশিক্ষিত ছোটলোক দেখিলে সেইরূপ দুঃখ ও ঘৃণা হয়। দুঃখ এই যে, ইহারা এত সভ্যতার মধ্যে থাকিয়াও শ্রেণীভেদের দোষে অতি নীচ অবস্থায় রহিয়াছে; আর ঘৃণা, এই যে, ইহারা অতি কদর্য্য আচরণ করিয়া থাকে এবং নিজের ও অন্য কাহারও মর্য্যাদা রাখিতে জানে না।

আমাদের দেশে বড়মানুষ ও গরিব—এই দুই কথা শুনিতে পাই, কিন্তু ইংলণ্ডে সদা সর্ব্বদা কেবল "ভদ্রলোক" ও "ছোট-লোকদের" কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এদেশে যেরূপ সমাজ-গঠন তাহাতে অর্থশূন্য লোকের জীবন অতি কষ্টকর। টাকা না থাকিলে এখানে ভদ্র বলিয়া পরিচিত হওয়া বা ভদ্রলোকের সহিত মিশামিশি করা যায় না। অনেক গরিব ভদ্রলোককে দেশের প্রথানুসারে কালক্রমে ছোটলোকদের দলের মধ্যে আসিয়া পড়িতে বাধ্য হইতে হয়, এবং তাহাদের সহিত বাস করিতে করিতে ঐ ভদ্রলোকেরা স্বাভাবিক সদ্গুণ সকল হারাইয়া অবশেষে ছোট লোকদের নীচ স্বভাব প্রাপ্ত হন। আর এদেশের ছোটলোকদের মত নির্ম্মম পাষণ্ড ও নরাধম অন্য কোন দেশেই নাই। ইহাদের প্রকৃতি দুর্দ্দান্ত পশুর ন্যায়।

ইংরাজদের অন্তঃকরণে স্নেহ, মমতা, বিনয় ও দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি কোমল গুণ অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। ইহাদের মন পাষাণের ন্যায় কঠিন বলিয়া বোধ হয়; ইহারা কখন কথায় ভুলে না বা শীঘ্র অন্যের সুখদুঃখে গলিয়া যায় না। সাধারণ ইংরাজেরা নিজ আত্মীয় কুটুম্বের কষ্ট দেখিলেও অধিক কাতর হয় না। সচরাচর ইহারা দুর্ব্বলদের উপর অধিক অত্যাচার করিয়া থাকে এবং দুর্ভাগ্যদের সহানুভূতি করে না। তেজ ও সাহস দেখাইলে ইহারা চুপ্ করিয়া থাকে, কিন্তু নম্র বা নির্বীর্য্য লোকের ঘাড়ে চাপে। অনেকের স্বভাব কুকুরের মত; কোনরূপ বিদ্রূপ করিলে, তাহাদের কাছে শান্ত প্রকৃতি দেখাইলে নিস্তার নাই, কেবল তাড়না করিলে বা লাঠি ধরিলে তাহারা

মাথা হেঁট করিয়া পলাইয়া যায়। অপব্যয়িতা এবং মদ্যপান ইংরাজদের আর দুইটী মহৎ দোষ। কি ধনী, কি দরিদ্র সকলেই যেমন উপার্জ্জন করে তেমনি বা তাহার অপেক্ষা অধিক ব্যয় করে, আর মদ্যপানে ইংরাজেরা অদ্বিতীয়।) এই দুটী দোষ হইতে ইহাদের যে কত দুর্গতি তাহা পরে বিস্তারিয়া লিখিব।

এজাতির মধ্যে অনেক ভণ্ড দেখিতে পাই। অনেক সময়ে ইহাদের অন্তরে এক রকম ভাব থাকে, আর বাহিরে তার বিপরীত ভাব প্রকাশ করে। ইহাদের ভদ্র ব্যবহার অনেক সময়ে কেবল মৌখিক, আন্তরিক নহে। দোকানদার, ব্যবসায়ীদের মিষ্ট কথায় একেবারে মোহিত হইয়া যাইবে, কিন্তু সে শিষ্টালাপ হৃদ্গত নহে, কেবল টাকার জন্য। অনেকে বিদেশীয়দের প্রতি অতি সদাশয়তা দেখাইয়া থাকেন, কিন্তু উহা বাহ্যাড়ম্বর মাত্র। এই দোকানদারী ভদ্রতা ইংলণ্ডের সকল প্রকার সমাজের লোকদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। বিদেশীয়েরা প্রথম প্রথম ইহাদের বহিরাকারে ভুলিয়া গিয়া সর্ব্বসাধারণ ইংরাজদের সৌজন্যের প্রশংসা করিয়াথাকেন, কিন্তু কিছুকাল পরে ইহাদের সরলতা সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত হন। অন্য জাতিদের মধ্যে যে সকল দোষ লক্ষিত হয়, ইংরাজ জাতিতে সে সকলই বর্ত্তমান, অথচ ইহারা তাহা স্বীকার করিবে না। ইহারা সবই করে কিন্তু এরূপ ভান করিয়া থাকে যেন কিছুই জানে না। আহারের পর মুখের বহির্ভাগ মাত্র মার্জ্জন করিলেই ইহারা যেমন আপনাদিগকে পরিশুদ্ধ ভাবিয়া থাকে, সেইরূপ অন্তর কলুষিত হইলেও বাহ্যিক গম্ভীরভাব ধারণপূর্ব্বক

আপনাদিগকে সাধু বলিয়া পরিচয় দেয়। ইংরাজদের মধ্যে অনেকে, ভদ্রলোকদের কেবল বহিরাকার অনুকরণ করিলে ভদ্রলোক হওয়া যায় এই বিশ্বাস করে। এই প্রকার লোককে ইংরাজীতে 'স্নব' বলে; বিখ্যাত ইংরাজী গ্রন্থকার 'থ্যাকারে' এই ইংরাজ স্নবদের চরিত্র যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন সেরূপ কোন বিদেশীয় পারিবেন না। অনেক বিদেশীয় সমস্ত ইংরাজদের ভণ্ড তপস্বীর জাতি বলিয়া থাকেন। বাস্তবিক, এ বিষয়ে ইংলণ্ডে যেরূপ বাড়াবাড়ি দেখি, সেরূপ আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। যাহার যেমন অবস্থা সে তাহার অপেক্ষা আপনাকে ধনী দেখাইবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করে; এমন কি, অনেকে না খাইয়া বা বাঁধা দিয়া ভদ্র সাজিয়া বেড়ায়। রাস্তার লোকদের কেবল পোষাক দেখিয়া কে কোন শ্রেণীর লোক তাহা বিচার করা ভার; কিন্তু মুখ ও আকারপ্রকার দেখিলেই কিম্বা কথা শুনিলেই উহাদের বিদ্যা বুদ্ধি ও ধনের পরিচয় পাওয়া যায়।

এখানকার সাধারণ লোকদের সভ্যতা দেখিলে কেবল উপরে ঢাকা বলিয়া বোধ হয়; পূর্ব্বে ভিতরে যে প্রকার অসভ্য ছিল এখনও সেইরূপ আছে। যাহারা বিদেশে ভ্রমণ করিয়াছে ও নানাপ্রকার লোকের সহিত মিশিয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনেক ভদ্র ও সভ্য লোক দেখা যায় বটে, কিন্তু সর্ব্বসাধারণ লোকে আসল সভ্য নয়। ইহারা এত লেখাপড়া শিখিতেছে ও উন্নত হইতেছে, তথাপি ইহাদের মন হইতে অসভ্যস্বভাবসিদ্ধ কুসংস্কার সকল অন্তর্হিত হয় নাই। সময়ে সময়ে বিদেশীয়দের প্রতি ইহাদের আচরণ দেখিলে উহার

স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কোন ভিন্নাকৃতি লোক দেখিলে ইহারা তাহাকে জন্তু মনে করিয়া তাহার দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে এবং কখন কখন বুড়োরাও বালক-বালিকাদের ঘৃণাসূচক উপহাসে যোগ দিয়া থাকে। একজন বিদেশীয় স্ত্রীলোকের মুখে শুনিয়াছি যে, তিনি প্রথমে ইংলণ্ডে আসিয়া দোকানে গিয়া যদি কোন ভুল ইংরাজী বলিতেন, তাহা হইলে দোকানের লোকেরা তাঁহার প্রতি সদয় হইবার পরিবর্ত্তে হাসিয়া তাঁহাকে অপদস্থ করিত। এক দিন কোন একটা মেলাতে গিয়া দেখিলাম, এক স্থানে লোকের অতিশয় ভিড় হইয়াছে ও মাঝে মাঝে বিদ্রূপসূচক হাস্যধ্বনি উঠিতেছে। প্রথমে ভাবিলাম যে একটা অপরূপ জন্তু আসিয়াছে অথবা বাঁদর-নাচ হইতেছে; কিন্তু নিকটে গিয়া দেখি, একজন চীনেকে ঘেরিয়া স্ত্রী, পুরুষ অনেকে মিলিয়া নানা প্রকার বিদ্রূপ করিতেছে। একজন স্ত্রীলোক তাহার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া অনেক ভঙ্গিমা করিতেছে, কেহ বা আবার তাহার বেণী ধরিয়া টানিতেছে। দুর্ভাগ্য চীন হাসিয়া তাহাদের অসভ্যতাকে ধিক্কার দিলেও ঐ লোকদের লজ্জাবোধ হইল না। বোধ হয় এরূপ জঘন্য ব্যাপার অন্য কোন সভ্য জাতি করে না, অন্ততঃ আমরা অসভ্য ভারতবাসীরা কোন বিদেশীয়ের প্রতি এরূপ আচরণ করি না।

বাস্তবিক ইংরাজেরা সমস্ত সভ্যতা বিদেশ হইতে পাইয়াছে। হিন্দু, গ্রীক, আরব ও অন্যান্য জাতিরা নিজেদের মধ্য হইতেই সভ্যতা গঠিয়াছিল, কিন্তু ইংরাজদের আদি হইতে অন্ত প্রায়

সকলই বিজাতীয়দের অনুকরণ। সকল দেশের সাধারণ লোকদের অবস্থা তুলনা করিয়া দেখিলে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ধনী এবং উপরকার শ্রেণীর লোকেরা প্রায় সব দেশেই সভ্য, কিন্তু ইতর লোকদের বিদ্যা বুদ্ধি ও আচার ব্যবহার যথার্থ সভ্যতার পরিচয় দিয়া থাকে। যাহাহউক, ইংরাজদের একটী মহৎ গুণ এই যে, ইহারা অন্য জাতির সদ্‌গুণ গুলি অনুকরণ করিয়া লয়। ইহারা শীঘ্র পরের ভাল গুণ দেখিতে পায় না কিম্বা স্বীকার করে না, কিন্তু এক-বার ঠিক্ বুঝিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ তাহা নিজেদের করিয়া লয়। ইহারা কেহ নূতন বিষয় আরম্ভ করিলে প্রথমে উপহাস করে, তাহার পর চুপ করিয়া থাকে এবং পরে ইহাদের নিকট সেইটী ভাল বলিয়া প্রমাণিত হইলে ক্রমে ক্রমে সমস্ত জাতি উহা নিজেদের মধ্যে চলিত করে। এই রকমে ইংরাজদের এত সভ্যতা ও উন্নতি হইয়াছে। আমরা জড়তা বশতই হউক বা উপহাসের ভয়েই হউক অন্যের ভাল বিষয় সকল অনুকরণ করি না বলিয়াই আমাদের এত অধোগতি হইয়াছে। ইংরাজ-দের অনুকরণ সম্বন্ধে একটী সামান্য গল্প চলিত আছে। পূর্ব্বে ইহারা বৃষ্টিতে কখন ছাতা মাথায় দিত না, যতই কেন বৃষ্টি হউক না ভিজিয়া ভিজিয়া রাস্তায় চলিত। ক্রমে যখন ফরাসী ও অন্যান্যদের দেখিয়া দুই এক জন ইংরাজ ছাতা মাথায় দিতে আরম্ভ করিল, লোকে তাহাদের 'ফরাসী' 'ফরাসী' বলিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিল। এই উপহাস শুনিয়াও তাহারা সে অভ্যাস ছাড়ে নাই; পরে তাহাদের অনুকরণে এখন সকলে বৃষ্টিতে ছাতা মাথায় দিতে শিখিয়াছে। এ পর্য্যন্ত

ইংলণ্ডে শিশু, স্থবির ও স্ত্রীলোক ভিন্ন কেহ রৌদ্রে মাথা ফাটিয়া গেলেও ছাতা ব্যবহার করে না।

ইংরাজেরা অনেক বিষয়ে আমাদের কেন, ইউরোপের অন্যান্য জাতিদের হইতে একেবারে ভিন্ন। একটী বিষয়ে ইহারা পৃথিবীর মধ্যে অতুল; এরূপ অন্য কোন জাতি সম্বন্ধে শুনি নাই বা পড়ি নাই। সকল দেশেই দেখা যায়, রাস্তা, বাজার ও অন্যান্য স্থানে লোকেরা পরস্পর কথা কয়, গল্প করে ও হাসি তামাসা করে; কিন্তু ইংরাজেরা নিজের আত্মীয় বা পরিচিত ভিন্ন অপর লোকের সহিত কথা কহিতে ভাল বাসে না। রাস্তায়, ষ্টেশনে, যেথানে অধিক লোকের ভিড়, সেখানে গাড়ী ঘোড়ার শব্দে কানে ধাঁধাঁ লাগিয়া যাইতেছে, কিন্তু লোকের কথার শব্দ শুনিতেই পাইবে না—সকলেই চুপ্‌চাপ্, যেন কলে নড়িতেছে। কোন বন্ধু বা আত্মীয় পরিচয় না করাইয়া দিলে, কেহ কাহারও সহিত কথা কহিতে বা কোন সংস্রব রাখিতে চাহে না; অপরিচিতের সহিত মিশিলে ইংরাজদের ভদ্রতার হানি হয়। কথিত আছে, একজন লোক একটা গর্ত্তের ভিতর পড়িয়া গিয়া কাহারও সাহায্য পাইবার আশায় কাঁদিতেছিল, এমন সময়ে আর একজন ইংরাজ সেইথান দিয়া যাইতেছিল। সে ঐ দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্যক্তির রোদন শুনিয়া মনে মনে বলিল,—"আহা! কি দুঃখের বিষয়, উহার সহিত যদি আমার পরিচয় থাকিত তাহা হইলে আমি এই ক্ষণেই উহাকে বাঁচাইতে পারিতাম"। গল্পটী সত্য কি মিথ্যা তাহা জানি না, কিন্তু সময়ে সময়ে ইংরাজদের শীতলতা দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্য হইতে হয়। ( আবার দেখিতে পাই,

কলের গাড়ী কিম্বা ট্র্যামের ভিতর দশ বার জন লোক মুখামুখি করিয়া বসিয়া আছে; কিন্তু সব চুপ্, কেহই আগে কথা কহিয়া নিজের মান হারাইতে চাহে না। সভ্যই বল আর অসভ্যই বল আমরা এ প্রকার মূকতা দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না।

অনেকে বলিয়া থাকেন, কথাবার্ত্তা মানুষের জীবনের লবণস্বরূপ; বাস্তবিক, পরস্পর আলাপ করিতে না পাইলে জীবন বিস্বাদ বলিয়া বোধ হয়। ইংরাজেরা মুখ বুজিয়া থাকিয়া যে কি সুখ পায়, তাহা বুঝিতে পারি না। কাহাকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসিলে সে এক কথায় সব সারিয়া দেয়; বোধ হয়, যেন ইহারা টাকার বদলে কথা বাঁচাইতে চেষ্টা করে। একজন লোকের সঙ্গে আমার একদিন তিনবার দেখা হইয়াছিল, সে তিনবারই কথার মধ্যে কেবল "আজ বেশ দিন" এই বলিয়াছিল। ইংরাজ যুবকেরা ক্রিকেট, ফুটবল ইত্যাদি খেলিবার সময় চুপ্ করিয়া থাকিতে পারিলে কথা কহে না, এবং গোলা দ্বারা আহত হইলেও অতি অস্পষ্ট স্বরে জানায়। আমার মনে হয়, এদেশের কদর্য্য জলবায়ুর দোষেই ইংরাজেরা এত নিস্তব্ধ হইয়া থাকিতে ভাল বাসে, যথার্থই এখানকার জল বায়ু যেরূপ জঘন্য তাহাতে রাস্তা ঘাটে মিশামিশি করা ভার। এই নিস্তব্ধতা ও শীতলতা আবার ইংরাজজাতির কতকগুলি ভাল গুণের লক্ষণ। কোন কাজ করিবার সময় ইহারা কথা কহে না, একভাবে, একমনে কেবল কাজই করে। ইহারা শীঘ্র উপস্থিতবুদ্ধি হারায় না। ঘোর বিপদের সময়ও হাহাকার না করিয়া স্থিরভাবে প্রতীকারসাধনে চেষ্টা করে। ইংরাজ

সৈন্যেরা যুদ্ধের সময় বিবেকশূন্য না হইয়া নিয়ম ও সুশৃঙ্খলার সহিত কেমন ধীরভাবে যুদ্ধ করে, ইতিহাসে তাহার অনেকানেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

এতক্ষণ ইংরাজদের দোষ বর্ণনা করিতে ছিলাম, এখন ইহাদের ভাল দিক পর্য্যালোচনা করিব। অনেকগুলি দোষ থাকিলেও ইংরাজজাতির ভিত্তি উত্তম। (কার্য্যক্ষমতা, পরিশ্রম, অধ্যবসায়, তেজ, সাহস প্রভৃতি সদ্‌গুণ থাকাতেই এই জাতির এত সভ্যতা ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।) আমরা ভারতবর্ষীয়েরা নিজ্‌দোষে ইংরাজদের অধীন হইয়া আছি, এবং আমাদের অক্ষমতা বশতই বিদেশীয়েরা স্বার্থপর ভাবে ভারতের উপর রাজত্ব করিতেছে। আর অধিকাংশ ইংরাজ নিজ দেশ ছাড়িয়া যাইবার সময়, নিজেদের অনেকগুলি সদ্‌গুণ পশ্চাতে রাখিয়া যায়; স্বার্থই ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য, সুতরাং বিদেশে ইহাদের স্বার্থপর প্রবৃত্তিসকলই অধিক প্রখর হইয়া উঠে। বিশেষ অধীন ভারতের বাতাসে ইহাদের ভয়ানক রূপান্তর ঘটিয়া থাকে। অতএব আমরা সে দেশে সদাসর্ব্বদা ঐ সকল ইংরাজদের কেবল মন্দ দিক দেখিয়া সমস্ত ইংরাজ জাতিকে মন্দ মনে করি। আবার আমরা বহুদিন পরাধীন আছি বলিয়া অনেক সময়ে স্বাধীন জাতিদের সদ্‌গুণগুলি দেখিতে পাই না। লোকের ভাল গুণগুলি উপেক্ষা করিয়া কেবল মন্দ গুণগুলি আলোচনা করা সাধুর কাজ নয়। ইংরাজজাতির অনেক সদ্‌গুণ আছে বলিয়াই ইহারা এত বড় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সমস্ত ইংরাজজাতি যদি কেবল দোষময় হইত, তাহা হইলে আমরা ইহাদের

বিষয় কিছুই জানিতাম না এবং আমিও এই পুস্তক লিখিতাম না।

কর্ম্ম ইংরাজজীবনের সঙ্গীর মত; জলবায়ুর গুণেই হউক, অথবা স্বাভাবিক গুণেই হউক ইহারা অতিশয় কর্ম্মপ্রিয়। ইহারা কোন কঠিন পরিশ্রম করিতে ভয় পায় না বা শীঘ্র পরিশ্রমে কাতর হয় না। আমাদের দেশে গ্রীষ্মের জন্য অথবা অলসতা বশতঃ লোকে দুই চারি ঘণ্টা কর্ম্ম করিয়া একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়ে; কিন্তু ইংরাজেরা পাঁচ ছয় ঘণ্টার মধ্যে কাতর হয় না বা ক্ষণে ক্ষণে বিশ্রাম লয় না। রাস্তা খনন, বাড়ী নির্ম্মাণ ইত্যাদি কর্ম্ম দুই এক দিন মনোযোগ দিয়া দেখিলেই জানিতে পারা যায়, ইহারা প্রথম ঘণ্টাতে যত খানি কাজ করে, দিনের শেষ দশম ঘণ্টাতেও সেইরূপ অধ্যবসায়ের সহিত তত খানি কর্ম্ম করে। ইহারা কর্ম্মে যেমন পটু, কথাতে ও কাজের নিয়মে সেইরূপ ঠিক্‌ঠাক্‌। ইংরাজেরা যেরূপ নিজের সময় নষ্ট করিতে ভাল বাসে না, সেইরূপ বৃথা বাক্যব্যয় করিয়া অন্যেরও সময় নষ্ট করে না। কাহাকে কোন বিষয়ে বিরক্ত করিতে বা কাহার দ্বারা নানাবিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইতে ইচ্ছা করে না। এই সকল কারণে ইহাদের সহিত কর্ম্ম করিতে সুখ আছে।

এই কার্য্যক্ষমতা থাকাতেই ইংরাজেরা বাণিজ্যে অদ্বিতীয় হইয়াছে। বাণিজ্য ইহাদের মহাবল; এই বাণিজ্যের প্রভাবেই ইহারা এত ধনশালী এবং ইহাদের রাজ্য পৃথিবীর চতুর্দ্দিক ব্যাপিয়া রহিয়াছে। অপর একটী অধ্যায়ে এই বিষয় বিশেষ করিয়া লিখিব। উদ্যম ইংরাজদের আর একটী প্রধান

গুণ। ইহারা সর্ব্বদা চারিদিকে চক্ষু রাখিয়া চলে, কোথাও বাণিজ্য কিম্বা নূতন শিল্পকর্ম্মের সূত্র দেখিলে সকলে তৎক্ষণাৎ উৎসাহের সহিত তাহাতে যোগ দিবে। ইহারা কত নূতন নূতন কল আবিষ্কার করিতেছে এবং সর্ব্বদাই শিল্প ও কারুকর্ম্মের কত উন্নতি করিতেছে। আবার বিদেশে কোন নূতন দ্রব্যের আবিষ্কার বা শিল্পকর্ম্মের কোন উন্নতি হইলে তাহার সমস্ত সংবাদ রাখে ও স্বদেশে প্রচলিত করে। ইংরাজদের সাহস ও পরাক্রমের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই দুই গুণে ইহারা কোন জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। ইহারা জীবনের প্রথম পদ হইতে শেষ পদ পর্য্যন্ত সাহসে নির্ভর করিয়া কর্ম্ম করে। ইংরাজদের তেজ ও সাহসের কথা ইতিহাসের প্রতি অধ্যায় প্রতিপদে সপ্রমাণ করিতেছে।

ইংরাজেরা যেমন স্বার্থপর, সেইরূপ আত্মনির্ভর ও আত্মমর্য্যাদা করিতে জানে। নিজে কোন কর্ম্ম সাধিতে পারিলে প্রাণ থাকিতে কখন অন্যের সাহায্যের অপেক্ষা করে না এবং পরের সাহায্যে কোন কর্ম্ম করিতে লজ্জাবোধ করে। ইহারা পরের সহায়তা করে না আর পরের সহায়তা চাহেও না। কোন ইংরাজের নিকটে কোন বিষয় জিজ্ঞাসিলে তিনি "নিজের সাহায্য নিজেই কর" এই উপদেশ দেন। এখানে কি বড়, কি ছোট, সকলেই নিজের সংস্থান নিজে দেখে। ভারতবর্ষে যেমন উপযুক্ত সন্তানেরা পিতার টাকায় খাইতে পরিতে লজ্জাবোধ করে না, এখানে সে প্রকার কাপুরুষতা বা অলসতা দেখিতে পাই না। পুত্রেরা বয়স প্রাপ্ত হইলেই নিজ নিজ জীবিকা উপার্জ্জনের পথ দেখে; অবিবাহিতা কন্যারা

পর্য্যন্ত নিষ্কর্ম্মা হইয়া পিতৃগৃহে বাস করিতে নিজেদের হীন বোধ করে এবং আত্মীয় কুটুম্বেরা কাহারও গলগ্রহ হইয়া অলস ভাবে থাকিতে লজ্জিত হয়। ইহারা অতি বাল্যকাল হইতেই আত্মনির্ভর করিতে শিক্ষা করে। আমি অনেক সময়ে রাস্তায় বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিয়াছি, ছোট ছেলেদের মধ্যে চলিতে চলিতে কেহ পড়িয়া গেলে, সে তার মার দিকে চাহিয়া না কাঁদিয়া, যতদূর পারে নিজে উঠিতে চেষ্টা করে, আর সে কৃতকার্য্য হইলে তার ছোট ছোট সঙ্গীরা ও মা বাপ তাহাকে বাহবা দেয়। এদেশের লোকেদের আত্মাবলম্বন ও আত্মি-মর্য্যাদার জ্ঞান থাকিলে এখানে অলসতা ও পরপ্রত্যাশা কখন প্রশ্রয় পাইত না।

ইংরাজদের মধ্যে চমৎকার একতা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা স্বার্থপর হইলেও এই জাতীয় একতার গুণে এখানে বহুসংখক বড় বড় কোম্পাণী, ব্যবসায়, কারবার ইত্যাদি সংস্থাপিত করিয়াছে। এই একতা না থাকিলে ইংরাজদের সমস্ত রাজ্য ও বাণিজ্য একদণ্ডে ধ্বংস হইয়া যাইত। একতার বলে এই ক্ষুদ্র দ্বীপবাসীরা কি না করিতেছে, আর একতার অভাবে বৃহৎ ভারতবর্ষের অধিবাসীরা কোন বড় কাজই করিতে পারিতেছে না। পৃথিবীতে অনেক কর্ম্ম একাকী সম্পন্ন করা যায় না; একজন লোক সমস্ত দেশকে উন্নত বা সমস্ত দেশ জয় করিতে পারে না। এক গাছা ছড়ি কেহ অনায়াসে ভাঙ্গিতে পারে, কিন্তু দশ গাছা ছড়ি একসঙ্গে করিলে তাহা ভাঙ্গা দুঃসাধ্য হয়। একতা সকল জাতির শ্রীবৃদ্ধির একটী প্রধান উপায়, আমরা সেই পরম উৎকৃষ্ট উপায়ে একেবারে

বঞ্চিত। ইংরাজেরা একসঙ্গে মিলিয়া সামান্য ধোবার দোকান হইতে এই বিস্তৃত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শাসন পর্য্যন্ত—সকলই করিতেছে; কিন্তু আমাদের না পারিবারিক, না সামাজিক, না জাতীয়—কোন মিলই নাই।

(ইহাদের যেমন জাতীয় একতা, সেইরূপ স্বজাতির প্রতি দৃঢ় অনুরাগ আছে।) ইংরাজেরা নিজ জাতির প্রতি ভালবাসা থাকাতে কখন স্বদেশীয় লোকদের কোন অপমান সহ্য করিতে পারে না, এবং নিজদেশের প্রতি একান্ত মমতা থাকাতে কখন জন্মভূমির অমঙ্গল দেখিতে পারে না। ইহারা যেমন নিজের মর্য্যাদা রাখিতে ব্যস্ত, সেই রূপ নিজ জাতির নাম রক্ষা করিতে সর্ব্বদা যত্নবান্। স্বাধীন জাতি, স্বাধীন দেশ বলিয়া ইহাদের মনে আত্মাভিমান আছে; সেই অভিমান থাকাতে ইহারা কখন স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি কোন কু-ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হয় না। স্বদেশীয় কোন লোকের প্রতি কেহ অত্যাচার করিলে, নিজের অপমান হইয়াছে মনে করিয়া ইহারা তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতীকার করিতে চেষ্টা পায়। কোন বিদেশীয় রাস্তায় একজন লোককে মারিলে প্রায় পঞ্চাশ জন ইংরাজ দৌড়িয়া আসিয়া স্বদেশীয়ের সহায় হইবে এবং বিদেশীয়কে মারিতে উদ্যত হইবে। আমাদের মধ্যে এরূপ স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রিয়তা নাই। দেশের উপকার দূরে থাকুক, সমস্ত দেশটা উৎসন্ন গেলেও আমাদের মনে চেতনা হয় না। আর স্বজাতির প্রতি ভালবাসার কথা কি বলিব, একজনের উপর কোন বিদেশীয়কে উৎপীড়ন করিতে দেখিলে আর একজন দেশীয় "ওকে

মারিতেছে, আমার কি মাথা ব্যথা” এই বলিয়া পলাইয়া যায়।

ইংরাজেরা কোন বিদেশে গেলে বিদেশীয় অপেক্ষা দেশীয় লোকের সহিত একত্র বাস করিতে ভালবাসে; পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করে এবং বিজাতীয়দের অপেক্ষা স্বজাতীয় লোকের উপর অধিক বিশ্বাস করে। ইহারা সর্ব্বদা বিদেশীয়দের সম্মুখে নিজেদের মান রাখিয়া চলে। ইংরাজেরা স্বজাতীয়কে ফেলিয়া কখন বিদেশীয়কে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করে না; বিদেশীয় অপেক্ষাকৃত ভাল হইলেও, পাছে নিজ জাতির অবমাননা হয়, এই ভাবিয়া একজন ইংরাজকে কাজ দিবে। ইহারা স্বজাতিমধ্যে প্রায়ই শঠতা, প্রবঞ্চনা ও মিথ্যাকথা প্রভৃতি দুর্ব্যবহার করে না। ইহারা বরং অন্য জাতির নিকট জুয়াচুরী করিবে তথাপি দেশীয় লোকদের সহিত নীচ ব্যবহার করিবে না। ভারতবর্ষে যেরূপ পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতা দেখিতে পাই, এদেশে ইংরাজদেরমধ্যে সেরূপ নীচ প্রবৃত্তি প্রায়ই দেখা যায় না। ইংরাজেরা কখন নিজ জাতিকে হেয়জ্ঞান করে না ও অন্যের কাছে অবনতশির হইয়া চলে না।

এই প্রসঙ্গে ইংরাজদের আর একটী উৎকৃষ্ট গুণের কথা সংক্ষেপে লিখিব। এই জাতির মধ্যে চমৎকার কর্ত্তব্যকর্ম্মের জ্ঞান দেখিতে পাই। প্রধান মন্ত্রী হইতে সামান্য মজুর পর্য্যন্ত সকলেই একাগ্রচিত্তে নিজ নিজ কর্ত্তব্যকর্ম্ম সাধন করিয়া থাকে। একজন উচ্চ পদবীর রাজকর্ম্মচারী যেরূপ নিজের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য মনোযোগের সহিত সম্পন্ন করেন,

একজন অতি নীচ কর্ম্মচারীও সেইরূপ তাহার নিজের কাজ মন দিয়া করে। একটা ছুতার ডাকিয়া কোন কাজ করিতে দাও, সে কিছু না বলাতেই অতি সুচারুরূপে তাহা শেষ করিবে; সে ঠিক কাজ করিতেছে কি না বা ঠিক সময়ে তাহা শেষ হইবে কি না, ইহা লইয়া দিক্ হইতে হয় না। আমি অনেক সময়ে ইহাদের কর্ত্তব্যকর্ম্মের জ্ঞান দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি। কি ঝড় কি বৃষ্টি কি তুষারপাত—কোন সময়েই ইংরাজেরা উচিতকর্ম্ম অবহেলা করে না। আবার ইহাঁরা যেমন অধিক কথা কহে না, সেইরূপ কোন কাজে ইহাদের সহিত বেশি কথা কহিয়া সময় নষ্ট করিতে হয় না। ইহারা পাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ নিজ কর্ম্মে রত হয়। ইংরাজেরা গালাগালি বা তিরস্কারকে অতিশয় ঘৃণা করে; এবং কি বড়, কি ছোট কেহই তিরস্কার খাইতে ইচ্ছা করে না বা তিরস্কার পাইবার কাজও করে না।

ইংরাজেরা অতিশয় বিদেশ-ভ্রমণ-প্রিয়। অনেকে অবকাশ পাইলেই নানাদেশ পর্য্যটনে বাহির হয়। ইহারা, ফ্রান্স, জর্ম্মণি, ইটালি, স্পেন, আমেরিকা এবং কখন কখন ভারতবর্ষ ও অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত বেড়াইতে গিয়া থাকে। এইরূপে ইহারা পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের অবস্থা ও লোকের বিষয় সমস্ত অবগত হয়। অনেকে ছুটীর সময় বিদেশে যাইবার জন্য সমস্ত বৎসর টাকা জমাইয়া রাখে এবং বিদেশে গিয়া সকল বিষয় ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য নানা বিষয়ের খবর লয় আর বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করে। এই ভ্রমণে কেবল পুরুষেরা নয়, স্ত্রীলোকেরাও স্বামী, পিতা বা ভ্রাতার সহিত গিয়া থাকে।

এদেশে এমন ভদ্রলোক অতি অল্পই আছেন, যাঁহাদের বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানেরা ইউরোপের অন্যান্য দেশ দর্শন করিতে যায় নাই। ইংরাজেরা বিদেশভ্রমণকে শিক্ষার অংশ বলিয়া ধরে, সেই জন্য অধিক বা অল্প দিনের জন্য মাঝে মাঝে সপরিবারে বিদেশে যাওয়াকে ধনী লোকেরা কর্ত্তব্য কর্ম্মের মত বিবেচনা করেন। নানাদেশ পর্য্যটনে কুসংস্কার সকল দূরীভূত হয়, নূতন নূতন দ্রব্য দর্শনে জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হয়, নব নব ভাবের আবির্ভাবে মন প্রশস্ত হয় এবং অভিনব লোকের সহবাসে অন্তঃকরণ বিকশিত হয়।

ইংরাজেরা বিদেশীয়দের প্রতি স্নেহশীল না হইলেও বিনা কারণে তাহাদের উৎপীড়ন বা কোন অনিষ্ট করিতে অগ্রসর হয় না। কত বিদেশীয় ধর্ম্ম সম্বন্ধে বা অন্য কোন কারণে স্বদেশে উৎপীড়িত হইয়া ইংলণ্ডে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। ইংরাজেরা ঐ লোকদের দেখিতে না পারিলেও উহাদের উপর খড়্গহস্ত নয় বরং সময়ে সময়ে ঐ বিদেশীয়দের প্রতি অতিশয় সদাশয়তাও দেখাইয়া থাকে। এদেশে যেমন ভয়ানক স্বার্থপর লোক আছে, সেই রকম অতি অমায়িক ও সদাশয় ব্যক্তিও দেখিতে পাই। অনেক ধনী লোক সর্ব্বদা পরহিতে রত থাকেন এবং পরের উপকারের জন্য রাশি রাশি অর্থ দান করেন। অনেক ইংরাজ বড়মানুষদের বদান্যতা জগৎপ্রসিদ্ধ; ইঁহারা অহরহঃ নিজ দেশে নানা কারণে প্রভূত অর্থ বিতরণ করেন এবং সময়ে সময়ে অতি দূর দেশেও বিপদকালে দানস্বরূপ প্রচুর অর্থ পাঠাইয়া থাকেন। ইংরাজেরা বিনয়ী না হইলেও রুক্ষ নহে এবং নির্ম্মম হইলেও ইহাদের মনে নীচ প্রবৃত্তি

অতি বিরল। (ইংরাজদিগের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করা অতিশয় কঠিন, কিন্তু একবার মিত্রতা হইলে, ইংরাজবন্ধুর মত বিশ্বাসী, উপকারী ও চিরজীবনস্থায়ী বন্ধু পৃথিবীতে অতি অল্পই দেখা যায়। সুশিক্ষিত ইংরাজদিগের মধ্যে অধিকাংশ অতিশয় ভদ্র, ইহাঁদের সহিত আলাপ করিলে ইংরাজদিগের সমস্ত দোষ বিস্মরণ করিয়া এই জাতির প্রতি ভক্তিভাবের উদয় হয়। ইহাঁরাই ইংলণ্ডের প্রধান আলম্বন এবং ইহাঁরাই ইংলণ্ডের গরিমা ও মাহাত্ম্য বর্দ্ধন করিয়া থাকেন।

---

# অষ্টম অধ্যায়।

## মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও তাঁহার সংসার।

আমাদের ভারতবর্ষের উপর যিনি আধিপত্য করিতেছেন এবং যিনি স্ত্রীলোক হইয়াও পার্লিয়ামেণ্টের সাহায্যে সুনিয়মে ও সুশৃঙ্খলরূপে সমস্ত ইংরাজরাজ্য শাসন করিতেছেন, বোধ হয় তাঁহার বিষয় জানিতে প্রতি ভারতবাসীরই মনে কৌতূহল জন্মিয়া থাকে। মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতের অহিতাকাঙ্ক্ষিণী নহেন, ইনি যথাসাধ্য ভারতবাসীদের সুখস্বচ্ছন্দ ও মঙ্গল সাধন করিতে চেষ্টা করেন; তবে আমরা যে পরাধীন, আজ সমস্ত হিন্দুস্থানের রাজদণ্ড যে হিন্দুর পরিবর্ত্তে ইংরাজদের হাতে—ভারতের রাজমুকুট যে রাণী ভিক্টোরিয়ার শিরে

দীপ্যমান হইতেছে তাহা ইঁহার দোষ নয়। অতএব আমরা পরাধীন হইলেও আমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণীর সাধ্যমত মঙ্গল চেষ্টা করা উচিত।

মহারাণী ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি আঠার বৎসরের সময় রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। মহারাণীর একুশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে জর্ম্মণ রাজপুত্র প্রিন্স আল্‌বার্টের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। ইঁহার বয়স এখন পঁয়ষট্টি বৎসর এবং ইনি সাতচল্লিশ বৎসর রাজত্ব করিতেছেন। এ প্রকার বৃদ্ধ বয়সেও ইনি কেমন দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করেন তাহা শুনিলে যথার্থই আশ্চর্য্য ও আনন্দিত হইতে হয়। ইহাঁর রাজ্যে দোষীর অবিচার বা নির্দোষীর দণ্ড হয় না, এবং ব্যভিচারকে যে সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা ঘৃণাকর ও বিষম পাপ-স্বরূপ মনে করা উচিত তাহা মহারাণী নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্টরূপে দেখাইয়াছেন। ইনি যথার্থ সতী সাধ্বী, ইহাঁর চরিত্রে কখনও কোন প্রকার কলঙ্ক স্পর্শে নাই; দয়া, দাক্ষিণ্যাদি সকল গুণই ইহাঁতে বিরাজমান; স্নেহ, মমতা ইত্যাদি স্ত্রীসহজ গুণে ইনি কাহারও অপেক্ষা ন্যূন নহেন; এবং ইনি এত বৎসর ন্যায়ানুসারে রাজ্য শাসন করিয়া রাজ-কার্য্যে পারদর্শিতার বিলক্ষণ পরিচয় দিতেছেন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে মহারাণীর স্বামী প্রিন্স আলবার্ট পরলোক গমন করেন। মহারাণী তাঁহার শোকে একেবারে পাগলের ন্যায় হইয়াছিলেন; ইনি তাহার পর হইতে অধিক লোকের সহিত মিশিতে বা প্রকাশ্যস্থানে যাইতে ভাল বাসেন না। ইনি অধিকাংশ সময় স্কট্‌লণ্ডের উত্তরে পার্ব্বতীয় দেশে নির্জ্জনে

বাস করিয়া থাকেন। মহারাণীর চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত লণ্ডনে কেনসিংটন গার্ডেনে 'আলবার্ট মেমোরিয়েল' নামক প্রিন্স আলবার্টের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। ইনি নিজে যেমন সচ্চরিত্রা ও সদ্‌গুণান্বিতা, ইহাঁর স্বামীও তদনুরূপ সদ্‌গুণবিশিষ্ট ছিলেন। প্রিন্স আলবার্ট সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পকর্ম্মের অতিশয় আদর করিতেন; ইহাঁর যত্নে ইংলণ্ডে ঐ গুলির অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল এবং ইহাঁর কল্যাণেই এদেশে সর্ব্বজাতীয় মেলা প্রথম খোলা হইয়াছিল।

মহারাণী নিজে যেমন ধর্ম্মশীলা সেইরূপ সকলকেই সৎপথাবলম্বী দেখিতে ইচ্ছা করেন। ইনি নিজের পরিচারক ও পরিচারিকাদের মধ্যে কাহারও চরিত্রে কোন প্রকার সন্দেহ হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে রাজবাটী হইতে তাড়াইয়া দেন, এবং দাসদাসীদের সৎপথে রাখিবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন। শুনিয়াছি রাণীর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স অফ্ ওয়েলস যৌবনাবস্থায় অতিশয় অসৎপথগামী ছিলেন এবং তাঁহার চরিত্রে অনেক কলঙ্কও শুনা গিয়াছিল। রাণী, নিজপুত্র হইলেও এই দোষের জন্য অনেক বৎসর তাঁহার মুখদর্শন করেন নাই; পরে প্রিন্স অফ্ ওয়েলস অত্যন্ত পীড়িত হওয়াতে মাতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে রাণী মাতৃস্নেহের অনুরোধে তাঁহার সহিত আবার দেখা করিয়া কথা কহেন। সেই সময় হইতে যুবরাজ সৎপথে আসিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। মহারাণীর এ দৃষ্টান্ত প্রতি ব্যক্তিরই হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে; সকলেই ইহাঁর অপক্ষপাতী শাসন ও বিচারকে ধন্যবাদ দিয়া থাকে, এবং এমন কোন লোক নাই যে তাঁহার প্রতি প্রসন্ন নহে।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার এখন তিন পুত্র ও চারি কন্যা বর্ত্তমান আছেন। সর্ব্বশুদ্ধ ইহাঁর চারি পুত্র ও পাঁচ কন্যা হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইহাঁর দ্বিতীয় কন্যা প্রিন্সেস্ অ্যালিসের মৃত্যু হয়, সেই কন্যার ও স্বামীর শোকে ইনি অতিশয় ম্রিয়মাণা ছিলেন, আবার অল্পদিন হইল, ইহাঁর কনিষ্ঠ পুত্র প্রিন্স লিওপোল্ড ডিউক অফ্ আল্‌বানীর মৃত্যু হওয়াতে যৎপরোনাস্তি কাতরা হইয়াছেন। মৃত রাজপুত্র অতিশয় পরোপকারী ও অধ্যয়নশীল ছিলেন, তাঁহার জন্য কেবল রাণী নয় সমস্ত ইংলণ্ডবাসীই দুঃখিত হইয়াছে। আবার দুর্ভাগ্যবশতঃ কেবল দুই বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার স্ত্রী ডাচেস্ অফ আল্‌বানী এত অল্প বয়সে বৈধব্যযন্ত্রণায় পীড়িত হওয়াতে সকলেই সেই অনাথিনী বিধবার জন্য শোকান্বিত। মহারাণী এই সকল মর্ম্মভেদী শোকের আঘাত পাইয়াও সহিষ্ণুতা সহকারে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন, ইহাতে সকলেই ইহাঁর সহিষ্ণুতা গুণের প্রশংসা করিয়া থাকে। এরূপ ধনবান দেশের এপ্রকার ধর্ম্মশীলা ও গুণবতী নারী অতি অল্পই দেখা যায়। আশা করি ইহাঁর উদাহরণ প্রতি ভারতমহিলার মনে জাগরূক থাকিবে।

মহারাণী বৎসরের অধিক মাস স্কটলণ্ডের উত্তরভাগে বাল্‌মোরাল কাসলে বাস করেন। ইনি ইংলণ্ডের দক্ষিণে ওয়াইট নামক একটী ক্ষুদ্র দ্বীপে অস্‌বরণ নগরে দুই মাস এবং লণ্ডন হইতে দশ ক্রোশ দূরে উইণ্ড্‌সর নগরে প্রায় তিন মাস অবস্থান করেন। মহারাণী লণ্ডনে থাকিতে একেবারে ভাল বাসেন না, কচিৎ কখন আসিলে বাকিংহাম প্যালেসে বাস

করেন। বিদেশীয় রাজা, রাণী বা রাজপুত্র লণ্ডনে আসিলে যুবরাজ প্রিন্স অফ্ ওয়েল্‌স রাণীর পরিবর্ত্তে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন।

মহারাণীর সংসার যে অতি বৃহৎ তাহা বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারেন। ইহাঁর সংসারে কর্ম্মচারী, পরিচারক, পরিচারিকা ইত্যাদি সকল প্রকার ভৃত্যের সংখ্যা অন্যূন এক হাজার। ইহাদের মধ্যে অনেকের পদ পৈতৃক, এবং প্রায় সকলেই অতি প্রচুর, ও কেহ কেহ অতিরিক্তও বেতন পাইয়া থাকে। সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারীর নাম "লর্ড ষ্টুয়ার্ড"; সমস্ত সংসার ইহাঁর অধীনে, এবং রাণীর কক্ষ, আস্তাবল ও ধর্ম্মমন্দির ভিন্ন রাজবাড়ীর অন্যান্য বিভাগের সমস্ত কর্ম্মচারী ও ভৃত্যেরা লর্ড ষ্টুয়ার্ডের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে পালন করে। রাজবাড়ীর ভৃত্যেরা কোন প্রকার অন্যায় কর্ম্ম করিলে ইনি শাসন করিয়া থাকেন, এবং তাহাদের মধ্যে কোন বিবাদ হইলে ইনিই বিচার করিয়া মিটাইয়া দেন। কিন্তু লর্ড ষ্টুয়ার্ডের যথার্থ কর্ম্মভার আর একজন কর্ম্মচারীর উপর পড়িয়া থাকে। লর্ড ষ্টুয়ার্ড সমস্ত রাজকীয় ক্রিয়াকলাপে রাজসভায় বর্ত্তমান থাকেন। ইহাঁর বেতন মাসে দুই হাজার টাকা।

লর্ড ষ্টুয়ার্ডের পরের কর্ম্মচারীকে "লর্ড ট্রেজরর" বলে; পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মচারীর অনুপস্থিতিতে ইনিই রাজকীয় ক্রিয়া-কলাপে বর্ত্তমান থাকেন। ইহাঁর বেতন মাসে নয় শত টাকা। "কণ্ট্রোলর" নামক আর একজন এই রকম কর্ম্মচারী আছেন, তাঁহাকে বিশেষ কিছুই করিতে হয় না কিন্তু তাঁহারও

বেতন ঐরূপ। "মাষ্টার অফ্ দি হাউস্‌হোল্ড"—অর্থাৎ সংসারের কর্ত্তা—নামক একজন বড় দরের কর্ম্মচারী আছেন, ইহাঁর বেতন মাসে প্রায় বার শত টাকা। ইনিই লর্ড ষ্টুয়ার্ডের যথার্থ প্রতিনিধি, তাঁহার আসল কর্ম্মভার ইহাঁর উপর পড়ে এবং ইনিই রাজবাড়ীর ভৃত্যদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন। ইহাঁর অধীনে আবার অনেকগুলি কর্ম্মচারী ও ভৃত্য আছে, ইহারা সংসারের সমস্ত আয় ব্যয়ের হিসাব রাখে। লর্ড ষ্টুয়ার্ডের বিভাগের উপরি উক্ত চারিজন প্রধান কর্ম্মচারীই মাহারাণীর সহিত এক সঙ্গে বসিয়া আহার করিতে পারেন।

ইহাঁদের পরে রান্নাবাড়ীর কেরাণী, তাঁহার বেতন মাসে সাত শত টাকা। ইহাঁকে সাহায্য করিবার জন্য তিন জন কেরাণী থাকে, তাহারাই সমস্ত হিসাব রাখে, জিনিস ওজন করে ও দোকানদারদের ফরমাস দেয়। রান্নাবাড়ীর সর্ব্বপ্রধান রাঁধুণীর মাহিনাও মাসে সাত শত টাকা; তাঁহার নীচে দশ জন রাঁধুণী আর বার জন রান্নাবাড়ীর চাকর আছে; ইহারাই সমস্ত পাকের কাজ করে। ইহা ব্যতীত মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিবার জন্য পনর জন লোক নিযুক্ত আছে। রাজবাড়ীর সর্ব্বপ্রধান মদের ভাণ্ডাররক্ষক বা "বাটলারের" বেতন মাসে পাঁচ শত টাকা। ইহাঁকে রাজপরিবারের জন্য বাছিয়া মদ কিনিতে ও তাহা দেখিতে শুনিতে, এবং রাণীর নিকট পাত্রে ঢালিয়া পাঠাইতে হয়। ইহাঁর নীচে পাঁচ ছয় জন টেবিল সাজাইবার লোক আছে। মহারাণীর আহারের পূর্ব্বে টেবিলের উপর সমস্ত জিনিস সুচারুরূপে সাজান আছে কি না দেখা শুনা ইহাদের কাজ।

রাণীর বাসনের ভার দশ বার জন লোকের হাতে থাকে; তাহাদের বিশেষ কোন কাজ করিতে হয় না বটে কিন্তু তাহাদের উপর অনেক বহুমূল্য জিনিসের ভার, এই জন্য তাহাদের মাহিনা অধিক হইলেও অতিরিক্ত বলিয়া বোধ হয় না। কেবল "উইণ্ড্‌সর কাসেলে" রাণীর যে সকল সোনা ও রূপার বাসন ইত্যাদি আছে তাহার দাম তিন কোটি টাকার কম নয়। মহারাণীর রাজবাড়ীতে পাথরিয়া কয়লা কিনিয়া রাখিবার নিমিত্ত প্রায় তের জন লোক নিযুক্ত আছে। ইহা ব্যতীত দ্বাররক্ষক, চৌকীদার, আলোকজ্বালক ইত্যাদি বহুসংখ্যক নানা প্রকার ভৃত্য আছে।

রাজসংসারের অপর বিভাগের নাম লর্ড চেম্বারলেনের বিভাগ। লর্ড চেম্বারলেনকে অনেক বড় বড় কাজ করিতে হয়। মহারাণীর নিজ কক্ষের ভৃত্য, পরিচারিকা ও পরিচ্ছদরক্ষকদের পর্য্যবেক্ষণ করা; বিছানা, আসবাব ও তাঁবু সময়মতে স্থানান্তর করা; এবং বাদক, শিকারী, শিল্পকার, দূত, চিকিৎসক, পুরোহিত ইত্যাদির তত্ত্বাবধান করা ইহাঁর প্রধান কর্ম্ম। রাজসিংহাসনে অধিবেশনকালে ও রাজকীয় বিবাহ, ভোজ ইত্যাদি ক্রিয়ার সময় ইহাঁকে সমস্ত দেখিতে শুনিতে হয়। লর্ড চেম্বারলেনও মাসে দুই হাজার টাকা করিয়া বেতন পান। এই বিভাগে মহারাণীর ধনরক্ষক বলিয়া একজন বড় কর্ম্মচারী আছেন, তাঁহারও বেতন মাসে দুই হাজার টাকা। ইনি রাণীর সমস্ত টাকা পয়সার হিসাব রাখেন।

মহারাণীর পরিচ্ছদের তত্ত্বাবধারণের নিমিত্ত এক জন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক আছেন, প্রথমটির মাহিনা মাসে

আট শত টাকা এবং দ্বিতীয়টির পাঁচ শত। ইহা ভিন্ন কেরাণী দূত, শয্যাগৃহের পরিচারিকা ইত্যাদি অনেক ভৃত্য আছে। এই পরিচারিকাদের নীচে অনেকগুলি স্ত্রীলোক থাকে তাহারাই যথার্থ শয্যাগৃহের কাজ করে।

আবার "মাস্থ্যের ঝি" নামে অনেক গুলি পরিচারিকা আছে, মহারাণীর বেশ ভূষা করান ইহাদের প্রধান কাজ। ইহাদের প্রত্যেকের বেতন মাসে তিন শত টাকা।

এই সকল ভিন্ন রাজসংসারে যে আরো কত প্রকার কর্ম্মচারী, ভৃত্য ও পরিচারিকা আছে তাহাদের প্রত্যেকের বিষয় বর্ণনা করা অসম্ভব। মহারাণীর উপাসনা করিবার নিমিত্ত একটী রাজকীয় ধর্ম্মমন্দির আছে। এখানকার পুরোহিত প্রভৃতি কর্ম্মচারীরা মহারাণীর সংসারের মধ্যে পরিগণিত হন। সিংহাসনে অধিবেশন, রাজপুত্র ও কন্যাদের বিবাহ ইত্যাদি সময়ে বাজনা বাজাইবার জন্য এক দল রাজকীয় বাদক আছে, এই দল রাখিতে মাসে এক হাজার নয় শত টাকা খরচ পড়ে। "পয়েট্ লরিয়েট্" নামক একজন রাজবাড়ীর কবি আছেন। যদিও ইহাঁর বেতন রাণীর প্রধান রাঁধুণীর মাহিনার সাত ভাগের এক ভাগও নয়, তথাপি ইহাঁর পদ অতিশয় মাননীয়। বর্ত্তমান রাজকবির নাম লর্ড টেনিসন্; ইনি এখন ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান কবি, অল্পদিন হইল ইহাঁকে লর্ড উপাধি দেওয়া হইয়াছে।

"জন ব্রাউন" নামক মহারাণীর একটি বিশ্বস্ত ভৃত্য ছিল, অল্পদিন হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি মহারাণীর অতিশয় প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন ছিলেন; মহারাণী এমন

স্থানে যাইতেন না যেথানে "জন ব্রাউন" তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন না। রাণী একখানি স্বরচিত পুস্তকে এই ভৃত্যের প্রশংসাপূর্ব্বক অনেকবার উল্লেখ করিয়াছেন এবং এই পুরাণ ও বিশ্বাসী সেবকের মৃত্যুতে মাহারাণী অত্যন্ত শোক পাইয়াছিলেন।

---

# নবম অধ্যায়।

## লণ্ডনে প্রদক্ষিণ।

ভারতবর্ষ হইতে আসিয়া লণ্ডনের রাস্তায় বেড়াইলে প্রথম প্রথম একরকম ধাঁধা লাগে, জড়ভরতের মত দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়; সবই আলাদা রকম—বাড়ী, গাড়ী, লোক, পোষাক কথাবার্ত্তা সকলই একেবারে ভিন্ন। কোন একটা বড় রাস্তায় বেড়ালে দেখিবে যে, দুধারে সারি সারি চারি পাঁচ তোলা উঁচু কাল কাল বাড়ী, কেবল মধ্যে মধ্যে রাস্তা ভিন্ন আর একটুও ফাঁক নাই; যত চল মনে হইবে রস্তা ও বাড়ীর শেষ নাই। বাড়ীর উপর দিকে চাহিলে দেখিতে পাইবে যে, প্রতি গৃহের ছাদের উপর অনেকগুলি ধোঁয়ানল উঠিয়াছে, তাহা হইতে মাঝে মাঝে ধোঁয়া বাহির হইতেছে, ছাদের উপর লোক জন নাই—দুধারে গড়ানে, আর কাল শ্লেট দিয়া ঢাকা। আবার কোথাও দেখিবে যে, বাড়ীর ছাদের উপর দিয়া

কত রকমের তার চলিয়া গিয়াছে—কোনটা বা টেলিগ্রাফের তার, কোনটা বা টেলিফোনের তার।

নীচে চাহিয়া দেখ, দুধারে ঝক্‌ঝকে দোকান মন টানিয়া লইতেছে. দোকানের সম্মুখটা কেবল কাচ দিয়া ঢাকা, এজন্য ভিতরকার সুচারুরূপে সাজান নানাপ্রকার জিনিস দেখা যাইতেছে; উপরে ও নীচে দোকানদারের ও কিসের দোকান তাহার নাম এবং বাড়ীর নম্বর পালিস করা পিতল বা কাঠের উপর বড় বড় অক্ষরে খোদা রহিয়াছে। রাস্তা অতি পরিষ্কার ও শক্ত পাথর দিয়া গাঁথা, আর দুপাশে লোক চলিবার জন্য পাথর বসান চলাপথ, তাহার উপর শত শত লোক—স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা প্রভৃতি সকল অবস্থার ও কখন কখন নানা দেশের লোক একসঙ্গে চলিতেছে। (কথাবার্ত্তা অতি অল্পই শুনা যায়, তার মধ্যে আবার কখন বিদেশীয় ভাষাও কাণে লাগে। রাস্তার উপর কত রকমের গাড়ী যাইতেছে—ব্রুহাম, বারুচ, ফিটেন, ক্যাব, ওম্নিবাস, দোকানদারের গাড়ী ইত্যাদি—সবই আসিতেছে, যাইতেছে, একবারও বিশ্রাম নাই। রাস্তার এপার হইতে ওপারে যাইতে হইলে মহা শঙ্কা, চারিদিক দেখিয়া অতি সাবধানে পার হইতে হয়। এদেশে পাল্কী বা পাল্কীগাড়ী নাই এবং গরুর গাড়ীও নাই, আর রাস্তায় লোকের কথার শব্দ অপেক্ষা গাড়ীচলার শব্দই বেশী। লোকের সাদা সাদা মুখ, আর অধিকাংশেরই কাল পোষাক; সকলেই সাধ্যমত উত্তমরূপে পোষাক করিয়াছে, কাহারও অনাবৃত হাত বা পা দেখিতে পাওয়া যায় না।

আবার অনেক রাস্তায়, যেখানে গাড়ীর শব্দ কম, সেখানে

যত ফিরিওয়ালারা চুপড়ীতে কিম্বা হাতটানা গাড়ীতে করিয়া জিনিস লইয়া ক্রমাগত চীৎকার করিতে করিতে চলিতেছে, তাহাদের আর বিশ্রাম নাই, তাহাদের চীৎকার-ধ্বনিতে যেন আকাশ ফাটিয়া যাইতেছে। তাহারা প্রাতঃকাল আট্টা হইতে আরম্ভ করিয়া বিকাল বেলা পর্য্যন্ত, কখন বা রাত আট নয়টা অবধি রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায়। প্রথমে এখানকার শব্দ কিছুই বুঝা যায় না, বোধ হয় যেন "হট্টগোলের" মধ্যে বেড়াইতেছি; দেখিতেছি এক রকম জিনিস লইয়া যাইতেছে কিন্তু কি বলিয়া চীৎকার করিতেছে তাহার মাতামুণ্ড কিছুই বুঝিতে পারি না।

ক্রমে মাস কতক থাকিবার পর অনেকটা বুঝিতে পারা যায়—কোথাও বা "ম্যাকরেল ম্যাক্‌রেল" বলিয়া ঠেলা গাড়ীতে করিয়া মাছ বেচিতেছে, কোথাও বা "টিনের জিনিস সারাবে" "ছুরী কাঁচি সানাবে" বলিয়া চীৎকার করিতেছে, কেহ বা "কোল্ কোল্" বলিয়া পাথরে কয়লা বেচিতেছে, কোথাও বা "চৌকী ও ছাতা সারাবে" শুনিতে পাইবে, আবার কখন কখন একজন যিহুদী "ওল্ড ক্লোজ্" "ওল্ড ক্লোজ্" বলিয়া পুরাণ কাপড় কিনিতে চাহিতেছে, আবার কোন কোন রাস্তায় সন্ধ্যার সময় "আলু পোড়া, সব গরম" বলিয়া ঠাণ্ডায় লোকের মনে লোভ জন্মাইয়া দিতেছে—এই রকম নানা প্রকার ব্যবসার লোক তাহাদের নিজ নিজ জিনিসের নাম বলিয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছে। আবার দুধওয়ালারা ভোর ছয়টা হইতে বিকাল পাঁচটা পর্য্যন্ত ঠেলাগাড়ী টানিয়া "মিল্ক—মিল্কো কো—কু" বলিয়া প্রতিবাড়ীতে দুধ দিয়া যাইতেছে।

যদিও কখন কখন দুচার জন বলবান্ আয়র্লণ্ডীয় স্ত্রী-লোককে দুধের ভার বহিতে দেখিয়াছি বটে, কিন্তু এখানে আমাদের দেশের মত সচরাচর ভারে বা মাথায় করিয়া কোন জিনিস বহে না। প্রায় সকল দোকানদারেরই ঘোড়ার গাড়ী বা ছোট হাতটানা গাড়ী আছে, তাহাতে করিয়া জিনিস লইয়া যায়। কিন্তু সন্ধ্যার সময় কোন কোন রাস্তায় দেখিবে, একজন লোক মাথায় একটী বাক্স করিয়া ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে যাইতেছে। এ লোকটী চীৎকার করার পরিবর্ত্তে ঘণ্টা বাজাইয়া জানাইতেছে যে, সে মাফিন নামক আমাদের দেশের সিদ্ধ পিঠার মত একরকম দ্রব্য বেচিতেছে। আবার কোথাও বা একটী বৃদ্ধা মাথায় বা কোমরে চুপ্‌ড়ী করিয়া "ওয়াটরক্রিসী, ক্রিসীস্" বলিয়া কাঁচা খাইবার একরকম শাক বেচিতেছে।

উপরি লিখিত শব্দ ভিন্ন লণ্ডনের রাস্তায় আরও অনেক প্রকার শব্দ শুনা যায়, তাহার মধ্যে সংবাদপত্রবিক্রেতা বালক-দের চীৎকার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাণ আকর্ষণ করে। প্রাতঃ-কালে ৭টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত সকল প্রধান রাস্তাতে, বড় বড় মোড়ে ও ষ্টেশনের সম্মুখে "কাগজ কাগজ" বলিয়া চীৎকার করে—"মহাশয় 'ডেলী নিউজ' কি 'ডেলী টেলিগ্রাফ' চাও?" 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড' না 'ক্রনিকেল' কোন্ কাগজ চাই মহাশয়?"—ইত্যাদি বলিয়া লোকের কাছে আসিয়া কাগজ কিনিবার জন্য সাধিতেছে। আবার সন্ধ্যার সময় প্রতি বড় রাস্তায় ও মোড়ে এবং যেখানে অধিক লোকের সমাগম সেইখানেই ছোট ছোট বালকেরা "একো" "গ্লোব" "ষ্ট্যাণ্ডার্ড," "স্পেশিয়াল' ইত্যাদি

বলিয়া চীৎকার করিয়া সন্ধ্যার কাগজ বেচিতেছে। সংবাদ-পত্রেরও অভাব নাই আর পাঠকেরও অভাব নাই, শস্তা বলিয়া সকলেই কিনিতে পারে। প্রায় সকল রাস্তাতেই একরকম বিষাদজনক বাজনা শুনিতে পাইবে, এ বাজনা "অর্গাণ" নামক এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র হইতে বাহির হয়। এ দেশে অনেক গরিব ইটালীয় আসিয়া এক এক অর্গাণ লইয়া রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায়, ঐ অর্গাণের বাজনা ভাল বোধ করিয়া কেহ কেহ দু এক পেনী দেয়; কেহ বা তাহাদের দুরবস্থা দেখিয়াই কিছু দান করে, এবং কখন কখন তাহারা নিজের টুপী ছুঁইয়া বা কোন রকম ভঙ্গীর দ্বারা লোকের নিকট পয়সা চায়। এদেশে ভিক্ষা করিবার আইন নাই, সেজন্য ভিখারীরা এক রকম ছল করিয়া পয়সা চাহিয়া থাকে। বড় রাস্তার শব্দ হইতে নিস্তার পাইবার জন্য কোন ছোট রাস্তায় গেলে দেখিবে যে, সেখানেও এই গরিব ইটালীয় অর্গাণ ঘুরাইয়া উহার ঘ্যাং ঘ্যাং শব্দে কাণ ঝালাপালা করিতেছে।

লণ্ডনে এত দোকান আছে আর সেগুলিকে এমন চমৎকার করিয়া সাজাইয়া রাখে যে, প্রথমে দোকান দেখিয়া তাক্ হইয়া যাইতে হয়। অনেকে লণ্ডনকে "দোকানের বন" বলিয়া বর্ণনা করে, এখন দেখিতেছি সে নাম বড় মিথ্যা নয়। এমন জিনিস নাই যে, এই মহানগরে পাওয়া যায় না; যে রকম দামের যে দ্রব্য চাহিবে তাহাই লণ্ডনে পাইবে, কেবল টাকা পয়সার আবশ্যক। এমন কি এখানে আঁব পর্য্যন্ত দেখিয়াছি, ইহারা আমেরিকা হইতে আঁব আনে; আমাদের দেশে যেগুলির দাম আধ পয়সা, এখানে সেগুলি দশ বার আনা

করিয়া বিক্রী হয়, যাহা হউক এখানে পাওয়া যায় এই আশ্চর্য্য। ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে নারিকেল পাওয়া দুষ্কর, কিন্তু এখানে প্রায় সকল ফলের দোকানেই রাশি রাশি ঝুনা নারিকেল দেখিতে পাই। পোষাক বল, গহনা বল, খেলানা বল, এত নানা প্রকারের ও নানা দামের দ্রব্য পৃথিবীর আর কোথাও দেখিতে পাইবে না। এখানে আমাদের দেশের মত বাজার নাই কিন্তু প্রত্যেক পাড়াতেই সকল প্রকার জিনিসের দোকান আছে, যখন যাহা ইচ্ছা কিনিতে পার।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লণ্ডনের যে ভাগকে "সিটী" বলে তাহা বড় বড় দোকানে পরিপূর্ণ; তাহা ব্যতীত লণ্ডনের বড় বড় রাস্তার মধ্যে অক্সফোর্ড ষ্ট্রীট, রিজেণ্টস্ ষ্ট্রীট, ষ্ট্র্যাণ্ড প্রভৃতি কয়েকটী রাজপথ অতিশয় ঐশ্বর্য্যময় ও প্রসিদ্ধ এবং বহুমূল্য দ্রব্যে সজ্জিত আপণশ্রেণীতে পূর্ণ। লণ্ডনে অনেক লম্বা লম্বা রাস্তা আছে, কিন্তু অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটের মত কোন রাস্তা অত বড় ও চমৎকার নয়। রিজেণ্টস্ ষ্ট্রীটের গড়ন অতি সুন্দর এবং দোকানগুলি অধিক চকচকে বটে, কিন্তু অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটে নানা রকমের দোকান এবং দোকানগুলিতে বেশী কাজের জিনিস আছে। আর এই রাস্তা অতি পুরাণ বলিয়া ইহাতে আধুনিক ও পুরাতন দুই প্রকারেরই বাড়ী আছে। অক্সফোর্ড ষ্ট্রীট্ এত বৃহৎ হইলেও এখানে স্থানের সচ্ছলতা নাই, এক একটী বাড়ীর ভাড়া মাসে দেড় শত বা দুই শত টাকা, আর একটী বাড়ীও খালি থাকিতে পায় না।

রাস্তার চলাপথের পাশ হইতে উঠিয়াই চার পাঁচ তোলা,

কোথাও বা ছয় সাত তোলা উঁচু হইয়া বাড়ী দাঁড়াইয়াছে, প্রতি বাড়ীতেই দোকান, দোকানের উপরের ঘরগুলি জিনিসে পোরা। কেবল অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটের এক সীমা হইতে আর এক সীমা পর্য্যন্ত চলিয়া গেলেই ইংলণ্ডের অর্থ ও ঐশ্বর্য্যের পরিমাণ অনেকটা বুঝা যায়। ইহাতে সকল প্রকারেরই দোকান আছে—গহনা, পোষাক, বাড়ীর আসবাব, কাঁচের বাসন, পুস্তক, আহার্য্য দ্রব্য ইত্যাদি—মানুষের যাহা আবশ্যক সকলই পাওয়া যায়; তাহার মধ্যে আবার সর্ব্বনেশে মদের দোকান মাঝে মাঝে দাঁড়াইয়া সকলের উপর টেক্কা দিতেছে। ঐ দেখ ধনী লোকের স্ত্রীরা ঘরের গাড়ী করিয়া ও বহুমূল্য পোষাক পরিয়া আসিয়া গহনার দোকানে প্রবেশিল; অমনি চার পাঁচটী দোকানের কার্য্যকারী তরুণবয়স্ক স্ত্রীলোক "কি চাই মেম" "কি চাই মেম" বলিয়া আগ্রহের সহিত মনোনীত জিনিস দেখাইতে লাগিল; কিছুক্ষণ পরে ধনী স্ত্রী দোকান হইতে বাহির হইল এবং গাড়ীতে উঠিয়া চলিল। ছোট ছোট বালক বালিকারা তাহার উত্তম গাড়ী ঘোড়া, সুসজ্জিত কোচম্যান ও চাকর দেখিয়া অবাক হইয়া রহিল। আবার দেখ কোন কোন স্থানে ছিন্নবস্ত্রপরিহিত, শ্রমক্লান্ত মজুরেরা কাজ শেষ করিয়া এখন মদের দোকানে যাইতেছে; অনেকে ভিতরে বসিয়া পান করিতেছে, অনেকে পান শেষ করিয়া বাহিরে আসিতেছে, তাহাদের দেখিলে দুঃখ হয়।

চলাপথের উপর যে কত রকমের কত লোক চলিতেছে তাহার আর শেষ নাই; আমাদের দেশে পূজা বা কোন মেলার সময় যেরূপ ভিড় হয়, এখানে প্রত্যহ তত লোক

যাওয়া আসা করে। লোকে চলিতেছে—থামিতেছে—আবার চলিতেছে; কেহ বা দোকানের সম্মুখে কাঁচের কাছে দাঁড়াইয়া ভিতরের কোন্ জিনিসটী কিনিবে তাহা ঠিক্ করিতেছে, কেহ বা বন্ধুর সহিত গল্প করিতেছে, কেহ বা অন্যের পোষাক দেখিতেছে, কেহবা হাঁ করিয়া লোক দেখিতেছে। মধ্যে মধ্যে পাহারাওয়ালা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; তাহারা কখন বা ভিড় থামাইতেছে, কখন বা চৌমাথার কাছে গাড়ীগুলাকে থামাইয়া লোকদের পার হইবার সুবিধা করিয়া দিতেছে। অনেক লোক দোকান হইতে বাহিরে আসিতেছে অনেকে ভিতরে যাইতেছে। দোকানগুলি এত রকমের নূতন নূতন দ্রব্যে এমন চমৎকার করিয়া সাজান যে, কোন্ দোকানটী দেখিব তাহা ঠিক্ পাই না; আবার দোকানগুলা এত লোভ-জনক যে, হাতে পয়সা থাকিলে তাহা আবার বাড়ী ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া বড় শক্ত কথা।

ঐরূপ নানা দ্রব্যের দোকান ও লোক দেখিতে দেখিতে কতকদূর গিয়া দেখিবে, কতকগুলি বাড়ী অতিশয় পুরাণ হওয়াতে তাহাদের ভাঙ্গিয়া আবার বড় বড় নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ করিতেছে। আমাদের দেশে যেমন রাজমজুরদের মধ্যে মুসলমান স্ত্রীলোকেরা কাজ করে, এখানে স্ত্রীলোকেরা সেরূপ ভারী ও বিপদজনক কাজ করে না। সকলেই তরুণবয়স্ক যুবক এবং মৌমাছির মত ব্যস্ত হইয়া কর্ম্ম করিতেছে। চারিদিকে ভারা বাঁধা, আমাদের দেশের মত বাঁশের ভাঁরা নয়, বড় বড় কাঠের খুঁটী ও তক্তা দিয়া শক্ত করিয়া ভারা বাঁধা। এই ভারা দেখিলে মনে হয়, ভারতবর্ষের বাঁশের ভারার উপর ইহাদের

উঠিতে বলিলে, ইহারা হয়ত হাসিয়া উড়াইয়া দিবে এবং বলিবে, "আমাদের জীবন এত শস্তা নয় যে, নির্ব্বোধের ন্যায় ঐ পল্কা ভারার উপর উঠিয়া প্রাণ হারাইব"। কিন্তু তথাপি ঐ বাঁশের ভারার উপর উঠিয়াই শত শত দরিদ্র ভারতবর্ষীয়েরা অতি কৌশল ও ধৈর্য্যের সহিত ভারতের বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা সকল নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। যেখানে টাকা সেইখানে আরামের ইচ্ছা, এবং যেখানে আরামের ইচ্ছা সেইখানেই বাবুয়ানা; সুতরাং ইংলণ্ড ধনী বলিয়াই ইংলণ্ড-বাসীরা সকল বিষয়ে নিজেদের সুখ ও আরাম অন্বেষণ করে।

যেখানে ঐ সকল নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ করিতেছে তাহার নিকট লোকের যাতায়াত বন্ধ করিবার নিমিত্ত এবং পথিকদের কোন বিপদ না ঘটে এই জন্য সম্মুখটা তক্তা দিয়াই ঘেরা আছে। দূর হইতে ঐ তক্তার দেয়ালের দিকে চাহিলে মনে হইবে উহা একটী ছবির বাড়ীর দেওয়াল—নানা প্রকার ও নানা রঙের চিত্র আঁকা রহিয়াছে, কিন্তু যত নিকটে যাইবে তত দেখিতে পাইবে যে, উহা শত শত বিজ্ঞাপনের কাগজে আচ্ছাদিত। ঐ দেখ কোথায় নাটক হইবে, সেই নাটকের নায়ক নায়িকার চিত্র; আবার কোন "মিউজিক হল" অর্থাৎ গানবাড়ীর বিজ্ঞাপনে আমাদের দেশের "ভুলুয়ার" মত সঙের ছবি; কেহ বা চুল কাল ও বড় হইবার জন্য একটী ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছে, সে, তাহার বিজ্ঞাপনের ভিতর ঔষধের কত গুণ দেখাইবার জন্য, একটী মুক্তকেশী স্ত্রীকে বসাইয়া দিয়াছে। অনেক প্রকার নূতন মদ প্রস্তুত হইয়াছে, সেগুলি বোতল শুদ্ধ ইহাতে চিত্রিত আছে; আবার যে সকল নূতন

পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের নাম এত বড় বড় অক্ষরে ছাপাইয়াছে যে, প্রত্যেক অক্ষরটার ভিতর দিয়া এক একটী মানুষ গলিয়া যাইতে পারে।

ঐরূপ যে কত ছবি ও কত বিজ্ঞাপন আছে তাহার সংখ্যা নাই, এবং কেহ পড়ে কি না তাহাও জানি না; মারা রহিয়াছে এইমাত্র বলিতে পারি। লাভ হউক বা না হউক নিজেদের নাম রক্ষা করিবার নিমিত্ত ইহারা বিজ্ঞাপন দেয়। কোথাও কোথাও ঐরূপ বিজ্ঞাপনের সারি কতদূর চলিয়া গিয়াছে যে, সব দেখিতে গেলে চোক খরে যায়। ইংরাজেরা বিজ্ঞাপন করিবার জন্য একেবারে পাগল; এমন স্থান নাই যে সেখানে বিজ্ঞাপন দেখিতে পাই না; রাস্তায়, ষ্টেশনে, বাড়ীর দেয়ালে, গাড়ীর ভিতর ও বাহিরে——সর্ব্বত্রই বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি; আবার মাঝে মাঝে দেখিতে পাই, মানুষের পিঠেও কাঠে বাঁধা বিজ্ঞাপন ঝুলে। 'ওম্নিবাস' ও ট্র্যামে উঠিয়া দেখিতে পাইবে, "অমুকের স্নুণ বড় চমৎকার" "অমুকের দিয়াশলাই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল"। রেলওয়েষ্টেশনের সমস্ত দেয়ালে বিজ্ঞাপন মারা; কোন্‌টা ষ্টেশনের নাম, আর কোনটা বিজ্ঞাপনের নাম, তাহা ঠিক্ করিতে পারিবে না। কোন একটা ষ্টেশনে গাড়ী থামিল, পরে অনেকক্ষণ ঠাওরে ঠাওরে দেখিয়া হয় ত মনে মনে ভাবিবে যে, ষ্টেশনের নাম জানিয়াছ; তখন একজনকে জিজ্ঞাসা করিলে—"এই ষ্টেশনের নাম অমুকের সরিষা—নয়?" সে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, তার পর তোমার জ্ঞান হইল যে, সরিষার বিজ্ঞাপনকে ষ্টেশনের নাম মনে করিয়াছিলে। এখানকার

অধিকাংশ সংবাদপত্র বিজ্ঞাপনের জন্য ধনী। যে কাগজ খানি হাতে করিবে, দেখিবে, ভাল হউক, মন্দ হউক তাহার অর্দ্ধেক কিম্বা বেশীর ভাগ বিজ্ঞাপনে পরিপূর্ণ। কোন নূতন পুস্তক বাহির হইলে তাহাতে অন্ততঃ কুড়ি পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন থাকে। এদেশে বিজ্ঞাপন দিতে আমাদের দেশের অপেক্ষা অধিক খরচ পড়ে কিন্তু তবুও বিজ্ঞাপনের ত্রুটি নাই। এখান-কার বড় বড় কোম্পানী ও দোকানদারেরা বিজ্ঞাপনের খরচকে একটি আবশ্যক ব্যয়ের মধ্যে গণনা করে। অধিক কি বলিব এদেশে বিজ্ঞাপনের বাড়াবাড়ি দেখিয়া প্রথম ইংরাজ-দিগকে নির্ব্বোধ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ইহারা টাকার বিষয়ে কখন বোকা নয়; অল্প অর্থ ব্যয় করিয়া বেশী ঘরে আনিবার জন্যই ইহারা এরূপ যেখানে সেখানে যত পারে বিজ্ঞাপনে পূর্ণ করে। শুনিয়াছি অনেক কোম্পানী বৎসরে এক লক্ষ টাকা বিজ্ঞাপনে ব্যয় করে, এবং অনেক সময়ে কেবল বিজ্ঞা-পনের দ্বারাই অতি সামান্য জিনিস বেচিয়া প্রচুর অর্থ লাভ করে।

অক্সফোর্ড ষ্ট্রীট্ দিয়া 'হাইড পার্কে' যাইতে হয়; এই বাগানটী লণ্ডনের পশ্চিমদিকে স্থিত। যদিও ইহাকে বাঙ্গালায় বাগান বলিতেছি বটে কিন্তু ইহাতে কোন ফলের গাছ নাই এবং ফুলের গাছও খুব কম আছে; ইহাতে অতি পরিষ্কার ঘাসযুক্ত মাঠ ও মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ আছে। ইহা রিজেণ্টস্ পার্ক অপেক্ষা ছোট, কিন্তু ইহার দক্ষিণ পশ্চিমে যে 'কেন্‌সিংটন গার্ডেন' নামক একটী ফুলবাগান আছে সেটী লইয়া রিজেণ্ট্স্ পার্ক অপেক্ষা অনেক বৃহৎ। এইটী লণ্ডনের

কেবল ধনী লোকদের জন্যই নির্ম্মিত বোধ হয়। যদিও এখানে দরিদ্রদের আসিবার কোন বাধা নাই তথাপি ইহার চারিদিকে ধনীলোকেরা বাস করে আর বেশীর ভাগ ভদ্র ও ধনীরাই এই পার্কের ভিতর যায়, এবং ইহা অতি পরিপাটী-রূপে রক্ষিত, এই নিমিত্ত এই বাগানে দরিদ্রতার কোন চিহ্ন দেখা যায় না। হাইড পার্কের মধ্যে একটী বড় ঝিল আছে, তাহার উপর অনেক স্ত্রী ও পুরুষ গ্রীষ্মকালে নৌকা বাহে। বড়মানুষেরা এই বাগানে গাড়ী করিয়া হাওয়া খায়, আর অনেক স্ত্রী ও পুরুষে ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়ায়। স্ত্রী পুরুষ সকলেই স্বাধীনভাবে একসঙ্গে বেড়াইতেছে, নৌকা বাহিতেছে, ঘোড়ায় চড়িতেছে, দেখিয়া আমার মনে যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদ হয় তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু এ দৃশ্য আমাদের দেশে দেখিতে পাই না এই মনে করিয়া আবার বড় কষ্ট হয়।

লণ্ডনে বসন্তকালের শেষ হইতে গ্রীষ্মকালের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোকের সমাগম হয়; এই সময়ে যত ধনীরা লণ্ডনে থাকে, যুবরাজ হইতে আরম্ভ করিয়া যত লর্ড আছে সকলেই প্রায় একালে লণ্ডনে বাস করে। পার্লিয়ামেণ্ট সভার এই সময়ে অধিবেশন হয় এবং দেশ বিদেশ হইতে অনেক লোক লণ্ডনের সুখ ভোগ করিতে আসে, সুতরাং এই কয় মাস লণ্ডন অতিশয় জম্ জম্ করে। এই সময়ে হাইড পার্কে বেড়াইলে ইংরাজদের ধন ও ঐশ্বর্য্যের বিষয় জানা যায়। আমাদের দেশের কেহ যদি ইংলণ্ডে আসেন, তিনি যেন হাইড পার্কের "রট্‌ন রো" না দেখিয়া দেশে ফিরিয়া

না যান, এরূপ দৃশ্য আর কোথাও দেখিতে পাইবেন না।

হাইড্ পার্কের এক ভাগে একটী স্থান আছে. সেখানে লোকেরা ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়ায় এবং ঐ জায়গাকে অতি যত্ন করিয়া রাখে, এই স্থানকেই "রট্‌ন রো" বলে। গ্রীষ্মকালে এক দিন বেলা দুই প্রহর হইতে দুইটার মধ্যে ঐ খানে বেড়াইতে গেলে দেখিতে পাইবে, শত শত স্ত্রী ও পুরুষ ঘোড়ায় প্রাতঃকালিক ব্যায়াম করিতেছে; স্ত্রীলোকের ভাগ পুরুষের চেয়ে বেশী। এত লোক যে, দেখিয়া বোধ হয় যেন সমস্ত লণ্ডনের ধনীলোকেরা সেখানে গিয়াছে। ধূম্রময় লণ্ডনের বৃক্ষগুলি সচরাচর নয়নের অপ্রীতিকর হইলেও উহারাই এখন সবুজবর্ণ পত্রাবরণে সজ্জিত হইয়া এই জুলাই মাসের প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণে তাপিত লোকদের ছায়া দান করিয়া তাহাদের ক্লেশ দূর করিতেছে। চলাপথের একদিক লোহার রেল দিয়া ঘেরা, আর অন্যদিক মনোহর ফুলের কেয়ারি ও সবুজবর্ণ লতা পাতাদির দ্বারা সুশোভিত। বিবিধ প্রকার পুষ্প প্রস্ফুটিত রহিয়াছে এবং মন্দ মন্দ বায়ু বহিয়া উহাদের গন্ধ হরিয়া চারিদিকে ঐ সকল ফুলের গৌরব বিস্তারিতেছে; কখন বা গোলাপের সুগন্ধ ঘ্রাণ করিতেছ, আবার কখন বা কোন ইংলণ্ডীয় পুষ্পের উগ্র সৌরভ সমীরণ দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া তোমার নসারন্ধ্রে প্রবেশ করিবে। এদিকে সম্মুখে বিবিধ বর্ণের ফুলের মনোহারী কেয়ারি বিস্তৃত রহিয়াছে; দেখিয়া স্বভাবের সৌন্দর্য্যের কি উদ্যানপালকের কৌশলের, কাহার অধিক প্রশংসা করিবে,

তাহা ঠিক্ করিতে পারিবে না। প্রায় দশ সহস্র স্ত্রীলোক ও পুরুষ পাশে দাঁড়াইয়া পুষ্প ও লতাদির শোভা নিরীক্ষণ করিতেছে আর সম্মুখে নানা প্রকার অশ্বারোহী নানা বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া যাইতেছে। ইহা নাট্যশালার দৃশ্যস্বরূপ অনুপম ও অনির্ব্বচনীয়।

ইহাদের মধ্যে প্রায় সকল প্রকার জাতিরই লোক দেখিতে পাইবে। পৃথিবীতে এমন কোন সভ্যদেশে নাই, যাহার রাজদূত ইহাদের মধ্যে নাই—ফরাসী, ইটালীয়, গ্রীক, স্পেনীয়, জর্ম্মণ ইত্যাদি সকলেই সুন্দর অশ্বের উপর আরূঢ় হইয়া যাইতেছে, আবার কথন কথন হিন্দু ও জাপানীয় যুবকও দেখিবে। পার্লিয়ামেণ্ট সভার সভ্য, বড় বড় ব্যবসায়ী, বিলাসী—সকলেই দলবদ্ধ হইয়া এই স্থানে বেড়াইতেছে। এখানে আবার সকল প্রকার অবস্থা, পদ ও বয়সের মহিলাদের দেখিতে পাইবে; দুচারজন উচ্চশিক্ষিত ও বি, এ উপাধিধারী স্ত্রীলোকও দেখিবে, আবার দু এক জন মূর্খ স্ত্রীলোকও দেখিবে; অতি অসামান্য রূপবতীদেরও পাইবে এবং অতিশয় মনোহর বেশভূষায় ভূষিত কুরূপাদেরও পাইবে; সতী সাধ্বীদের পাইবে আবার দুএকজন অসচ্চরিত্রাকেও দেখিতে পাইবে। এখানে যেরূপ বিচিত্র বেশভূষা দর্শন করিবে, এরূপ আর পৃথিবীর কোথাও নাই। ঐ সকল পরিচ্ছদে যে কত টাকা কত কৌশল ও কত প্রকার সামগ্রী লাগিয়াছে তাহা বলা দুষ্কর। অশ্বারোহী স্ত্রীপুরুষেরা কথন বা দ্রুত পদে যাইতেছে, কথন বা কদমে কদমে যাইতেছে, কথন বা বন্ধুদের সহিত দেখা হওয়াতে গল্প করিতে করিতে যাইতে লাগিল।

এইরূপে বেলা প্রায় দুইটা পর্য্যন্ত বেড়াইয়া সকলেই নিজ নিজ গৃহে চলিয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি হাইড পার্কের পাশে "কেনসিংটন্ গার্ডেন্" নামক আর একটী বাগান আছে, এটী হাইড পার্কের সহিত এক বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু হাইড পার্কে যেমন বেশীর ভাগ মাঠ, কেনসিংটন গার্ডেনে তাহার পরিবর্ত্তে অতি বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ আছে। বিশেষ গ্রীষ্মকালে এই বাগানটী অতিশয় মনোহর রূপ ধারণ করে; যে দিকে চাও লতা, পাতা ও বিচিত্র পুষ্পরাজি দ্বারা পরিপূর্ণ, আর মাঝে মাঝে কুঞ্জবনের ন্যায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষাবৃত শীতল ও রমণীয় স্থান; সম্মুখে একটী গোলাকার পুষ্করিণী দেখিবামাত্র আমাদের দেশের উত্তম ও আনন্দদায়ক উদ্যানগুলিকে স্মরণ হয়। কিন্তু প্রভেদ এই, ভারতবর্ষে ফলের গাছশূন্য বাগান প্রায় দেখা যায় না, আর এদেশের সকল বাগানেই ঘাস, ফুল, ফুলের কেয়ারি, বড় বড় গাছ ইত্যাদি আছে কিন্তু ফলের গাছের নামমাত্রও নাই।

এই কেনসিংটন গার্ডেনের ভিতর মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পরলোকগত স্বামী প্রিন্স আলবার্টের স্মরণার্থ আলবার্ট মেমোরিয়েল নামক তাঁহার একটী প্রকাণ্ড প্রতিমূর্ত্তি আছে। ইহা লণ্ডনের একটী প্রধান দৃশ্য। উত্তমরূপে চিত্রিত ও অলঙ্কৃত পাথরনির্ম্মিত চাঁদোয়ার ভিতর প্রিন্স আলবার্টের ধাতুনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি; তার চারিপাশে ইউরোপের যত বড় বড় কবি, গায়ক, খোদক, পণ্ডিত, বিজ্ঞানবিৎ প্রভৃতি বিখ্যাত বিখ্যাত লোকদের বহুসংখ্যক প্রতিকৃতি, চাঁদোয়ার দেয়ালের গায়ে খোদিত রহিয়াছে; আর চারি কোণে আসিয়া, ইউরোপ,

আফ্রিকা ও আমেরিকা সূচক চারিটী পাথরের নির্ম্মিত প্রকাণ্ড প্রতিমূর্ত্তি আছে। একটীতে একজন ভারতীয় বেশে সজ্জিত স্ত্রীলোক হাতীর উপর বসিয়া ঘোমটা টানিতেছে, আর তাহার দুপাশে চীন ও মুসলমান দাঁড়াইয়া আছে—এইটী আসিয়াকে জানাইয়া দিতেছে। ঐরূপ ইউরোপের প্রতিমূর্ত্তিতে একজন ইউরোপীয় ঘোড়ার উপর চড়িয়া আছে; আফ্রিকারটীতে একজন নিগ্রো উটের উপর এবং আমেরিকারটীতে একজন আমেরিকান গরুর উপর বসিয়া আছে। এই চারিটী প্রতিমূর্ত্তি দেখিলে, পূর্ব্বে কোন্ মহাদেশের লোকেরা কিরূপ পোষাক পরিত তাহা জানা যায়; আসিয়া ও আফ্রিকার পোষাক যেমন ছিল সেইরূপই আছে, কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকার পোষাক কত বদলাইয়াছে। পূর্ব্বে ইউরোপীয়েরা মাথায় পাগড়ী বাঁধিত, কাঠের জুতা পায়ে দিত এবং আমাদের মত কাপড় পরিত, কিন্তু আজ ইহাদের কত পরিবর্ত্তন। পরিচ্ছদের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহাও দেখ।

চাঁদোয়ার দেয়ালের গায়ে অনেক বিখ্যাত ইউরোপীয় লোকের প্রতিকৃতি দেখিয়া মনে অতিশয় আনন্দের উদয় হয়। ক্ষণকালের নিমিত্ত সমস্ত ভুলিয়া গিয়া "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" এই কথাটী মনে করিয়া তাঁহাদের কীর্ত্তি ভাবিতে থাকি। কত দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে, তথাপি তাঁহাদের নাম সমস্ত সুশিক্ষিত ও সভ্য লোকদের মনে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। ঐ দেখ, সেক্সপিয়র পুস্তক হাতে করিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন; আবার দেখ অন্ধ

হোমর বীণা হাতে করিয়া গান গাহিতে উদ্যত; এইরূপ যিনি যে বিদ্যা বা গুণের জন্য বিখ্যাত ছিলেন, তাঁহার হাতে কিম্বা শরীরে তাহার চিহ্ন আছে; দেখিলে প্রতিকৃতি-গুলিকে জীবন্ত বলিয়া বোধ হয়।

(লণ্ডনে অনেক আশ্চর্য্য দৃশ্য আছে, কিন্তু আমাদের কাছে মাটির নীচের লণ্ডন অতি অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়। উপরে এক লণ্ডন দেখিতেছ, আবার রাস্তার নীচে আর এক লণ্ডন বসিতেছে, চলিতেছে, খাইতেছে, শুইতেছে ইত্যাদি। এ নগরটী এত প্রকাণ্ড আর এখানে এত রাশি রাশি বাড়ী তথাপি এখানে মাটির নীচে ঘর আছে, ইহা শুনিয়া আমাদের দেশের লোক আশ্চর্য্য হইবেন ও ভাবিবেন, ঐ ঘরগুলি অতি অন্ধকার ও ভয়ঙ্কর; তাহা বিচিত্র নহে। এখানে রাস্তার দুধারে বাড়ীর এক এক তোলা করিরা মাটির নীচে থাকে; ঐ নীচেকার ঘরগুলি অধিকাংশ কেবল রান্নাঘর, ধোবার ঘর ও কয়লার ঘরের জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রতি বাড়ীতেই রান্না, কাপড়ধোয়া প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত অপরিষ্কার কাজ নীচে করিয়া থাকে, এবং কয়লা, খাবার দ্রব্য ইত্যাদি সব জিনিস নীচের তোলায় রাখে। দরিদ্র লোকেরা ঐ সকল ঘরে শুইয়াও থাকে। সম্মুখে কতকটা স্থান খোলা ও জানালা থাকার দরুণ ঐ সকল ঘরের ভিতরে আলো ও বাতাসও যায়। যাহা হউক, এদেশের এরূপ ঘরও আমাদের দেশের অনেক মাটির উপরের রান্নাঘর অপেক্ষা পরিষ্কার।

(লণ্ডনে একটা 'আণ্ডর গ্রাউণ্ড রেলওয়ে' অর্থাৎ মাটির নীচের কলের গাড়ী আছে; উহা ক্রমাগত রাস্তার নীচে,

অনেক স্থানে বাড়ীর নীচে, কেবল মাটীর ভিতর দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া লণ্ডন প্রদক্ষিণ করে। এরূপ আশ্চর্য্য রেলওয়ে আর কোন দেশে নাই। ইংলণ্ডে আসিবার সময় অনেক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া কলের গাড়ী করিয়া আসিয়াছিলাম বটে, কিন্তু সহরের ভিতরে পোকার মত এরূপ অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়ান আমার নিকট অতি নূতন বলিয়া বোধ হইয়াছিল। এ গাড়ীতে চড়িতে কোন সুখ বা আমোদ নাই; ক্রমাগত সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া যাইতে হয়, সব অন্ধকার—কেবল মধ্যে মধ্যে অতি অল্পপরিসর আকাশ দেখা যায়, আর ষ্টেশনগুলিতে মিট্ মিট্ করিয়া আলো জ্বলে। ধোঁয়া বাহির হইবার ও বাতাস খেলিবার জন্য ইহারা অনেক উপায় করিয়াছে বটে, কিন্তু তবুও অল্পক্ষণ এই গাড়ীতে চড়িলে, ধোঁয়ার গন্ধ নাকের ও মুখের ভিতর প্রবেশিয়া প্রাণ ওষ্ঠাগত করিয়া তুলে। কিন্তু ক্রমে সবই অভ্যাস হইয়া যায়। সহস্র সহস্র লোক এই কলের গাড়ী দিয়া, লণ্ডনের ভিতরে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাওয়া আসা করে। এই নগরের এক দিক হইতে অন্যদিকে যাইতে হইলে ঘোড়ার গাড়ী অপেক্ষা, এই মাটির নীচের কলের গাড়ী করিয়া গেলে, অনেক শীঘ্র ও শস্তায় যাওয়া যায়। মাটীর নীচে ষ্টেশন, সে জন্য সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গিয়া কলের গাড়িতে উঠিতে হয়। ষ্টেশনগুলি অতি কাছা কাছি—এক ক্রোশের মধ্যে দুই তিনটি। উপর দিয়া কত লোক জন, গাড়ী ঘোড়া ইত্যাদি চলিতেছে, আবার নীচে দিয়া অন্ধকারে কলের গাড়ী চলিতেছে, ইহা ভাবিলে প্রথমে আমাদের মনে ধাঁধা লাগে, কিন্তু এখানে স্ত্রী,

পুরুষ, বালক, বালিকা সকলেই ইহা দ্বারা নির্ভয়ে যাতায়াত করে।

ঐ আণ্ডর গ্রাউণ্ড রেলওয়ে ব্যতীত লণ্ডনের সমস্ত রাস্তার নীচে গ্যাসের নল, জলের নল, ড্রেণ, নর্দ্দামা, ইত্যাদি এত প্রকার নল বসান আছে যে, লণ্ডনকে সম্পূর্ণ ফাঁপা বলিলেই হয়; অনেক সময় রাস্তায় বেড়াইবার কালে বোধ হয় যেন পোলের উপর দিয়া চলিতেছি।

টেম্‌স নদীর নীচের সুড়ঙ্গের কথা বোধ হয় অনেকেই শুনিয়াছেন, ইহা মাটির নীচের রেলওয়ে অপেক্ষাও অদ্ভুত। পূর্ব্বে ইহার ভিতর দিয়া লোক চলিত, এখন কলের গাড়ী চলে। বাল্যকালে পড়িয়াছিলাম,—

"উপরে জাহাজ চলে নীচে চলে নর,
অপরূপ আর কিবা আছে এর পর"।

এখন সত্য সত্যই সেই আশ্চর্য্য জিনিস দেখিতে পাইতেছি। নদীর তলা দিয়া কলের গাড়ী যাইতেছে, নদীর উপরে কত প্রকার জাহাজ ও নৌকা ইত্যাদি ভাসিতেছে, আবার নদীর পোলের উপর দিয়া কত লোক, গাড়ী ও কলের গাড়ী চলিতেছে; ইহা বাস্তবিকই আমাদের কাছে অতিশয় অপরূপ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ইউরোপীয়েরা বিজ্ঞান, কৌশল ও পরিশ্রমের দ্বারা কি না করিতেছে? সর আইসম্বার্ট ব্রুনেল এই সুড়ঙ্গের নির্ম্মাতা। একদিন কোন একটি জাহাজের উপর একটা সামান্য পোকা, তাহার মাথার স্বাভাবিক অস্ত্রের দ্বারা খোবরাইয়া খোবরাইয়া কাঠের ভিতরে যাইবার জন্য, একটু একটু করিয়া পথ নির্ম্মাইতেছিল; তিনি তাহা দেখিয়া

ভাবিলেন যে, বড় বড় অস্ত্রের দ্বারা ঐ পোকার মত করিয়া মাটির নীচেও ত সুড়ঙ্গ কাটা যাইতে পারে। অতএব ঐ ক্ষুদ্র জীবের কাছে এই সঙ্কেত লইয়া তিনি বিদ্যা, বুদ্ধি ও পরিশ্রমের প্রভাবে 'টেম্‌স টনেল' নির্ম্মাইয়াছিলেন।

লণ্ডনের রাস্তায় গোলমাল, লোক, গাড়ী ও দোকানের প্রচুরতা আছে, কিন্তু কোন প্রকার আমোদ দেখিতে পাই না। ইংরাজেরা বাক্যপ্রিয় নহে, সে জন্য ইহারা রাস্তা দিয়া চলিবার সময় কোন কথাবার্ত্তা বা হাস্য কৌতুক করে না; সকলেই এরূপ ব্যস্তভাবে চলে যে, মুখ দেখিলে বোধ হয় যেন কলের গাড়ী ধরিতে যাইতেছে। আমাদের দেশের ঠাকুর ভাসান, রথযাত্রা, বরযাত্রা ইত্যাদির মত কোন আনন্দদায়ক দৃশ্য এদেশের রাস্তায় দেখা যায় না। কেবল বৎসরে একবার যখন লণ্ডনের সর্ব্বপ্রথম মাজিষ্ট্রেট মনোনীত হয়, তখন, আমাদের দেশের অনেকটা রথযাত্রার মত, মনোনীত মাজিষ্ট্রেট বিচিত্র বেশভূষা পরিয়া ও উত্তম গাড়ী করিয়া এবং নানাপ্রকার বেশভূষায় আচ্ছাদিত শকটারোহী ও পাদচারী অনেক লোক লইয়া লণ্ডনের কতক ভাগ প্রদক্ষিণ করেন। তাহা ভিন্ন আমোদের দৃশ্যের মধ্যে কোন কোন রাস্তায় 'পঞ্চ ও জুডী' দেখিতে পাই; ইহা অনেকটা সে দেশের পুতুলনাচের মত, কিন্তু আমাদের দেশের পুতুলনাচ অপেক্ষা ইহা অনেক নিকৃষ্ট।

লণ্ডন এত বৃহৎ এবং ক্রমে আরো বাড়িতেছে, তথাপি ইহার এক দিক হইতে অন্য এক দিকে যাইবার জন্য এত প্রকার উপায় আছে যে, অল্প পয়সাতে ও অল্প সময়ের মধ্যে এক পাশ হইতে অপর পাশে যাওয়া যায়। ইংলণ্ডে প্রায়

কুড়িটা ভিন্ন ভিন্ন রেলওয়ে, তাহার মধ্যে উত্তর লণ্ডন ও মাটির নীচের রেলওয়ে—এই দুটী ক্রমাগত কেবল লণ্ডনের ভিতর ও চারিপাশ ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহা ব্যতীত অন্যান্য কতকগুলি রেলওয়ের প্রধান ষ্টেশন ও অনেক ছোট ছোট ষ্টেশন লণ্ডনের ভিতর আছে। লণ্ডনের রেলপথ আঁকা মানচিত্র দেখিলে বোধ হয়, লণ্ডন যেন মাকড়সার জালে পরিপূর্ণ। সমস্ত দিন প্রতি ষ্টেশনে পাঁচ দশ মিনিট অন্তর কলের গাড়ী যাইতেছে, ইচ্ছা হইলেই অতি শীঘ্র আর এক স্থানে যাইতে পার। এই নগরের প্রায় সকল দিকেই ট্র্যামে করিয়া যাওয়া যায়, এখানকার ট্র্যামগুলি দেখিতে এক একখানা কলের গাড়ীর মত, ভিতরের বেঞ্চীর উপর গদি পাতা, দুধারে কাচ বসান, দুধারে দুটী দরজা, ছাদের উপর বসিবার স্থান এবং উঠিবার জন্য সিঁড়ি আছে। এক একখানা ট্র্যামগাড়ীতে চব্বিশ জন করিয়া লোক ধরে।

সাধারণের যাতায়াতের জন্য ট্র্যামের মত আর এক প্রকার গাড়ী আছে, উহার নাম 'ওম্নিবস' কিন্তু সচরাচর ইহাকে 'বস' বলে। এগুলি দেখিতে প্রায় ট্র্যামগাড়ীর মত, কিন্তু উহা অপেক্ষা কিছু ছোট এবং ইহা রেলের উপর দিয়া চলে না। বসে করিয়া যেখানে সেখানে যাইবার অতিশয় সুবিধা। লণ্ডনের ভিতরে, পাশে, চারিদিকেই বস দেখিতে পাইবে, এমন বড় রাস্তা নাই যেখানে বস চলে না। লণ্ডনে প্রত্যহ প্রায় দুই হাজার ট্র্যাম ও বস চলে। লণ্ডনের ভিতর সর্ব্বসাধারণের গমনাগমনের জন্য রাস্তার উপর দিয়া যেমন রেল, ট্র্যাম ও বস চলে, সেইরূপ জলপথে যাতায়াতের নিমিত্ত

কলের নৌকা আছে; উহা দ্বারা টেম্‌স নদীর উপর দিয়া বহুসংখ্যক লোকে অতি শস্তায় নগরের এক পাশ হইতে অন্য পাশে যাওয়া আসা করে।

এই সকল সাধারণের যান ব্যতীত এখানে প্রায় পাঁচ হাজার চারিচাকার আর সাড়ে ছয় হাজার দুই চাকার ঠিকা গাড়ী আছে। উভয়কেই এক ঘোড়ায় টানে। চারিচাকার গাড়ীগুলা অনেকটা আমাদের দেশের পাল্কী গাড়ীর মত; দুইচাকার গাড়ী আমাদের বাঙ্গালা দেশে নাই, কিন্তু বোম্বাইতে দেখিয়াছি; ইহাতে দুটীর বেশী লোক ধরে না, সম্মুখটা খোলা, বৃষ্টি হইলে কাচের জানালা নামাইয়া দেয় এবং গাড়োয়ান গাড়ীর সম্মুখে না বসিয়া পশ্চাতে বসিয়া ঘোড়া চালায়। এই সকল গাড়ী ভিন্ন যে কত প্রকার ঘরের গাড়ী, দোকানদারের গাড়ী, রেলওয়ে কোম্পানীদের গাড়ী, মদ-ওয়ালাদের গাড়ী. এবং হাতটানা গাড়ী ইত্যাদি লণ্ডনের রাস্তায় প্রত্যহ যাওয়া আসা করে তাহার সংখ্যা নাই।

(এখানে গ্যাসের আলোই অধিক ব্যবহৃত হয়; রাস্তা, দোকান, নাট্যশালা, প্রভৃতি সব বড় বড় স্থানে গ্যাস জ্বলে, এবং লণ্ডনের ভিতরের অধিকাংশ বাড়ীতেই গ্যাস ব্যবহার করে। আজকাল দুএকটা বিখ্যাত দোকানে, নাট্যশালায় ও মিউজিয়মে এবং ষ্টেশনে বৈদ্যুতিক আলো দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা গ্যাসের আলো অপেক্ষা অধিক তেজাল ও নিরাপদ বটে, কিন্তু বেশী খরচ পড়ে বলিয়া এখনও যেখানে সেখানে ব্যবহার করিতে পারে না, এবং ইহা সর্ব্বদা কাঁপে বলিয়া দেখিবার পক্ষেও তত ভাল নয়। লণ্ডনের বড় বড় রাস্তায়

প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় আমাদের দেশের পূজাবাড়ীর মত আলো হয়। দোকানের ভিতরে আলো, বাহিরে আলো, আবার কাচে ও দোকানের চক্‌চকে দ্রব্যে আলো পড়িয়া উহা দ্বিগুণরূপে প্রতিফলিত হয়। এই জন্য শীতকালে লণ্ডনে দিনের বেলা অপেক্ষা রাত্রিতে বেড়াইতে অধিক আনন্দ হয়।

---

# দশম অধ্যায়।

## ইংরাজ মহিলা।

ইংরাজ স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বগুণসম্পন্ন না হইলেও ইহাদের অনেকগুলি সদ্‌গুণ আছে। ইহারা অতিশয় কর্ম্মদক্ষ ও চতুর এবং অনেকে শিক্ষিত। এদেশের পুরুষদের মত স্ত্রীলোকেরাও কখন কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা দেখায় না; কোন কাজ থাকিলে অলসভাবে বসিয়া মিথ্যা সময় নষ্ট করে না। সংসারের কর্ম্ম না থাকিলেও অধিকাংশ ইংরাজ স্ত্রীলোকেরা কোন না কোন আবশ্যক শিল্পকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকে। এখানে পুরুষেরা কেবল অর্থ উপার্জ্জন করে, বাড়ীর সমস্ত ভার স্ত্রীলোকদের হাতে ন্যস্ত থাকে। পুরুষ গৃহের কর্ত্তা বটে, কিন্তু স্ত্রীই যথার্থ সংসারের রাণী। আমাদের দেশের মত এখানে "বাহির" বাড়ী ও "ভিতর" বাড়ী নাই, সুতরাং স্ত্রীলোকদের বাড়ীর চারিদিক দেখাশুনা করিতে এবং কোন বন্ধু বা অভ্যাগত লোক আসিলে তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে হয়। সংসারের

সকল কর্ম্ম সুচারুরূপে চালান, সমস্ত চাকর চাকরাণীদের উপর দৃষ্টিরাখা, সমস্ত আয়ব্যয়ের হিসাব রাখা ইত্যাদি অতি গুরুতর কার্য্যসকল ইংরাজ স্ত্রীলোকের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। এদেশের গৃহস্থ স্ত্রীলোকেরা প্রায় সকলেই কাপড় ধোয়া হইতে সন্তান পালন করা পর্য্যন্ত সংসারের সমস্ত কাজ নিজে করে যেহেতু এখানে চাকরাণী রাখা সহজ কথা নয়, আর বাহিরের লোক দিয়া কাজ করাইতে অনেক খরচ পড়ে।

বড়মানুষদের বাড়ীতে অনেক বিলাসী স্ত্রীলোক আছেন, তাঁহারা দাসদাসীদের হাতে সংসার ও সন্তানের ভার দিয়া কেবল গানবাজনা করিয়া, পোষাক করিয়া, কিম্বা গল্পের বই পড়িয়া দিন কাটান। কিন্তু এ সম্বন্ধে কেবল ইহাঁদের দোষ-দিব কি, সকল দেশেই ধনী স্ত্রীলোকদের অলস দেখিতে পাওয়া যায়। প্রচুর অর্থ সর্ব্বত্র বিলাসের প্রধান মূল। স্ত্রীলোকেরা সংসারের ভিত্তিস্বরূপ, অতএব সর্ব্বসাধারণ ইংরাজ মহিলারা অলস হইলে ইংরাজ-সংসার কখন চলিত না বা ইংলণ্ডের এত উন্নতি হইত না। আমার মতে ইহারা বরং পুরুষদের যথার্থ অর্দ্ধাঙ্গ। এখানে স্ত্রীলোকে সচরাচর যেরূপ পুরুষের সহায়তা করে ও অনেক সময়ে পুরুষের কাজ করিয়া থাকে, এরূপ আমাদের দেশে প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। নারীর উচিত কাজ ব্যতীত ইংরাজ স্ত্রীলোকেরা দোকান চালায়, কেরাণীগিরি করে, স্কুলে শিক্ষা দেয়, পুস্তক ও সংবাদপত্র লেখে, সভা করিয়া বক্তৃতা দেয় ইত্যাদি অনেক পুরুষের কর্ম্ম অতি সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করে। দেশের স্ত্রীলোকেরা জাতির অর্দ্ধ ভাগ; তাহারা কেবল অতি যৎসামান্য কাজ

করিয়া কিম্বা অলস ভাবে থাকিয়া জীবন যাপিলে সমস্ত জাতির অনেক অনিষ্ট হইয়া থাকে। ইংরাজ স্ত্রীলোকেরা কেবল সংসারকর্ম্মে ব্যাপৃত না থাকিয়া অনেক বিষয়ে পুরুষের সহযোগী হওয়াতে কত বড় বড় কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে এবং দেশের কত শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে।

ভারতবর্ষবাসী ইংরাজ স্ত্রীলোকেরা, সেখানে সমস্ত জিনিস ও চাকর চাকরাণী অতি অল্প পয়সায় পাওয়া যায় বলিয়া এবং স্বামীদের অতিরিক্ত বেতনের টাকায় অধিক মায়া না থাকায় সাধ্যমত নড়িয়া বসিতে ইচ্ছা করে না। খাওয়া, পোষাক করা, গল্প করা, গানবাজনা করা ও হাওয়া খাওয়া সেখানে তাহাদের প্রধান কাজ; সুতরাং ভারতবর্ষীয়েরা তাহাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়া ইংরাজ স্ত্রীলোকমাত্রকেই "বাবু" মনে করিয়া থাকেন। এক সময়ে আমিও সমস্ত ইংরাজ স্ত্রীজাতিকে অলস বলিয়া ভাবিতাম, কিন্তু এখানে আদ্যোপান্ত সব দেখিয়া আমার সে ভ্রমবিশ্বাস একেবারে দূর হইয়াছে। ইংরাজ পুরুষদের মত ইহাদের পরিশ্রম, সহিষ্ণুতা ও কার্য্যক্ষমতা দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়াছি। আর ইংলণ্ডীয় স্ত্রীলোকদের মধ্যে যে সকল সদ্‌গুণ লক্ষিত হয়, কেবল বহিরাকারের পরিবর্ত্তে ঐ গুলির অণুকরণ করিলে আমাদের যথার্থ উপকার হইবার সম্ভাবনা।

ইংলণ্ডে স্ত্রীলোকদের শিক্ষার জন্য বিলক্ষণ সুবিধা আছে। কোন নগরে বালিকাদের ভাল ভাল স্কুল ও কালেজের অভাব নাই; লণ্ডনে প্রায় প্রতি পাড়াতেই দুই তিনটা করিয়া ছোট ছোট বালিকাবিদ্যালয় দেখিতে পাওয়া যায়। আজকাল

লণ্ডন, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের সমান শিক্ষা পাইয়া থাকে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের সহিত সমানে এক কালেজে এক অধ্যাপকের নিকট পাঠ করিয়া এক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় এবং সমান উপাধি লাভ করে। এখানকার পরীক্ষা সকল আমাদের দেশের বি এ, এম্ এ ইত্যাদি পরীক্ষা হইতে অনেক কঠিন হইলেও বহুসংখ্যক ইংরাজ স্ত্রীলোকে পুরুষদের সহিত সমানে আড়া আড়ি করিয়া ঐ সকল কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, এবং কখন কখন পুরুষদের উপরে উঠে। লণ্ডনে উপাধিধারী পুরুষের ন্যায় উপাধিধারী স্ত্রীলোকেরও অপ্রতুল নাই; কুমারী স্মিথ্ বি এ, শ্রীমতী জোন্স এম্ এ, এরূপ নাম প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। আজকাল যে সকল সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন পরীক্ষা অতি অল্প পুরুষই দিয়া থাকে, সেগুলিতে পর্য্যন্তও স্ত্রীলোকেরা অগ্রসর হইতে কুণ্ঠিত হয় না এবং তাহাতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। ইহাতেই বুঝা যায় যে, স্ত্রীলোকেরা বুদ্ধির প্রখরতায় পুরুষদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে; বরং অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও জ্ঞান ও বিদ্যায় পুরুষদের সহিত সমকক্ষতা করা স্ত্রীলোকদের শ্রেষ্ঠতার পরিচয় দেয়। শুনিয়াছি, উত্তর আমেরিকার স্ত্রীলোকেরা জজ, ব্যারিষ্টার ইত্যাদি হইয়া পুরুষের মত উচ্চাসনে বসিয়া বিচারাদি করে এবং সেখানকার সকল ভদ্র স্ত্রীলোকেরা অতিশয় সুশিক্ষিতা। ইংলণ্ডের স্ত্রীলোকেরা এখন অধ্যাপনা ও চিকিৎসা অপেক্ষা অধিক উন্নত কর্ম্ম করে না; কিন্তু এখানে স্ত্রীশিক্ষার যেরূপ দ্রুত উন্নতি হইতেছে তাহাতে বোধ হয়,

ইংরাজ মহিলারা অনতিবিলম্বে আমেরিকার স্ত্রীলোকদিগকে অতিক্রম করিয়া উঠিবে।

বালকদের মত বালিকাদের দলে দলে স্কুলে যাইতে এবং যুবকদের মত যুবতীদের কালেজে অধ্যয়ন করিতে যাইতে দেখিয়া আমার মনে যে কিপর্য্যন্ত আহ্লাদ হয় তাহা প্রকাশ করিতে পারি না। এখানে স্ত্রীলোকেরাও ছয় সাত বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া কুড়ি পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে পড়িয়া থাকে। অনেকে আবার ইহাতেও সন্তুষ্ট থাকে না, শিক্ষিত ইংরাজ পুরুষদের মত জীবনের শেষ পর্য্যন্ত বিদ্যাচর্চ্চায় নিমগ্ন থাকে। এখানে অনেক গ্রন্থকর্ত্রী, পণ্ডিতা ও বিজ্ঞানবিৎ আছেন। দুই এক বিষয়ে স্ত্রীলোকদের অধিক আধিপত্য দেখিতে পাই। এখন ইংরাজীতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট নবন্যাসগুলি স্ত্রীলোকদের লেখনী হইতে প্রসূত হইয়া থাকে।

এদেশে বালিকারা পাঠশালায় কেবল বিদ্যাশিক্ষা করে না; লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেলাই, পশমবোনা ইত্যাদি শিল্পকর্ম্ম, গানবাজনা, ব্যায়াম এবং কখন কখন রন্ধনও শিক্ষা করে। ইংরাজ পিতামাতারা, যাহাতে তাঁহাদের কন্যারা ঐ সমস্ত বিষয়ে পারদর্শিনী হয়, তাহার যথাসাধ্য যত্ন লন। তাঁহারা পুত্রদের বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে যেমন যত্নবান, কন্যাদের শিক্ষাদানেও সেইরূপ ব্যগ্র হন। এখানে শিক্ষয়িত্রীর অভাব নাই, সেইজন্য পিতামাতারা পুত্রদের শিক্ষক নিযুক্ত করিবার সময় কন্যাদেরও শিক্ষয়িত্রী রাখিয়া দেন এবং উভয়েরই জন্য প্রায় সমান অর্থ ব্যয় করেন। কেবল ধনী

নয়, সামান্য গৃহস্থদের কন্যারাও আঠার উনিশ বৎসর অবধি লেখাপড়া, গান বাজনা ও আবশ্যকীয় শিল্পকর্ম্ম শিখে। যত-দিন পর্য্যন্ত কন্যারা ঐ সকল বিষয়ে সুশিক্ষিতা না হয়, ততদিন পিতামাতারা অকাতরে অর্থ ব্যয় করেন এবং কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করিতেছেন ভাবিয়া আনন্দিত হন। ভারতবর্ষের যে প্রকার লোকের কন্যারা বিদ্যা ও শিল্পকর্ম্মে একেবারে অজ্ঞ, এখানে তাহার অপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর লোকের কন্যারা অতি শিক্ষিতা ও চতুরা। এদেশে অতি ছোটলোক ভিন্ন যে সে লোকের স্ত্রী, কন্যারা লিখিতে পড়িতে ও পিয়ানো বাজাইতে পারে; সকলেই সংসারকর্ম্মে ও পোষাক ইত্যাদি প্রস্তুত করায় পটু।

ইংরাজ স্ত্রীলোকেরা মনের সহিত শরীরেরও বিলক্ষণ যত্ন লয়। প্রায় সকল বালিকাবিদ্যালয়ে ব্যায়াম ও শরীর-সঞ্চালক ক্রীড়ার নানা প্রকার সুবিধা দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক স্থলে পুরুষদের মত স্ত্রীলোকেরাও জিমনাষ্টিক প্রভৃতি বলসাধ্য ক্রীড়াতে নিপুণ হয়। আর হাঁটিয়া বেড়ান, ঘোড়ায় চড়া, দৌড়াদৌড়ি করা, লনটেনিস খেলা ইত্যাদিতে ইংরাজ মহিলারা পুরুষদের সহিত সমকক্ষতা করিয়া থাকে। এখানে প্রায়ই এমন অনেক স্ত্রীলোক দেখিতে পাই, যাহারা শারীরিক বল ও মনের তেজে অধিকাংশ বাঙ্গালী পুরুষদের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। ভদ্র ইংরাজ স্ত্রীরা যত রাস্তায় হাঁটিয়া বেড়ায়, সচরাচর ভারতবর্ষীয় পুরুষেরা তত বেড়াইতে পারেন কি না সন্দেহ। আবার ইউরোপের মধ্যে সকল জাতির স্ত্রীলোকদের অপেক্ষা এই দেশের স্ত্রীরা অধিক বলিষ্ঠ ও কষ্টসহ। কথিত

আছে একজন ইটালীয় ভদ্রস্ত্রী সমস্ত বৎসরে যত না চলিয়া বেড়ায়, এক জন ইংরাজ মহিলা একদিনে তাহার অপেক্ষা অধিক হাঁটিয়া থাকে। এইরূপ সবল ও ক্লেশসহ মাতাদের যে সুস্থকায় ও বলবান সন্তান হইবে আর তাহারা পরে সাহসী, তেজীয়ান্ ও কর্ম্মঠ ইংরাজ পুরুষে পরিণত হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য নাই।

সাধারণ ইংরাজ স্ত্রীলোকেরা দেখিতে কুৎসিত নয়। ইহাদের মুখ সরু ও উহার ছাঁদ ভাল। এখানে অনেক যথার্থ রূপবতী স্ত্রী দেখিয়াছি, তাহাদের মুখ ঠিক যেন ছাঁচে তোলা বলিয়া বোধ হয়। ভদ্র স্ত্রীলোকদের রং অতি সুন্দর পরিষ্কার ও ঈষৎ গোলাপী, আর সাধারণতঃ ইহাদের রঙের জেল্লাতে অনেককে সুন্দরী বলিয়া বোধ হয়। আমরা এই পরিষ্কার বর্ণ দেখিয়াই প্রথমে ইংরাজ স্ত্রীলোকদের অপ্সরা মনে করিয়া থাকি, কিন্তু কিছুদিন ভাল করিয়া দেখিলে জানিতে পারি যে ইহাদের অনেকের মুখ ও বর্ণ ভাল হইলেও শরীরের গঠন মনোহারী নয়, এবং রমনীসুলভ কোমলত্বে বঞ্চিত। অধিকাংশ স্ত্রীলোকই কৃশাঙ্গী, এবং পুরুষের ন্যায় কাজ ও পুরুষের সঙ্গে মিশামিশি করাতে ইহাদের শরীর পুরুষের মত অনেকটা লাবণ্যহীন। অনেক সময়ে ইহাদের সৌন্দর্য্য কেবল বেশবিন্যাসঘটিত, বাস্তবিক ইংলণ্ডীয় স্ত্রীলোকদের মধ্যে যেমন কৃত্রিম সৌন্দর্য্য দেখিয়াছি সেরূপ আর কোথাও দেখি নাই। বোধ হয় ভারতবর্ষীয় মহিলাদের সাদা রং হইলে এবং তাঁহারা সুচারু পরিচ্ছদ পরিলে, সুন্দরী ইংরাজ স্ত্রীদের অপেক্ষা অধিক মোহিনী হন।

ইহাদের সম্বন্ধে আর একটী বিষয় নজর করিয়াছি। এদেশের রাস্তা ঘাটে সদাসর্ব্বদাই যুবতী স্ত্রী দেখিতে পাই। শীতল ও ভিজা জলবায়ু বশতই হউক কিম্বা অন্য কোন কারণেই হউক, ইংরাজ স্ত্রীরা শীঘ্রই বৃদ্ধা হইয়া পড়ে না। অনেক সময়ে আবার আধবুড়ী স্ত্রীরাও যুবতীর ন্যায় পোষাক পরিয়া সাধ্যমত অল্পবয়স্কা দেখাইতে চেষ্টা করে।

ইংলণ্ডে আসিয়া স্ত্রীলোকেদের পোষাক দেখিলে অতিশয় আশ্চর্য্য হইতে হয়। ইংরাজ মহিলারা পরিচ্ছদে অত্যন্ত আড়ম্বর করিতে ভালবাসে। কি ধনী, কি দরিদ্র সকলেই বেশভূষা লইয়া একেবারে উন্মত্তপ্রায়। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের নিকট যেমন গহনা, ইংরাজ রমণীর নিকটে পোষাক তদপেক্ষাও অধিক আদরণীয়। এদেশে অধিক শীত, ও সূর্য্যের আলো বিরল বলিয়া স্ত্রীলোকেরা সচরাচর কাল পোষাক পরে কিন্তু তাহাতেই অনেক বাহার ও কাজ দেখা যায়, আর ইহারা প্রায় সকল সময়েই উত্তম ও বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিয়া বাহির হয়। গ্রীষ্মকালে এখানে পোষাকের ভয়ানক ঘটা। এত রকম গড়নের ও এত রকম রঙের পরিচ্ছদ আর কেথাও দেখা যায় না, এমন কি দুইটী স্ত্রীলোককে এক প্রকার পোষাক পরিতে দেখিতে পাই না। এই সম্বন্ধে ইংরাজ স্ত্রীদের রুচির প্রশংসা করিতে পারি না। অতি অল্পই স্ত্রীলোক রুচি পূর্ব্বক বেশভূষা করিয়া থাকে, সাধারণ ইংরাজ স্ত্রীদের কার কোন্‌টী ভাল সাজাবে তাহার জ্ঞান নাই। ইহারা এত কাপড় ও ছোট ছোট জিনিস দিয়া বেশভূষা করে যে দেখিলে বোধ হয় যেন, দরিদ্র হইতে হঠাৎ ধনী হইয়া ধনের

আতিশয্য দেখাইবার জন্য রাশি রাশি মূল্যবান্ দ্রব্যের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া বাহিরে বেড়ায়। রবিবারে এদেশে সর্ব্বত্রই সকলে নিজের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বেশ পরিয়া থাকে, পোষাক দেখিয়া ভদ্রাভদ্র ঠিক করা ভার। হাইড পার্ক এবং লণ্ডনের অন্যান্য ধনীদের সমাগমস্থানে দুচার দিন বেড়াইলেই এদেশের ধনী স্ত্রীদের বেশবিন্যাসের দৌড় বুঝিতে পারা যায়। চমৎকার কাজ করা মক্‌মলের টুপি ও দামী বনাত বা রেশমের গাউন, নানা প্রকার ইংরাজী শাল, দস্তানা, সোনার চেন, সোনার বালা ও খাড়ু ইত্যাদি সজ্জা দেখিলে মনে হয় যেন ইহারা ছবি সাজিয়া লোকদের দেখাইবার জন্য আল্‌মারী হইতে বাহির হইয়াছে। এক এক জন বড়মানুষের স্ত্রীর কেবল সমস্ত পোষাকের দাম হিসাব করিলে দুই তিন শত টাকার কম হয় না।

ইংরাজ মহিলারা সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার জন্য এত প্রকার কৃত্রিম জিনিস ব্যবহার করে যে, তাহাদের বিষয় শুনিলে চম্‌কিয়া যাইতে হয়। কর্সেট্, ক্রিনোলিন প্রভৃতি নানা প্রকার দ্রব্য দ্বারা শরীরের গড়ন ও আকৃতির এমন পরিবর্ত্তন করাইয়া দেয় যে, কে যথার্থ সুন্দরী আর কে সাজান সুন্দরী তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য। ইহারা নিজেদের সুন্দরী দেখাইবার জন্য অতিশয় বেদনা সহ্য করিয়াও স্বাভাবিক শরীরের বিকৃতি করিয়া থাকে। শুনিয়াছি, এক সময়ে ইহারা কোমর সরু করিবার জন্য এত আঁটিয়া বাঁধিত যে কখন কখন রাস্তায় চলিতে চলিতে মূর্চ্ছা যাইত। এখন তত বাড়াবাড়ি নাই বটে, কিন্তু তথাপি যুবতী স্ত্রীদের দেখিলে বোধ হয়,

যে শরীরের আরাম অপেক্ষা সৌন্দর্য্যের প্রশংসা তাহাদের নিকট অধিক সুখদায়ক।

এদেশে স্ত্রীলোকদের পরিচ্ছদের এত আতিশয্য হইয়াছে যে, অনেকে আহারাদি পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া বেশ ভূষা করাইতে ব্যস্ত থাকে। আবার এখানে পরিচ্ছদ দেখিয়াই ভদ্রাভদ্র ঠিক করিয়া লয়। কোন ভদ্রস্ত্রী সামান্য বস্ত্র পরিয়া রাস্তায় বাহির হইলে লোকে তাঁহাকে দরিদ্র বা চাকরাণী মনে করিয়া তাচ্ছল্য করিবে এবং কোন চাকরাণী বা ইতর স্ত্রীলোক উত্তম বেশ করিয়া বেড়াইলে লোকে তাহাকে ভদ্র ভাবিয়া তাহার সম্ভ্রম করিবে। বাস্তবিক ইংরাজেরা ভদ্রাভদ্রের অধিক আদর অনাদর করে না, ইহারা টাকারই মর্য্যদা করিয়া থাকে। মূল্যবান্ পোষাকে পরিচ্ছন্ন দেখিলেই, ভদ্র হউক বা অভদ্র হউক তাহার আদর করিবে। অতএব সকলেই যথাসাধ্য উত্তম বেশবিন্যাস করিতে চেষ্টা করে। স্বামী ও পিতারা স্ত্রীকন্যাদের পরিচ্ছদের জন্য উত্যক্ত হইয়া উঠে। আমাদের দেশের গহনার অপেক্ষা এখানে পোষাকের আড়ম্বর অনেক অধিক। গহনা একবার গড়াইলে নিস্তার পাওয়া যায়, কিন্তু পোষাকের জন্য ইংরাজ পুরুষদের প্রত্যহ জ্বালাতন হইতে হয়। দেখিতে পাই, যে ব্যক্তি ছুতারের কাজ করিয়া দিন কাটায়, তাহার স্ত্রী সময়ে সময়ে এমন সুন্দর পোষাক পরিয়া বেড়ায় যে, দেখিলে ধনাঢ্যের স্ত্রী বলিয়া ভ্রম হয়। যে লোকের ছিন্ন বস্ত্র দেখিয়া দুঃখ হয়, তাহার স্ত্রীর চমৎকার পোষাক দেখিয়া আশ্চর্য্য হই। অধিক কি বলিব, দেখিয়া শুনিয়া বিশ্বাস হয়, পোষাকের লালসা ইংরাজ মহিলাদের মনে

একটা বিষম রিপুর মত হইয়াছে। ইহারা কোন ক্রমেই এ রিপুকে দমন করিতে পারে না।

ইংরাজ স্ত্রীলোকেরা অতিশয় চঞ্চল এবং বাল্যকাল হইতে চতুর হইতে শিখে। ইহারা আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের ন্যায় নয় দশ বৎসরে বিবাহিতা হইয়া সংসারে প্রবেশ করে না এবং বার তের বৎসরে একেবারে গৃহিণী হইয়া পড়ে না বটে, কিন্তু শিশুকাল হইতে নানা প্রকার লোকের সহিত কথা কহিয়া ও মিশিয়া অল্প বয়সেই অনেক বিষয়ে চতুরতা লাভ করে। ইউরোপের অন্য কোন দেশের মহিলারা ইহাদের মত চঞ্চল ও মুখরা নয়। ফ্রান্স, জর্ম্মণী, ইটালি প্রভৃতি দেশে গিয়া একজন তের চৌদ্দ বৎসরের বালিকার সহিত কথা কহিলে, সে সরল ও নম্রভাবে কথার উত্তর দিবে, কিন্তু ঐ বয়সের একটী ইংরাজ বালিকা নাকে চোকে কথা কহিয়া কথাতে লোককে হারাইয়া দিতে পারে। আবার কোন সাধারণ স্থানে বেড়াতে গেলে পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের গলার স্বরই অধিক শুনিতে পাই; আর একটী বালিকাকেও স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতে দেখি না, বিনা কারণেও সর্ব্বদা ইহাদের হাত, পা ও মাথা নড়ে। প্রাপ্তবয়স্কা যুবতীরাও অনেক সময়ে প্রকাশ্য স্থানে জঘন্য আচরণ করিয়া থাকে। যথার্থ লজ্জা কাহাকে বলে তাহা ইংরাজ মহিলারা জানে না বলিলেই হয়। সুচারু পরিচ্ছদে শরীর ঢাকা দিলেই লজ্জা করা হয় না; লজ্জা আন্তরিক নম্রতা, এই হৃদয়ের নম্রতা যে নারীর বদনে প্রতিফলিত হয় লোকে তাহাকে লজ্জাশীলা বলে। কিন্তু আমি অতি অল্প ইংরাজ স্ত্রীলোকের মুখে এই আন্তরিক বিনয়জনিত

সুমধুর লজ্জার ভাব দেখিয়াছি। সময়ে সময়ে ইহারা এরূপ নির্লজ্জভাবে ব্যবহার করে যে, এই স্ত্রীস্বভাবসুলভ নম্রতার অভাবে ইহাদের সমস্ত সদ্গুণ নিরর্থক বলিয়া বোধ হয়।

(ইংরাজ মহিলারা বিনয়বতী ও আতিথেয়ী নয়। কোন ব্যক্তির সহিত কথা কহিবার সময় ইহারা শিষ্টাচার পূর্ব্বক আলাপ করিতে জানে না এবং কোন অভ্যাগত ব্যক্তি বাড়ীতে আসিলে ভারতমহিলাদের মত ইহারা নিজের আহার ত্যাগ বা অগ্রাহ্য করিয়া অভ্যাগত ব্যক্তিকে ভোজন করাইতে অগ্রসর হয় না।) শুনিয়াছি অনেক স্থানে কোন নিমন্ত্রিত ব্যক্তি বাড়ীতে আসিলে ইহারা প্রথমে নিজেদের জন্য ভাল জিনিসগুলি রাখে আর অবশিষ্টগুলি তাহাকে খাইতে দেয়। এইরূপ কথা অত্যুক্তি হইতে পারে বটে, কিন্তু আমাদের দেশে এরূপ দৃষ্টান্ত কেহই দেখিতে পাইবে না এবং এরূপ কথাও কখন শুনা যায় না। অনেক কঠিন গুণ না থাকিলেও ভারতমহিলারা স্ত্রীস্বভাবসুলভ লজ্জা, বিনয়, দয়া, মায়া স্নেহ, মমতা ইত্যাদি কোমল গুণে অলঙ্কৃতা; এ সকল সদ্গুণে আমরা কোন জাতির নিকট হারি মানি না। হিন্দুরমণীদের বিলক্ষণ তেজ ও সাহস ছিল, এখনও আছে, কিন্তু কেবল স্বাধীনতা ও শিক্ষার অভাবে আমরা উহার পরিচয় দিতে পারি না। পুরুষদের তাচ্ছিল্য ও সামাজিক কুসংস্কারই হিন্দুস্ত্রীদের হীনাবস্থাও সকল অমঙ্গলের কারণ। (তেজ, সাহস ইত্যাদি কঠিন গুণ থাকিলেই যে কোমল গুণ হারাইতে হয়, এরূপ বিবেচনা করা নিতান্ত ভ্রম। কেবল ইংরাজ মহিলাদের মধ্যেই ইহার উদাহরণ দেখিতে পাইতেছি।

ইংরাজ মহিলাদের বিনয়াদি গুণের আধিক্য না থাকাতে ইহারা সময়ে সময়ে স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাদের স্বামীখোঁজার বিষয় শুনিলে অনেকে আশ্চর্য্য হইবেন। বিবাহের বয়স প্রাপ্ত হইলেই ইংরাজ যুবতীরা স্বামী অন্বেষণে একেবারে পাগল হইয়া বেড়ায়। এ সম্বন্ধে ইহাদের সম্পূর্ণ দোষও দেওয়া যায় না। ইংলণ্ডে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক, আর শিক্ষিতা ও রূপবতী স্ত্রীদেরও অভাব নাই। সুতরাং অন্যান্য বিষয়ের মত যুবতীদের মধ্যে ভয়ানক আড়াআড়ি হইয়া থাকে। উপযুক্ত বয়স হইলেই কিসে পুরুষের মন তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে, কি উপায়ে অন্য সকলকে ফেলিয়া তাহাকে পছন্দ করিবে তাহাই সাধিবার জন্য প্রত্যেক ইংরাজ যুবতী লালায়িত হইয়া বেড়ায়। এ সময়ে ইহারা রাস্তা, বাগান, নাট্যশালা প্রভৃতি অধিক পুরুষের সমাগমস্থানে যায় আর নিজেদের রূপ ও গুণ দেখাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে। এই বয়সে ইহারা অধিক চঞ্চল ও বাক্যপটু হয় এবং পিতামাতার মতানুসারে বাড়ীতে থাকিতে ভাল বাসে না, আর গুরুজনের সঙ্গ ছাড়িয়া সর্ব্বত্র নিজেরাই গমনাগমন করে। অবশ্য ইহাদের মনে কোন দূষ্য ভাব না থাকিতে পারে, মনের মত বর জোটানই একমাত্র উদ্দেশ্য হইতে পারে। ইংরাজ মহিলারা জেলেদের মত বড় বড় স্থানে জাল পাতিয়া রাখে; মাছের মত পুরুষেরা একবার জালে আসিয়া পড়িলে আর নিস্তার নাই। যৌবন ও সৌন্দর্য্যে বঞ্চিত হইবার আগে একটী বর ধরিতে পারিলে ইহাদের আহ্লাদের আর শেষ থাকে না। কুরূপাদের এখানে ভয়ানক

কষ্ট, আবার অনেকে যথাসাধ্য নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াও এই স্বামী ধরাতে সফল হয় না এবং চিরজীবন অবিবাহিতা থাকিয়া যায়।

আমাদের দেশের অনেক লোকে এদেশের অধিকাংশ স্ত্রীলোককে অসচ্চরিত্র বলিয়া মনে ভাবেন। তাহার কারণ ইহারা পথে, মাঠে, ও বাগানে স্বাধীনভাবে বেড়ায় এবং পুরুষদের দেখিয়া ঘোমটা টানিয়া অবনতমুখী হয় না। এখানে আসিলে তাঁহাদের সে ভ্রম দূর হইয়া যাইবে। ইংরাজ মহিলাদের যদি ধর্ম্মভয় না থাকিত, তাহা হইলে ইংলণ্ডের উন্নতি ও গৌরব হইত না বা ইংরাজেরা অন্যান্য সভ্য জাতিদের আদৃত ও সম্মানিত হইত না। কেবল অসভ্য ও বন্য জতিরাই সতীত্বের আদর ও গৌরব জানে না; সভ্য ও উন্নত জাতিরাই সতীত্বকে স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করে। এখানে যে বিপথগামিনী নারী নাই তাহা নয়, কিন্তু সচ্চরিত্রার ভাগ অনেক বেশী। এদেশে যাহারা সতী আমার মতে তাহারাই প্রকৃত সতী; কারণ একেবারে পুরুষের মুখ না দেখিয়া বা পুরুষের সহিত না মিশিয়া অনেকে সতীত্বের গৌরব করিতে পারেন বটে, কিন্তু যাঁহারা পুরুষের মধ্যে থাকিয়া, পুরুষের সঙ্গে সমভাবে বেড়াইয়া ও আলাপ করিয়া নিজেদের অমূল্য ধর্ম্মরত্নকে না হারান, তাঁহারাই যথার্থ প্রশংসা পাইবার যোগ্য এবং তাঁহাদেরই মনের ও ধর্ম্মের তেজ অধিক।

ইংরাজ মহিলারা বাল্যকাল হইতে একাকী রাস্তায় বেড়াইয়া নিজেরা নিজেদের শাসন করিতে শিখে এবং পিতা-

মাতাদির উদাহরণ দেখিয়া অতি অল্প বয়সেই নিজেদের মান রক্ষা করিতে অভ্যস্ত হয়। (স্ত্রীলোক ও পুরুষের মধ্যে এত মিশামিশি হয় যে, অপরিচিত পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সহিত দেখা বা অলাপ হইলে কাহারও মনে কোন দূষ্য ভাবের উদয় হয় না। এদেশে ভদ্র স্ত্রীলোক ও পুরুষে পরস্পর ভাই বোনের মত দেখে। পুরুষেরাও স্ত্রীলোকদিগকে হেয়জ্ঞান না করিয়া তাহাদের আদর ও সম্মান করে এবং কেহ তাহাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করিলে মহিলাদের পক্ষ সমর্থন করিয়া অবিনীত পুরুষকে শাসন করিতে উদ্যত হয়। পুরুষ স্ত্রীলোক অপেক্ষা বলবান্ সুতরাং পুরুষেরা স্ত্রীলোকের মান বজায় রাখিতে না জানিলে স্ত্রীস্বাধীনতা কখনই থাকিতে পারে না। এদেশে পুরুষেরা স্ত্রীলোকদের প্রতি অত্যাচার করিবার বিরুদ্ধে অনেক কঠিন আইন আছে। কোন পুরুষে স্ত্রীলোকের অনিচ্ছাক্রমে তাহাকে কোন মন্দ কথা বলিলে বা তাহার প্রতি কোন মন্দ আচরণ করিলে, সেই পুরুষের ভয়ানক শাস্তি হয়।

ভারতবর্ষীয় পুরুষেরা স্ত্রীলোকদের স্বাধীনতা দিতে ভয় পান, কারণ স্ত্রীরা বহুকাল অবধি পরাধীনা থাকাতে তাহাদের মন এত দুর্ব্বল ও তেজোহীন হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহারা স্বাধীন হইলে নিজেদের শাসন করিতে পারেন না। অবশ্য ইহা অনেকটা সত্য; কেহ অনেক বৎসর অধীন অবস্থায় থাকিয়া সহসা স্বাধীন হইলে কখনই স্বাধীনতার ঠিক ব্যবহার করিতে অথবা স্বাধীনতা বজায় রাখিতে পারে না। কিন্তু এক সময়ে না এক সময়ে সকলকেই শিখিতে হয়, শিশু একেবারে

চলিতে শিখে না, তাহাকে অনেকবার দেখাইয়া দিতে ও ধরিতে হয় এবং সে অনেকবার পড়িয়া যায়। আমাদের দেশের স্ত্রীদের বর্ত্তমান অবস্থা ঐরূপ। তাহারা এত দুর্ব্বল ও হীনাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে যে পুরুষেরা তাহাদের আদর করিয়া ধরিয়া না তুলিলে, তাহাদের অবস্থার কখনই উন্নতি হইবে না। এবং অল্প অল্প করিয়া তাহাদিগকে স্বাধীনতার পথে প্রবর্ত্তিত না করিলে তাহারা কখনই নিজেদের শাসন করিতে শিখিবে না বা স্বাধীন হইয়া বেড়াইতে পারিবে না। আবার দুই একজন অল্প শিক্ষিতা স্ত্রী স্বাধীনতা পাইয়া তাহার ব্যবহার না জানাতে বিপথগামিনী হইয়াছে বলিয়া দেশীয় লোকদের মনে আরো ভয় জন্মিয়াছে। কিন্তু দুই এক জনের এ রকম মন্দ দৃষ্টান্তে সমস্ত স্ত্রীজাতির প্রতি সন্দেহ করা জ্ঞানী পুরুষের কাজ নয়। কোন নূতন উদ্যমে একেবারে বা সম্পুর্ণরূপে সফল হওয়া যায় না, কতক বিফলতা ঘটিবেই ঘটিবে। ভয়ের পরিবর্ত্তে স্ত্রীলোকদের ভালরূপ শিক্ষা দিয়া স্বাধীনতা দিলে তাহারা স্পষ্ট দেখিতে পাইবে যে, হিন্দু-মহিলারা কোন অংশে ইংরাজ মহিলাদের হইতে হীন নয়।

এদেশের স্ত্রীলোকেরা বরাবরই স্বাধীন জীবনে নিজের মান রাখিয়া কিরূপে চলিতে হয় তাহা উত্তমরূপে জানে। ইহারা সকল সময়েই প্রকাশ্য স্থানে ও প্রকাশ্যভাবে পুরুষদের সহিত কথা কহে, খেলা করে ও গল্প করে, এবং বাল্যকাল হই-তেই জগতের নানাবিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করে, সেজন্য পাগ-লের মত হইয়া পুরুষকে স্বর্গীয় দেবতা ভাবিয়া সর্ব্বদা প্রণয় ও সুখস্বপ্নের চিন্তা করে না। ইহারা লেখা পড়া শিখে, নানা-

দেশে ভ্রমণ করে এবং পিতা ও ভ্রাতাদের নিকট থাকিয়া, সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে বন্ধুদের সহিত রাজনীতি, শাসন প্রভৃতি গূঢ় বিষয়ে কথোপকথন করিতে শুনে, সেজন্য ইহাদের গভীর চিন্তা ও ভালমন্দ বিবেচনা করিবার শক্তি জন্মে। আর ইহারা সাংসারিক কাজ, পুস্তকপাঠ ইত্যাদিতে অধিকাংশ সময় কাটায়; অলসতা ইহাদের মনে কুটিল ভাব জন্মাইয়া সর্ব্বনাশ করে না। অতএব এই সকল কারণে ইংরাজ মহিলারা যে সহজে অসৎপথাভিলাষিণী হয় না, তাহা সকলেরই বোধগম্য হইবে। ভারতীয় স্ত্রীরা সতীত্বের জন্য বিশ্ববিখ্যাত; এবং আমরা হিন্দুমহিলারা যেমন সতীত্বের জন্য প্রাণ দিতে ও স্বামীর অনুরাগে সমস্ত সংসার ত্যজিতে কিঞ্চিন্মাত্রও কুণ্ঠিত হই না, এরূপ এদেশে শুনা যায় না বটে তথাপি ইংরাজ মহিলারা স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম্ম সতীত্ব বজায় রাখিতে প্রাণপণে চেষ্টা করে।

স্ত্রীলোকদের মধ্যে এখানে অনেক রমণীরত্ন আছে। মিস মেরী কার্পেণ্টার, মিস্ ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেল, লেডি বেকার প্রভৃতি অনেক উচ্চশিক্ষিতা ইংরাজ মহিলার নাম বোধ হয় অনেকেই শুনিয়াছেন। মিস মেরী কার্পেণ্টার চিরজীবন অবিবাহিতা থাকিয়াও নিজের জ্ঞান ও বিদ্যাবলে দেশের কত উন্নতি করিয়াছেন। তাঁহার যত্নেই এদেশের কারাগৃহ ইত্যাদি অনেক স্থানের অবস্থা উন্নত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং অনেক স্ত্রীসভাও তাঁহার সাহায্যে স্থাপিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডাগত যুবকদের হিত সাধনের জন্য মিস মেরী কার্পেণ্টার কর্ত্তৃক এক সভা স্থাপিত হইয়াছিল, উহা এখনও চলিতেছে

এবং উহা হইতে অনেক উপকার দর্শিয়াছে। ভারতবর্ষের স্ত্রীশিক্ষার জন্য তিনি যে যথেষ্ট চেষ্টা পাইয়াছিলেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। মিস ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেল ক্রিমিয়া যুদ্ধের সময় নির্ভয়ে সৈন্যশিবিরে থাকিয়া আহত সৈন্যদের পরিচর্য্যা করিয়া যে কত সাহসিকতা ও স্ত্রীসুলভগুণের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার বিষয় শুনিয়া এমন কোন লোক নাই, যিনি আশ্চর্য্য ও স্তম্ভিত না হন।

এই সকল বিখ্যাত স্ত্রীলোক বিবাহিত হইয়া অন্যের দ্বারা চালিত না হইলেও আত্মসাহায্যে ও আত্মবলে পৃথিবীর কত উপকার করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে কেমন আহ্লাদ হয়। কিন্তু আমাদের দেশে অবিবাহিতারা দূরে থাকুক, বিবাহিতারা পর্য্যন্ত দেশের মঙ্গল সাধনে অগ্রসর হন না। ইংরাজ স্ত্রীলোকেরা, বিবাহ না হইলে বা বিধবা হইলে, জীবনকে নিরর্থক না ভাবিয়া যতদূর সাধ্য মানুষের জীবনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধিতে চেষ্টা করে। অন্যের সাহায্যে অনেকে অনেক কাজ করিতে পারে, কিন্তু যাঁহারা নিজে নিজের সহায় হইয়া নিজ বিবেকশক্তির দ্বারা পৃথিবীর উপকার করিতে পারেন ও অগ্রসর হন, তাঁহাদের জীবন যে কত বহুমূল্য তাহা আমরা ভাবিতে পারি না।

বিবাহিতা স্ত্রীলোকদের মধ্যেও যথার্থ পতিব্রতা ও পতির সহায় স্ত্রী এই জাতিতে অনেক দেখিতে পাই। স্ত্রীস্বাধীনতা থাকিলেও বিশ্বাসী ও স্বামীর অনুবর্ত্তিনী স্ত্রীদের অভাব নাই। লেডি বেকার এই সকল পতিব্রতা স্ত্রীদের মধ্যে এক জন প্রধান। যে সকল মরুভূমিতে যাইতে পুরুষেরা পর্য্যন্ত সাহস

করে না, তিনি স্ত্রীলোক হইয়াও স্বামীর সহিত নির্ভয় চিত্তে তথায় বাস করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনিও স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে আফ্রিকার সেই ভয়ঙ্কর মানুষের অগম্য মরুভূমিতে নূতন নূতন হ্রদ ও নদীর আবিষ্কারের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেন, এবং সেই আত্মীয়পরিজনহীন স্থানে তিনিই স্বামীর একমাত্র সহায় হইয়াছিলেন। তিনি সাহসাদি পুরুষোচিত গুণের সহিত স্ত্রী-লোকের উপযুক্ত সমস্ত সদ্গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। লেডি ব্র্যাসি আর একটি গুণসম্পন্ন রমণীরত্ন। ইনি ক্রমাগত প্রায় দেড় বৎসর স্বামীর সহিত সমুদ্রে বেড়াইয়া বেড়াইয়া নানা প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এই মহোদয়া স্ত্রী নিজের ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে অনেক পুস্তক লিখিয়া নিজের কীর্ত্তি অক্ষয় করিয়া রাখিতেছেন। ইঁহার জীবনচরিত পড়িলে হৃদয় আনন্দিত হয় এবং মন প্রশস্ত ও সৎকর্ম্মে উৎ-সাহিত হয়।

---

১

আয় বোন! সবে পিঞ্জর কাটিয়ে,
প্রিয় ভ্রাতাগণে অথবা বুঝায়ে
খুলে দিতে বল, পায়ের শিকল,
যাহে বঙ্গবালা আছে বাঁধা হয়ে।

২

দেখে যাও হেথা স্বাধীন জীবনে
জর্ম্মণ, ফরাসী, ব্রিটন ললনে,
প্রফুল্লতাময়, সতেজ হৃদয়
হীন অশ্রুজল ধরে না নয়নে।

৩

দ্যাখ, পুরুষেরা স্ত্রীলোক বলিয়ে
নাহি করে হেলা "অকেজ" ভাবিয়ে ;
পশুর মতন, নারীর জীবন,
"অন্দর পিঞ্জরে" রাখে না পুরিয়ে।

৪

য়ূরোপ দেশেতে যাইরে যথায়,
দেখি নারীগণ পুরুষের প্রায়,
কিন্তু বিপরীত দুর্ভাগ্য ভারতে
মহিলারা সদা পদানত হায় !

৫

আর কতকাল গৃহ-কারাগারে
থাকিবে রে সবে বন্দীর মতন,
না জানি কি গেল, কোথায় কি হলো
জগতে অথবা ভারত মাঝারে।

৬

থাক প্রফুল্লিত গুটিকত ঘরে,
অভিহিত বলি "অন্দর মহল" ;
গৃহকার্য্য বিনা, কিছুই দেখনা,
জাননা তাহাও কে আসে সদরে।

৭

এই দ্যাখ হেথা যত নারীগণে
সংসারের কাজ করে সযতনে,
কিন্তু অবসর, পাইলে আবার,
যায় ইচ্ছামত সভাতে, উদ্যানে।

৮

থাকে না ভূষিত এদের হৃদয়
সীমাবদ্ধ গৃহে, কেমনে বা রয়?
উন্নত জীবনে, স্বাধীনতা বিনে,
পারেনা মানব জীবিতে ধরায়।

৯

সে উন্নতিবল আমাদের নাই,
অধীনতাপাশে আবদ্ধ সদাই,
থাকি অন্যমনা, কেলেশ দেখিনা,
সুখে মগ্নভাবে জীবন কাটাই।

১০

পেয়েছ ভগিনি! সুন্দর হৃদয়
সতীত্ব, নম্রতা, বিনয়ে ভূষিত,
কিন্তু সে প্রভাবে, কেবল না হবে,
ত্বরা করি কর, সাহস আশ্রয়।

১১

বলে সবে বোন! বঙ্গবালাগণ
দুর্ব্বলহৃদয়া, তাই ভাই যত
ভারততনয়, কুণ্ঠিত সতত,
দিতে আমা সবে স্বাধীন জীবন।

১২

তাই বলি, উঠ, তাঁহাদের ভ্রম
ঘুচাইতে সবে হও অগ্রসর,
বাঁধ শৌর্য্যবস্ত্রে হৃদয়কোমর,
ধাঁধাও সকলে বিজলীর সম।

১৩

কেটেছি বন্ধন, তবুও ভগিনি!
পাইনা যে সুখ তোমাদের বিনা,
অই অশ্রুপূর্ণ বিরস বদন
দেখিবারে পাই দিবসযামিনী।

১৪

বারেক যদিরে পাও এ আস্বাদ
অধীন জীবনে স্বাধীনতাসুখ,
থাকিতে না চাবে আর কারাগৃহে
ঢাকিবে না আর ঘোমটাতে মুখ।

১৫

সত্য লজ্জা নাই মুখ আচ্ছাদনে,
কেবল মোদের হৃদয়ের ভ্রম ;
তাই বলি পুনঃ উঠরে সত্বরে
কাটাওনা কাল মিথ্যা ভয়সনে॥

———

# একাদশ অধ্যায়।

## রাজবাটী—ক্লব—যাদুঘর—নাট্যশালা—মদ্যশালা—ইত্যাদি।

লণ্ডন যে কত প্রকাণ্ড ও ঐশ্বর্য্যশালী তাহা ইহার রাজবাটী, বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ও সাধারণ স্থান ইত্যাদি দেখিলেই বুঝা যায়। এখানে সর্ব্বশুদ্ধ আট নয়টী রাজবাটী আছে; ইহাদের মধ্যে যেটীতে মহারাণী ভিক্টোরিয়া লণ্ডনে বাস করিবার সময় অবস্থান করেন, সেইটীর নাম "বকিংহাম প্যালেস"। এই অট্টালিকা প্রায় ষাট বৎসর হইল নির্ম্মিত হইয়াছে এবং ইহার নির্ম্মাণে প্রায় এক কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। বকিংহাম প্যালেস লণ্ডনের দক্ষিণ পশ্চিম ভাগে স্থিত; ইহার চারিদিকে প্রশস্ত উদ্যান এবং ইহা দূর হইতে দেখিতে একটী অতিশয় উচ্চ ও বিশাল ভবন কিন্তু বাটীর বহির্ভাগে বিশেষ কোন শোভা দেখিতে পাই না, তাহার উপর আবার এই লণ্ডনের ধোঁয়া ও ময়লাতে কোন বাড়ীই সাদা থাকিতে পায় না। এই রাজবাটীর ভিতরে যে কত উৎকৃষ্ট ও বহুমূল্য দ্রব্য আছে তাহা এই পুস্তকে লিখিবার প্রয়োজন নাই। সকলেই জানেন যে রাজা রাণীদের কাণ্ড কারখানা অতি বড় রকমের, কিন্তু তথাপি বোধ হয় ইংলণ্ডেশ্বরীর রাজপ্রাসাদ যেরূপ হওয়া উচিত, ইহা তত জাঁকজমকের নয়।

এখানকার বৃহৎ অট্টালিকাসমূহের মধ্যে পার্লিয়ামেণ্টগৃহ অতি উৎকৃষ্ট। ইহা মহারাণীর রাজবাটী হইতে অতি অল্প

দূরে টেম্‌স নদীর তীরে অবস্থিত। পার্লিয়ামেণ্টগৃহ অতিশয় প্রকাণ্ড, প্রায় চব্বিশ বিঘা ভূমি ব্যাপিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ইহা পাথরের নির্ম্মিত; এই অট্টালিকা নির্ম্মাণে সাড়ে তিন কোটি টাকা খরচ হইয়াছিল। ইহার নির্ম্মাণরীতি বিলক্ষণ কৌশল ও চাতুর্য্যের পরিচয় দিতেছে, বিশেষ নদীতীর-বর্ত্তী হওয়াতে এই গৃহ অতীব রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে। সম্ভ্রান্ত ও সামান্য লোকদের সভাগৃহ ব্যতীত ইহার ভিতরে রাজমন্ত্রীদের মন্ত্রণাঘর, পুস্তকাগার ইত্যাদি অনেক বড় বড় ঘর আছে। সম্ভ্রান্তদের গৃহে একটী সুসজ্জিত সিংহাসন আছে, কখন কখন মহারাণী নিজে এই সিংহাসনে বসিয়া সভা আহ্বান করেন। বৎসরের মধ্যে প্রায় সাত মাস পার্লিয়ামেণ্ট সভার অধিবেশন হয়, সেই সময়ে গৃহের ভিতর যাইতে হইলে কোন সভ্যের অনুমতি লইতে হয়, কিন্তু সর্ব্ব-সাধারণের তর্ক শুনিবার স্থান অতি অপ্রশস্ত বলিয়া ঐ সময়ে অল্প লোকেরই ভাগ্যে ইহার ভিতরে যাওয়া ঘটে। যখন সভার অধিবেশন না হয় তখন সহজেই ভিতরে গিয়া এই বাটীর চারিদিক উত্তমরূপে দেখা যায়। পার্লিয়ামেণ্ট গৃহের ছাদের উপর অনেকগুলি চূড়া উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে সর্ব্বা-পেক্ষা উঁচু চূড়াটীর উপরিভাগে একটী প্রকাণ্ড ঘড়ী আছে। এই ঘড়ীর চারিদিকে চারি মুখ কিন্তু এক কল; অন্ধকার হইলে উহার ভিতরে আলো দেয় এজন্য অনেক দূর হইতে ঘড়ীর কাঁটা দেখা যায়। ইহার বাজনা দিনের বেলায় প্রায় দুই ক্রোশ দূর হইতে শুনা যায় এবং রাত্রিতে লণ্ডনের প্রায় সব স্থানেই ইহার ঢং ঢং শব্দ শ্রুতিগোচর হয়।

পার্লিয়ামেণ্ট গৃহ হইতে কতকদূর পর্য্যন্ত টেম্‌স নদীর তীর অতি সুন্দররূপে পাথর দিয়া বাঁধান আছে। নদীর উপরেই অতি পরিষ্কার চলাপথ, তাহার উপর মধ্যে মধ্যে বসিবার বেঞ্চী আছে এবং রাত্রিতে এই স্থান বৈদ্যুতিক আলো দ্বারা আলোকিত হয়। গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যার সময় এইখানে বেড়াইতে অতিশয় আরাম এবং এই স্থান হইতে লণ্ডনের ভিতর টেম্‌স নদীর দৃশ্য উত্তমরূপে দেখা যায়। নদীর উপর কত শত নৌকা চলিতেছে, আর ছোট ছোট কলের জাহাজ করিয়া কত লোক যাতায়াত করিতেছে; আবার উপরে অনেক সুগঠিত পোল, তাহার উপর কত লোক ও গাড়ী চলিতেছে। কলিকাতায় গঙ্গার উপর কেবল একটি পোল কিন্তু সমস্ত লণ্ডনে টেম্‌স নদীর সতরটী পোল আছে, প্রায় প্রতি দুই শত হাত অন্তরে একটী করিয়া পোল; তাহার মধ্যে গুটিকতকের উপর কেবল কলের গাড়ী চলে। সম্মুখে অপর পারের দিকে চাহিয়া দেখ, কত বাড়ী ও কারখানা রহিয়াছে এবং নদীর উপরে ও পারে লোকদিগের নিরীক্ষণ করিলে দেখিতে পাইবে যে তাহারা নড়িতেছে—চলিতেছে, সকলেই ব্যস্ত—সকলেই কোন না কোন কাজ করিতেছে।

(লণ্ডনের পাশের কাচের বাড়ীর কথা বোধ হয় অনেকে শুনিয়াছেন। এই "ক্রিষ্টল" প্যালেস বা কাচভবন লণ্ডনের দক্ষিণ দিকে তিন ক্রোশ দূরে স্থিত।) ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বজাতীয় মেলার জন্য ইহা খোলা হইয়াছিল এবং ইহার নির্ম্মাণে দেড় কোটি টাকার উপর খরচ পড়িয়াছিল। বাটীর চারিদিকে অতি চমৎকার বাগান আছে, ইহা বিস্তারে প্রায় ছয়

শত বিঘা; এই উদ্যানে অনেক কৃত্রিম প্রস্রবণ ও জলপ্রপাত আছে এবং গ্রীষ্মকালে নানা প্রকার ফুল ও বৃক্ষ লতাদির দ্বারা সুশোভিত হইয়া ইহা অতি মনোহর শোভা ধারণ করে। কথিত আছে, ইহার মত প্রশস্ত ও উৎকৃষ্ট উদ্যান ইউরোপের অন্য কোন দেশে নাই। বাড়ীটী দূর হইতে দেখিলে পরিনির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়। চারিদিকেই কাচ, ছাদও কাচ নির্ম্মিত এবং গোলাকার ও খিলান করা, মধ্যে চূড়া উঠিয়াছে। আবার রাত্রিতে যখন সমস্ত অট্টালিকা ও উদ্যান গ্যাস বা বৈদ্যুতিক আলো দ্বারা দীপ্তিমান হয়, তখন মনে হয় বাল্যকালে 'আরব্য উপন্যাসে' যে সকল স্বর্গীয় অট্টালিকার বিষয় পড়িয়াছিলাম, এখন সত্য সত্যই তাহা দেখিতেছি। শুনিয়াছি এই গৃহ নির্ম্মাণ করিতে কাচ ও লোহা ভিন্ন অন্য কোন জিনিস ব্যবহৃত হয় নাই। যদিও ইহা কাচের দ্বারা আচ্ছাদিত তথাপি এই কাচভবন অন্যান্য পাথর বা ইট নির্ম্মিত বাড়ীর ন্যায় ঝড় ও বৃষ্টিসহ; এখানে রবিবার ছাড়া প্রত্যহ বাজনা, ছোট ছোট নাটক ও প্রহসনের অভিনয়, ফুলের ও জন্তুর মেলা এবং অন্যান্য নানা প্রকার আমোদের দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, আর গ্রীষ্মকালে বাগানের উপর অতি চমৎকার আতসবাজী হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত বাড়ীর ভিতরে কাচের বাক্সতে মাছ, খেলানা জিনিস ইত্যাদি অনেক প্রকার দেখিবার সামগ্রী আছে।

মহারাণীর পরলোকগত স্বামী প্রিন্স আলবার্টের যত্নে অনেক উত্তম উত্তম গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে 'আলবার্ট হল' অতিশয় প্রসিদ্ধ। ইহা ঠিক গোলাকার এবং

এত প্রশস্ত যে ইহার ভিতরে আট হাজার লোক অনায়াসে বসিতে পারে; ইহার ছাব্বিশটা দরজা এবং রাত্রিতে এখানে পাঁচ হাজার গ্যাসের আলো জ্বলে। এই গৃহমধ্যে প্রায়ই অতি উৎকৃষ্ট একতান বাদ্য হইয়া থাকে। লণ্ডনের প্রধান বিচারালয়, কর্ম্মালয় ইত্যাদি অট্টালিকা গুলি কলিকাতার ঐ ঐ বাড়ীগুলি অপেক্ষা বৃহৎ বটে কিন্তু বহির্ভাগ ধূম্রবর্ণ হওয়াতে এখানে বাটীগুলার বাহার খুলে না, আর আমাদের দেশের চূণথাম করা ও সবুজবর্ণ ঝিলমিলি ওয়ালা উত্তম উত্তম অট্টালিকার মত এদেশে কোন বাড়ীরই শোভা নাই।

লণ্ডনের পশ্চিমভাগে অনেকগুলি বড় বড় বাড়ী আছে, ইহাদের ইংরাজীতে 'ক্লব' বলে। এই গুলি অনেক লোকের মিলন-স্থান, কিন্তু আমাদের দেশের সভার মত নয়। এখানে সংবাদপত্র, পুস্তকাদি পড়িবার, আহার করিবার ও রাত্রিযাপন করিবারও বিলক্ষণ সুবিধা আছে। লণ্ডনে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় পঞ্চাশটা ক্লব আছে, তাহার মধ্যে 'এথিনিয়ম ক্লব, সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও প্রসিদ্ধ। ইহা বাহির হইতে দেখিতে একটী রাজবাটীর ন্যায়। ইহাতে অনেকগুলি ভাল সাজান ঘর আছে এবং এখানে অনেক ভদ্র ও সাবধান চাকর থাকে। আরাম ও বাবুয়ানার জন্য ইউরোপে যতপ্রকার দ্রব্য আছে এবং যে সকল জিনিস ভদ্রলোকের আবশ্যক হয়, সে সমুদায়ই এই ক্লবে পাওয়া যায়। ইহার পুস্তকাগারে প্রায় পঞ্চাশ হাজার পুস্তক আছে এবং ইহার পড়িবার ঘরটি অতিশয় বৃহৎ ও চমৎকার; ইহাতে এদেশের প্রায় সমস্ত সংবাদপত্র, ও মাসিক পত্রিকা এবং বিদেশেরও

প্রধান কাগজগুলি পড়িতে পাওয়া যায়। রাত্রিতে সমস্ত বাড়ীতে অতি উত্তম আলো দেয়, ইচ্ছা হইলে দিবারাত্রির মধ্যে সময়মত সেখানে গিয়া কাগজ ও বই পড়িতে পার; ক্ষুধা পাইলে যাহা ইচ্ছা খাইতে পার এবং ইহা ছাড়া বন্ধুদের সহিত গল্প করিবার ও বিলিয়ার্ড, তাস ইত্যাদি খেলা করিবার বিলক্ষণ সুবিধা আছে। এক কথায় এখানে শারীরিক ও মানসিক আরামের কোন ত্রুটি নাই। (ইংরাজজাতি যে কেমন সুখ ও আরাম বুঝে তাহা এই সকল ক্লব দেখিলেই জানিতে পারা যায়; ইহারা আরাম পাইবার নিমিত্ত অকাতরে শত শত টাকা ব্যয় করিবে—কোন বিষয়ে সুখসচ্ছন্দতাহীন হইয়া থাকিতে পারে না।) ক্লবের সভ্য হইতে হইলে ইহার নাম ও খ্যাতি অনুসারে বৎসরে পঞ্চাশ টাকা হইতে দুই শত টাকা পর্য্যন্ত এবং কোথাও কোথাও তিন শত বা চারি শত টাকা চাঁদা দিতে হয়। প্রায় সকল গুলিতেই অনেক সভ্য আছে, কোন কোনটিতে আট শত বা এক হাজার পর্য্যন্ত সভ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ক্লবের সুখ আমাদের দেশে কেন—ইংলণ্ড ব্যতীত অন্য কোন দেশেই জানে না বলিলেই হয়! ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে ইংরাজেরা পরস্পর মিশিতে বা কথা কহিতে বড় ভাল বাসে না কিন্তু এদেশেই ক্লব, সভা ও কোম্পানীর ছড়াছড়ি দেখিতে পাই।

ব্রিটিশ মিউজিয়ম লণ্ডনের একটী প্রধান দৃশ্য; ইহা নগরের মধ্যভাগে স্থিত। এখানে কলিকাতার যাদুঘরের মত নানাপ্রকার পুরাকালের দ্রব্য আছে। ইহার ভিতরে প্রবেশ করিয়াই দুই পাশে অনেক মিশরদেশীয়, আসিরীয়, ভারতবর্ষীয়

দেবতা ও বীরদিগের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সম্মুখেই একটী প্রকাণ্ড পাথরে খোদা ইন্দ্রের অমরাবতী সভা রহিয়াছে। কি আশ্চর্য্য! আমরা এখন এই সকল প্রতি-মূর্ত্তিকে অবহেলা করি, কিন্তু এগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে পুরাকালের লোকদের কারুকর্ম্মের শক্তি জানা যায় এবং তাঁহাদের আচার, ব্যবহার ও ইতিহাস শিখা যায়। এই সকল এক সময়ে হিন্দুদের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল ও তাঁহাদের দ্বারাই রক্ষিত ছিল কিন্তু সময়ক্রমে হিন্দুদের তেজ ও বলের সহিত এই প্রতিমূর্ত্তিসকলও লয় পাইয়াছিল। কর্ম্মক্ষম ইংরাজেরা অতি যত্নের সহিত ঐগুলি আবার সংগ্রহ করিয়াছে। ইহারা আসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকার অনেক দেশ হইতে নানাপ্রকার অতি পুরাতন ও আশ্চর্য্য দ্রব্য অনেক টাকা ব্যয় করিয়া এখানে আনিয়া রাখিয়াছে। পূর্ব্বে হিন্দুরা কিপ্রকার বর্ম্ম পরিত, কিপ্রকার অস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিত, কি রকম মাটীর বাসন লইয়া পূজা করিত, কিরূপ দ্রব্য ও কাপড় ব্যবহার করিত—এই সকল দেখিতে কোন্ ভারতবর্ষীয়ের মনে না কৌতূহল ও আনন্দের উদয় হয়? এখানে পুরাণ জিনিস ব্যতীত বিজ্ঞান, শিল্পকর্ম্ম ও সাহিত্য সম্বন্ধীয় অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে এখানে নানাদেশের জন্তুর অস্থি, কঙ্কাল ও খড় পোরা আকৃতি ছিল কিন্তু সেগুলি এখন আর একটি যাদুঘরে লইয়া গিয়াছে।

ঐ সকল উপরি লিখিত দ্রব্য ভিন্ন ব্রিটিশ মিউজিয়মে একটি চমৎকার পুস্তকাগার ও পাঠঘর আছে। পূর্ব্বে লোকে

এখানে কেবল জিনিস দেখিয়া আনন্দলাভ করিত, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে পড়িবার ঘর নির্ম্মিত হইবার পর অনেক ভদ্রলোক বিনা ব্যয়ে ও নিজ যত্নে যাহা ইচ্ছা পড়িতে পায়। এখানে যে কত প্রকার, কত বিষয়ের ও কত ভাষার পুস্তক আছে তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়; সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় দুই কোটি পুস্তক আছে, এবং প্রতি বৎসরে এই সংখ্যার আরও বৃদ্ধি হইতেছে। শুনিয়াছি ফ্রান্সের রাজধানী পারিস নগরের জাতীয় পুস্তকশালাতে ব্রিটিশ মিউজিয়মের অপেক্ষা অধিক পুস্তক আছে কিন্তু সেখানে পড়িবার এমন সুবিধা নাই এবং এত ভিন্ন রকমেরও পুস্তক নাই। পাঠঘরটি অতিশয় প্রকাণ্ড, ইহাতে প্রায় পাঁচ শত লোকের বসিবার জন্য আয়োজন আছে। ইহা ঠিক গোলাকার এবং ছাদটী ঘসা কাচ নির্ম্মিত ও গম্বুজের মত। ঘরের মধ্যখানে পুস্তক লইবার ও ফিরিয়া দিবার স্থান, সেইখানে কর্ম্মচারীরা থাকে; তাহার চারি পাশে পাঠকদিগের বসিবার স্থান সুতরাং কাহারও বসিবার স্থান মধ্যভাগ হইতে দূর নয়। ঘরের চারিদিগে দেয়ালের উপর থাক্ থাক্ করিয়া তিন তোলা অবধি রাশি রাশি বহি সাজান রহিয়াছে। প্রত্যেক পাঠকের বসিবার জন্য আলাদা চৌকী ও সম্মুখে আড়াল দেওয়া টেবিল আছে, সেজন্য পরস্পরের পড়িবার কোন ব্যাঘাত হয় না। চৌকী ও টেবিল গুলি চামড়া দিয়া ঢাকা ও অতি পরিষ্কার এবং প্রত্যেকের জন্য দোয়াত, কলম, ব্লটিং ও কলম মুছিবার ব্রস আর টুপি রাখিবার স্থান আছে। প্রত্যেক বসিবার স্থানের এক একটী নম্বর আছে; কোন বহি আনিয়া পড়িতে ইচ্ছা করিলে একটি

ছোট ছাপান কাগজে পুস্তকের নাম, পুস্তকতালিকায় তাহার যে সংখ্যা লিখিত আছে সেই সংখ্যা, গ্রন্থকারের নাম, পাঠকের নাম ও বসিবার স্থানের নম্বর লিখিয়া ঐ ছাপান কাগজটি মধ্যস্থানের আফিসে দিয়া আসিতে হয়, এবং কিছুক্ষণ পরে মিউজিয়মের একজন পরিচারক পাঠকের নিকট সেই পুস্তক আনিয়া দেয়। ইচ্ছা করিলে অনেক পুস্তক এ রকম করিয়া আনাইতে পারা যায়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত পাঠক মধ্যস্থানে গিয়া বহি ফিরাইয়া দিয়া আবার সেই ছোট কাগজটি না লইয়া আসেন, ততক্ষণ তিনি ঐ পুস্তকের জন্য দায়ী থাকেন। স্ত্রীলোকদের পড়িবার জন্য স্বতন্ত্র স্থান আছে কিন্তু তাঁহারা ইচ্ছামত সর্ব্বত্রই বসিতে পারেন। একুশ বৎসর পূর্ণ না হইলে কেহ এই পাঠ গৃহে গিয়া পড়িতে পায় না, কেবল পরিচিত ও ভদ্রলোকদেরই এখানে পড়িবার নিমিত্ত অনুমতি দেওয়া হয়।

ব্রিটিশ মিউজিয়ম ব্যতীত লণ্ডনে আরো সাত আটটি মিউজিয়ম আছে, তাহার মধ্যে 'সাউথ কেনসিংটন মিউজিয়ম' অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ, এখানে শিল্প-কর্ম্ম সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার চমৎকার দ্রব্য আছে। অন্যান্য যাছুঘরগুলি ইহাদের মত এত বড় ও প্রসিদ্ধ নহে।

কলিকাতায় কেবল দুই তিনটি হাঁসপাতাল আছে কিন্তু লণ্ডনে বড় বড় ষোলটি হাঁসপাতাল আছে। । সকলগুলিই রোগীতে পূর্ণ এবং সকলগুলিই সাধারণ লোকের দাতব্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। লণ্ডনে যে ছোট বড় কত গির্জ্জা আছে তাহার সংখ্যা নাই; আমার বোধ হয় গণিলে সমস্ত

লণ্ডনে প্রায় পাঁচ হাজার গির্জ্জা হইবে, ইহাদের মধ্যে 'সেণ্ট পলস্ কেথিড্রাল' ও 'ওয়েষ্টমিনিষ্টার আবি' সর্ব্বপ্রধান।

সেণ্টপলস্ কেথিড্রালের গঠন অতিশয় চমৎকার, ইহা নির্ম্মিতে পঁয়ত্রিশ বৎসর লাগিয়াছিল এবং ইহা প্রস্তুত করিতে প্রায় আশি লক্ষ টাকা খরচ পড়িয়াছিল। ইহা লম্বে তিন শত চল্লিশ হাত, প্রস্থে এক শত ষাট হাত এবং বেড়ে চৌদ্দ শত হাত। এই গির্জ্জার ছাদের উপর উঁচু গম্বুজ এবং তাহার উপর একটি চূড়া আছে; এই চূড়াটি মাটি হইতে দুই শত পঞ্চাশ হাত উঁচু। এই গির্জ্জাটি অনেক দূর হইতে দেখা যায় এবং ইহার উপর হইতে সমস্ত লণ্ডন নগর সুন্দররূপে দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার ভিতরে একটি ফুস্ ফাস্ করিবার কামরা আছে, সেখানে অতি আস্তে আস্তে ফুস্‌ফাস্ করিয়া কথা কহিলেও ঘরের চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনিত হওয়াতে স্পষ্ট শুনা যায়। ওয়েষ্টমিনিষ্টার আবি আর এক রকম ধরণে নির্ম্মিত এবং ইহার বহির্ভাগ দেখিতে অতি সুন্দর। ইহা সেণ্টপলস্ কেথিড্রাল অপেক্ষা অনেক ছোট; ইহার ভিতরে ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান লোকদের কবর ও কীর্ত্তিস্তম্ভ আছে।

লণ্ডনে প্রায় ত্রিশটি নাট্যশালা আছে; রবিবার ভিন্ন সপ্তাহের প্রতিদিনেই এই গুলিতে নাটকের অভিনয় হয়। ইহাদের মধ্যে গুটিকতক অতি প্রকাণ্ড, প্রায় তিন চারি হাজার লোক ধরে। অধিকাংশ নাট্যশালাই অতিশয় সুন্দররূপে নির্ম্মিত ও সাজান। লণ্ডনে প্রত্যহ যে কত প্রকার নাটক ও প্রহসনের অভিনয় হয় তাহার ঠিক নাই; আর যে নাট্যশালাতেই যাও, সেই খানেই ভিড়, কোথা হইতে যে এত

রাশি রাশি লোক অভিনয় দেখিতে আসে তাহা নির্ণয় করা ভার। নাট্যশালা ভিন্ন এখানে অনেকগুলি বৃহৎ বাদ্যশালা আছে, সেখানে প্রায়ই ভাল ভাল ঐকতান বাদ্য হইয়া থাকে। এই সকল ছাড়া লণ্ডনে আবার অনেকগুলি গানবাড়ী আছে, সেখানে গানই বেশি হয় তাহার সঙ্গে বাজনা হয়, কিন্তু শুনিয়াছি এই গুলিতে মদের প্রাদুর্ভাব অধিক এবং ভাল মন্দ নানা রকমের লোক যায়।

নাঠ্যশালা, বাদ্যশালা ও গানবাড়ী ব্যতীত লণ্ডনে আরো অনেক প্রকার ছোট ছোট আমোদের স্থান আছে। পয়সা থাকিলে লণ্ডনে আমোদের ভাবনা নাই; কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি স্ত্রীলোক, কি পুরুষ এমন কেহই নাই যে এই লণ্ডনের কোন না কোন স্থানে গিয়া আমোদ করিয়া দিন কাটাইতে পারে না। এখানকার ছোট ছোট আমোদস্থানের মধ্যে একটি বড় মজার রকমের ঘর আছে। ইহার ভিতরে নানা দেশের আগেকার এবং এখনকার বিখ্যাত লোকদের প্রতিমূর্ত্তি আছে, এইগুলি কেবল মোমের নির্ম্মিত এবং রাজা রাণী প্রভৃতি বড় বড় লোকদের প্রতিমূর্ত্তিগুলি অতি সুন্দর বেশে সজ্জিত আর এমন চমৎকার রং ও গঠনের, যে একটু একটু অন্ধকারে মনে হয় যেন ঠিক জীবন্ত লোক দাঁড়াইয়া আছে। এখানে একটি ঘর আছে তাহাকে "বীভৎসের ঘর" বলে। ইহার ভিতর যত ডাকসাইটে হত্যাকারী, জালকারী ইত্যাদির প্রতি-মূর্ত্তি আছে; ইহাদের মধ্যে আমাদের দেশের নানা সাহেব মোমের আকার ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সত্য সত্যই কি নানা সাহেব দেখিতে এরূপ ছিলেন তাহা বলিতে পারি

না, যাহা হউক ইংরাজেরা তাঁহাকে একটি ভয়ঙ্কর হত্যাকারী বলিয়া গণনা করে, সেইজন্যই এখানে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছি। এ স্থানটি প্রথমে একজন ফরাসী স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল, সেই ফরাসী স্ত্রীলোক "মাডাম টুসোর" নামে ইহা চলিয়া আসিতেছে; এখানে সে বৃদ্ধারও একটি চমৎকার প্রতিমূর্ত্তি আছে। বোধ হয়, শীতের দেশ বলিয়াই এখানে ঐরূপ মোমের মানুষ গড়িয়া রাখিতে পারে, আমাদের দেশে হইলে সব গলিয়া বিকৃত হইয়া যাইত।

লণ্ডনে হোটেলের ভাবনা নাই; যাহার যে রকম সঙ্গতি সে সেই রকম হোটেলে গিয়া থাকিতে পারে; কোনটিতে বা দিনে তিন টাকা খরচ পড়ে, এবং কোনটিতে বা দশ টাকা করিয়া ব্যয় পড়ে। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি দেখিতে অতি প্রকাণ্ড, কোন কোনটি আট দশ তোলা উঁচু এবং সেই রকম চওড়া, আর ভিতরে পাঁচ ছয় শত ঘর আছে; কতকগুলি রাণীর রাজপ্রাসাদ অপেক্ষাও বৃহদাকার। এখানে অনেকগুলি দোকান আছে, সেথায় সব সময়ে গিয়া যাহা ইচ্ছা আহার করিতে পাওয়া যায়। রাস্তায় চলিতে চলিতে কিম্বা বাড়ীতে সুবিধা না হইলে যখন ইচ্ছা সেখানে গিয়া রাঁধা জিনিস খাইতে পার। অবশ্য এরকম আহার করিলে ঘরের অপেক্ষা অধিক খরচ পড়ে কিন্তু কেমন সুবিধা ও আরাম। এই দোকানগুলিকে ইংরাজীতে "রেস্‌টোরাণ্ট" বলে; এ কথাটি ফরাসী এবং এরূপ বাহিরে খাবার বন্দোবস্ত ফ্রান্স হইতে আসিয়াছে।

এই অধ্যায়ে অনেক বড় বাড়ী, অট্টালিকা, প্রাসাদ ইত্যা-

দির বিষয় বলিয়াছি, এইবার সুরাদেবীকে উৎসর্গীকৃত গৃহগুলির কথা বলিয়া শেষ করিব। এই মদের দোকানগুলিকে ইংরাজীতে "পব্লিক হাউস" অর্থাৎ সাধারণবাড়ী বলে; এবং এইগুলিতে "জিন" "ব্রাণ্ডি" প্রভৃতি মদ অধিক বিক্রয় হয় বলিয়া অনেকে ইহাদের "জিনপ্যালেস" বা জিনের রাজবাড়ী কহিয়া থাকে। লণ্ডনে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ছয় হাজার নিয়মমত লাইসেন্স করা মদের দোকান আছে, এবং ইহা ছাড়া সাধারণের মদ্যপান করিবার নিমিত্ত আরো অনেক রকম স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। গির্জ্জা অপেক্ষা মদের দোকানের সংখ্যা অনেক অধিক এবং এখানে এমন পাড়া নাই যেখানে তুই তিনটি করিয়া পবলিক হাউস দেখিতে পাওয়া যায় না। এই মদের দোকানগুলি বেশ বড় বড় এবং রাত্রিতে সকল দোকান অপেক্ষা ইহাদের বেশী বাহার; রাত্রি নয় দশটার সময় অন্যান্য সব দোকান বন্ধ হয় কিন্তু এগুলি রাত তুইপ্রহর পর্য্যন্ত খোলা থাকে। মদের দোকানের বড় বড় ঝক্‌মকে কাচের জানালা ও বাহিরে অনেক গ্যাসের আলো দেখিয়া চোক ঝল্‌সিয়া যায়; দোকানের সম্মুখের রাস্তা আলোতে আলোময়, এবং ভিতরদিকে চাহিলে দেখিতে পাইবে যে বাহিরের মত ভিতরভাগও অতিশয় ঝক্‌ঝকে। ঘরের ছাদ হইতে চমৎকার চমৎকার গ্যাসের ঝাড় ঝুলিতেছে এবং চারিদিকে ডাল পালা ও দেয়ালগিরি করিয়া কত গ্যাসের আলো রহিয়াছে। ঘরের আসবাব সবই অতি উত্তম রকমে নির্ম্মিত ও সুন্দররূপে পালিস করা, আর টেবিলের উপরে মার্ব্বল পাথর বসান। টেবিলের পশ্চাতে গুটিকতক ফুট্‌ফুটে পোষাক পরা

অল্পবয়স্কা স্ত্রী দু চার পয়সার মদ বেচিতেছে; কোথাও কোথাও যুবক বা বালকেও ঐ কাজ করিয়া থাকে। টেবিলের সম্মুখে অনেকগুলি ছিন্নবেশ,* কদর্য্যাকৃতি ও জঘন্য দরিদ্রলোক দাঁড়াইয়া মদ পান করিতেছে। কেহ কেহ মদে তাহার সমস্ত পয়সা উড়াইয়া দিতেছে, কেহ বা মদের ঝোঁকে গালাগালি করিতেছে, কেহ বা ঝগড়া করিতেছে; স্ত্রী, পুরুষ সকলেই বীভৎসজনক রূপ ধরিয়া সুরাদেবীর নিকটে হত্যা দিতেছে। অনেক মদের দোকানে মারামারি, খুনাখুনি পর্য্যন্তও হইয়া থাকে। একটি বড় আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে অতি গরিব ও জঘন্য পাড়ার পবলিক্ হাউসগুলির শোভা ও চাকচক্য দিন দিন বাড়িতেছে।

---

# দ্বাদশ অধ্যায়।

## ইংরাজী বিবাহ ও গার্হস্থ্য জীবন।

ইংলণ্ডে স্ত্রীলোক কিম্বা পুরুষ কেহই নিজ ইচ্ছা ব্যতিরেকে কখন বিবাহ করে না, এবং এদেশীয় পিতামাতারাও কখন বলপূর্ব্বক বিবাহ দিয়া পুত্রকন্যার জীবনে কণ্টক রোপণ করেন না। এদেশে স্ত্রীলোকের প্রায় কুড়ি হইতে ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত এবং পুরুষের পঁচিশ হইতে পঁয়ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত বিবাহের সময়। কিন্তু অনেক সময়ে উহা অপেক্ষাও অধিক বয়সে বিবাহ ঘটিয়া থাকে, আর পুরুষেরা যত দিন না যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিতে পারে তত দিন সংসার আশ্রমে

প্রবেশ করে না।) কি দরিদ্র, কি ধনী, সকলেই সংসারের ব্যয়োচিত ধন হস্তগত না হইলে বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হয় না। ইংরাজদিগের যে বয়সে বিবাহ হয়, আমাদের দেশে সে বয়সে লোকের পুত্র কন্যা, এবং কখন কখন দৌহিত্র পৌত্রও হইয়া থাকে। এই বাল্যবিবাহ ও জলবায়ুর দোষে ভারতবর্ষে অতি অল্প বয়সেই লোকে বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু এখানে সেই বয়সে যথার্থ যৌবন আরম্ভ হয় এবং লোকে প্রথম সংসারের সুখদুঃখ ভোগ করে।

(আমাদের দেশের মত ইংলণ্ডে ঘটক ও ঘটকালির বন্দোবস্ত নাই, যুবক যুবতীরা নিজেই প্রণয়িনী ও প্রণয়ী জুটাইয়া লয়। এই প্রণয়ের পাত্র ঠিক করিবার সময়কে ইংরাজীতে "কোর্টশিপ্" অর্থাৎ প্রেমকরণ বলে।) কোন প্রকাশ্য স্থানে, কোন সমারোহে বা আত্মীয়বন্ধুর বাড়ীতে যুবক ও যুবতীদের সমাগম হয়; ঐ প্রকারে কয়েকবার দেখা শুনা হইলে পর কোন যুবক যুবতীর মধ্যে আলাপ পরিচয় হয়। এইরূপে আলাপ করিতে করিতে দুই এক জন পুরুষের দুই এক জন স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তি জন্মে। ইহাই ইংরাজপ্রণয়ের প্রথম সূত্র। পুরুষ প্রথমে পত্র বা কথা দ্বারা প্রণয়িণীর নিকট নিজ প্রেম প্রকাশ করে, এবং যুবতীর মনে পুরুষের প্রতি আসক্তি হইলে সেও তাহার ভালবাসাকে অগ্রাহ্য করে না। এই প্রকারে উভয়ে উভয়ের প্রতি অনুরাগ প্রকাশিলে যুবক ও যুবতী স্বাধীনভাবে প্রকাশ্য স্থানে পরস্পর দেখা-শুনা করে, এবং বেড়ায় আর যত দূর সাধ্য পরস্পর সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা করে ও উভয়ের মন জানিয়া লয়। এইরূপে

দুই তিন মাস কিম্বা আরো অধিক সময় কাটিয়া যায়; পরে উভয়ের কোন বিষয় সম্বন্ধে আপত্তি না থাকিলে এবং দুই জনের দুই জনকে সম্পূর্ণরূপে পছন্দ হইলে, পুরুষ স্ত্রীলোকের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করে। যুবতী সেই প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলে, উভয়ে পিতামাতার মতামতের কোন অপেক্ষা না করিয়া পরস্পর বিবাহ করিতে সম্মত হয়। ইউরোপের অন্য কোন দেশে পিতামাতার অগ্রে সম্মতি বিনা যুবক বা যুবতী কেহ বিবাহের কথা উথাপন করিতে সাহস করে না।

(ইংরাজ যুবক ও যুবতী উভয়েই এইরূপে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলে নিজেদের পিতামাতাকে জানায়; পিতামাতারা পুত্রকন্যার বিবাহের ইচ্ছায় প্রায় বাধা দেন না বরং উহাতে নিজেদের মত দিয়া থাকেন।) পুত্রকন্যারা এখানে অধিক বয়সে এবং অনেক দেখিয়া শুনিয়া ও ভালমন্দ সব বুঝিয়া বিবাহ করিতে উদ্যত হয়, এজন্য পিতামাতারা কেনই বা সম্মতি দিবেন না? এইরূপে (পিতামাতারাও সম্মত হইলে যুবক ও যুবতী পরস্পর বিবাহ করিতে কড়ার করে। ইহা অনেকটা আমাদের দেশের বিবাহের পূর্ব্বে পত্র হওয়ার মত। এই অঙ্গীকারের পর আইনমতে উভয়ে বিবাহ করিতে বাধ্য হয়। এই কড়ার করাকে ইংরাজীতে "এন্‌গেজমেণ্ট" বলে এবং এই অঙ্গীকারের পর যুবক ও যুবতী এক একটী আংটী পরে, তাহাকে "এন্‌গেজমেণ্ট" আংটী বলে। এদেশে এ প্রকার স্বাধীনভাবে যুবক ও যুবতীরা মনোমত প্রণয়পাত্র বাছিয়া লইলেও বিবাহের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কথা মধ্যে মধ্যে শুনা যায়।) ঐ কড়ারের পর পুরুষ বিবাহ করিতে অসম্মত

হইলে, স্ত্রীলোকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের জন্য পুরুষের বিপক্ষে নালিশ করিতে পারে, এবং মোকদ্দমা জিত হইলে গুরুতর অর্থদণ্ড হইয়া থাকে।

কড়ার হইবার পর পরস্পর ভাবী স্ত্রী-পুরুষের মত ব্যবহার করে; দুই জনে এক সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে বেড়ায়, গির্জ্জায় যায়, নাটক দেখে, ইত্যাদি। এ সময়কেও কোর্টশিপের সময় বলে, এই কোর্টশিপে ছয় মাস হইতে কাহারও ছয় বৎসর কাটিয়া যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সকল দিকে সুবিধা না হইলে ইংরাজেরা বিবাহ করিতে অগ্রসর হয় না, এই জন্যই কেহ কেহ বিবাহের সব ঠিক ঠাক করিয়াও অর্থাভাবে বা অন্য কোন কারণে অনেক দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে। যখন সকল দিকে সুবিধা হয়, তখন ইহারা বিবাহের দিন ঠিক করে এবং সংসারাশ্রমে প্রবেশিতে উদ্যত হয়। ইংরাজেরাও বিশুদ্ধ পরিণয়কে অতিশয় আদর করে এবং উহাকে মানব-জীবনের পবিত্র বন্ধন বলিয়া স্বীকার করে। ইহাদের মধ্যে ব্যভিচার প্রশ্রয় পায় না, এবং পুরুষেরা পর্য্যন্ত ব্যভিচার করাকে ভয়ানক পাপ বলিয়া ভাবে।

বিবাহের দিনে সকল দেশেই অতিশয় ঘটা হইয়া থাকে। বাড়ীর পরিবার ও ছেলেদের আহ্লাদের সীমা থাকে না। এখানে সকলের অপেক্ষা বর ও কন্যার অধিক আহ্লাদ হয়; কারণ ভারতের বঙ্গ দেশের মত এ দেশের বর-কন্যার বালক বা বালিকার অবস্থায় বিবাহ হয় না; ইহারা উভয়েই উভয়ের কাছে পরিচিত, সেজন্য কাহারও মনে কোন প্রকার শঙ্কা বা উদ্বেগ জন্মায় না। এ

দেশের কন্যার বাড়ীতে বিবাহ না হইয়া সকাল বেলায় গির্জ্জায় বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। ধনী লোকদের বিবাহের সময় ফুল, ফুলের মালা ও তোড়া ইত্যাদি দিয়া বাড়ী ও গির্জ্জা সাজায়। ফুলের আদর সকল দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়, আর ফুল স্বাভাবিক ও পবিত্র অলঙ্কার বলিয়া সর্ব্বত্রই বিবাহের সময় উহাদ্বারা গৃহাদি পরিশোভিত করে। আমাদের দেশের মত এদেশে বরযাত্রার ঘটা নাই, কেবল বড় মানুষেরা অনেক ভাল ভাল গাড়ী করিয়া গির্জ্জায় যায়। এখানে চেলীর কাপড়ের পরিবর্ত্তে, কন্যা ধপ্‌ধপে সাদা ও নূতন পোষাক এবং বর ভাল ও নূতন পরিচ্ছদ পরে। উভয়েই সাদা দস্তানা হাতে দেয় ও ফুলের তোড়া হাতে লয় এবং কন্যা সাদা জাল মুখে দেয়। আমাদের দেশে যেরূপ নীতবর ও নীতকন্যা সাজায়, এখানেও সেইরূপ বরের ভাই বা অন্য কোন নিকট সম্পর্কীয়কে নীতবর, আর কন্যার সহোদরা ও খুড়তোতো, মাসতোতো ছোট বোনদের নীত-কন্যা সাজায়। (নীতবরকে এদেশে "বেষ্টম্যান" এবং নীতকন্যাদের "ব্রাইড্‌স্‌মেড" বলে। বরের কেবল একটি নীতবর থাকে কিন্তু কন্যাদের, ধনী অনুসারে, একটি হইতে বারটি পর্য্যন্ত নীতকন্যা হয়।) ইহারাও বরকন্যার মত সুন্দর ও নূতন পরিচ্ছদ পরে এবং শুভ চিহ্ন বলিয়া সকল নীত-কন্যাই সাদা জাল পরে এবং দস্তানা হাতে দেয় এবং ফুলের তোড়া লয়।

সকলে গির্জ্জায় উপস্থিত হইলে, বিবাহক্রিয়ার নির্দ্ধারিত সময়ে বর ও কন্যা বেদির নিকট দাঁড়াইয়া পুরোহিত ও আত্মীয়

ন্ধুবান্ধবের সকলের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করে যে, তাহারা পরস্পরকে স্ত্রী ও স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিল, জীবিত থাকিতে দুজনে পৃথক্ হইবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর উভয়ে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে ও তাঁহার আশীর্ব্বাদ চায়। পুরোহিত বাইবল হইতে কোন কোন অংশ পড়ে, নবদম্পতিকে উপদেশ দেয় এবং তাহাদের মঙ্গলের জন্য মঙ্গলময় পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে, এই প্রার্থনাতে পিতামাতারা ও অন্যান্য উপস্থিত লোকেরাও যোগ দেয়। ভারতবর্ষের মত এদেশেও পিতা, কাকা বা বড় ভাই কন্যাকে বরের হস্তে সমর্পণ করে। বিবাহের প্রতিজ্ঞা ও প্রার্থনার পর বরকন্যা, পুরোহিত ও গুরুজনদের সহিত অন্য একটি ঘরে গিয়া, রেজেষ্টরী পুস্তকে নিজেদের নাম সই করে; এবং অন্য দুই একজন সাক্ষীস্বরূপ তাহাদের নাম লিখিয়া দেয়। বেদির নিকট বিবাহের প্রতিজ্ঞার পর স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ যেমন ধর্ম্মমতে অলঙ্ঘনীয়, সেইরূপ এই রেজেষ্টরী করার পর পতি ও পত্নীর সম্পর্ক আইনমতে অলঙ্ঘনীয় হয়। বিবাহক্রিয়া সমাপন হইলে, যখন বর ও কন্যা গির্জ্জা হইতে বাহিরে যায়, তখন এখানকার প্রথা অনুসারে উপস্থিত লোকেরা নববিবাহিত দম্পতির মাথায় ও চারিদিকে চাল ছড়াইয়া দেয় এবং বরকে জুতা মারে। এ জুতা মারার প্রথা আমাদের দেশের বরের কাণমলার মত, কিন্তু বঙ্গদেশে সময়ে সময়ে এত জোরে কান মলিয়া দেয় যে, বালক বরেরা কখন কখন কাঁদিয়া ফেলে। এদেশে ইহারা অতি নরম রেশমের জুতা দিয়া আঘাত করে, তাহাতে বরের লাগার পরিবর্ত্তে বরং আরাম হয়। গির্জ্জা হইতে

প্রায় সকলে বরের বাড়ী কিম্বা কন্যার বাপের বাড়ীতে [illegible] থাকে, এবং আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের লইয়া মহাভোজ [illegible] ও আমোদ আহ্লাদ করে।

আমাদের দেশের লোহার মত এখানে সোনার সাদা আংটী বিবাহের চিহ্নস্বরূপ। এখন কড়ারের আংটী খুলিয়া ফেলিয়া এই বিবাহের আংটী পরে।)বিবাহের আংটী খোলাকে এদেশে বৃদ্ধ ও কুসংস্কারাপন্ন স্ত্রীলোকেরা অমঙ্গলের চিহ্ন বলিয়া বিশ্বাস করে। আর এ আংটী পরাতে উপকার আছে; কে বিবাহিতা ও কে অবিবাহিতা তাহা স্ত্রীলোকের হাতের দিকে চাহিলেই এক দণ্ডে জানা যায়। এদেশেও বিবাহের সময় সামাজিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে দুচারটি কুসংস্কার দেখিতে পাওয়া যায়; তাহা কেবল অল্পশিক্ষিতা বা অশিক্ষিতা স্ত্রীরাই পালিয়া থাকে। ভারতবর্ষ ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের মত এদেশীয় পিতাদের কন্যাদের বিবাহের সময় অনেক গহনা, পোষাক কিম্বা টাকা দিতে হয় না; কেহ ইচ্ছা করিলে কন্যাকে অনেক টাকা বা দ্রব্যসামগ্রী দিতে পারেন বটে, কিন্তু তাহার বন্দোবস্ত নাই। আমাদের দেশের যৌতুকের মত বিবাহের পর পিতামাতা ও বন্ধুবান্ধবেরা বরকন্যাকে নানা প্রকার দ্রব্য, ঘড়ি, চেন, পুস্তক, পোষাক ইত্যাদি উপহার দিয়া থাকে।

(নববিবাহিত স্ত্রীপুরুষ কয়েক সপ্তাহের জন কোন নির্জ্জন স্থানে গিয়া আমোদ করে। বিবাহের ঠিক পরে এই সময়কে ইংরাজীতে "হনিমুন" অর্থাৎ মধুচাঁদ বলে, সাধারণতঃ লোকে প্রায় এক মাস ধরিয়া "হনিমুন" করে।) বোধ হয়

াহের পর জীবনের এই সময় সকল সময় অপেক্ষা সুখকর বলিয়া ইহার এই মিষ্ট নাম। এই সময়ে নবদম্পতি সংসারের জ্বালা, সন্তানের উপদ্রব, দাসদাসীর ঝঞ্ঝাট ইত্যাদি গার্হস্থ্য জীবনের কোন প্রকার কষ্ট জানে না, এবং বিবাহের জীবনকে কেবল সুখের আধার বলিয়াই বিশ্বাস করে। কোন কোন দম্পতি দুই তিন মাস এইরূপে পরস্পরের প্রণয়সুখ ভোগে রত থাকে। সংসারের কোন চিন্তায় তাহাদের মন উদ্বিগ্ন হয় না। তাহার পর স্ত্রীপুরুষে বাড়ী আসিয়া সংসার করিতে আরম্ভ করে।

এদেশে অবিবাহিতা স্ত্রীদিগের "মিস" অর্থাৎ কুমারী, এবং বিবাহিতাদের "মিষ্ট্রেস" সংক্ষেপে "মিসেস" অর্থাৎ কর্ত্রী বা গিন্নী বলিয়া ডাকে। অনেকে ভাবেন যে, বিবাহের পর ইংরাজ স্ত্রীলোকদের নাম বদলিয়া যায়, বাস্তবিক তাহা নয়। আমাদের অন্নপ্রাশনের সময় নামকরণের ন্যায় এখানে ধর্ম্ম-দীক্ষার সময় নামকরণ হয়; পিতামাতারা ইচ্ছামত পুত্রকন্যার নাম রাখিয়া থাকেন। সেই নামকে খৃষ্টান নাম বলে, তাহা কখন বদলিয়া যায় না। কিন্তু বিবাহের পর কেবল পিতৃ-পরিবারের নাম বা পদ্ধতি ভিন্ন হইয়া যায়। আমাদের দেশে যেমন "কুমারী নির্ম্মলা দত্তের" কোন মিত্রের সহিত বিবাহ হইলে, তাহার নাম "শ্রীমতী নির্ম্মলা মিত্র" হয়; সেইরূপ এখানেও রোজ "মিস স্মিথে"র কোন "অ্যালেনের" সহিত বিবাহ হইলে, তাহার নাম "মিসেস্ রোজ অ্যালেন" হইয়া থাকে। ইংরাজদের মধ্যে খুড়তোতো, পিসতোতো, মাসতোতো ইত্যাদি ভাই বোনের মধ্যে বিবাহ ঘটিয়া থাকে; এরূপ ঘরে ঘরে

বিবাহে ইহাদের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আমাদের দেশের মত এদেশে কেহ কখন মৃত স্ত্রীর ভগিনীকে বিবাহ করিতে পারে না। অনেকে এই ব্যবস্থা খণ্ডনের নিমিত্ত বিলক্ষণ চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু এপর্য্যন্ত কেহ সফল হন নাই।

বিবাহের পর স্ত্রীপুরুষ কেহই পিতামাতার সহিত এক বাড়ীতে বাস করে না; উভয়ে একটি ভিন্ন বাড়ীতে নিজেদের নূতন সংসার স্থাপন করে। এদেশের দাম্পত্যজীবন আমাদের দেশের হইতে একেবারে ভিন্ন বলিলেই হয়। এখানে স্বামীর কর্ম্মের সময় ছাড়া দুইজনে একসঙ্গে থাকে, খায়, বেড়ায় এবং লেখাপড়া, সংসার, ধর্ম্ম, এমন কি সমস্ত জগৎ সম্বন্ধে নানা প্রকার আলাপ করে। লোকে বিবাহ করে কেন? সকলেই—স্বদেশীয়, বিদেশীয় সকলেই সমস্বরে উত্তর দিবেন, "পৃথিবীতে জীবনের একজন সমসুখদুঃখভাগিনী, সহধর্ম্মিণী সহকারিণী পাইবার জন্য"। এদেশীয় স্ত্রীরা যে স্বামীর সুখদুঃখ ভাগিনী, সহধর্ম্মিণী ও সহকারিণী সে বিষয়েআমার সন্দেহ নাই। স্ত্রীপুরুষে সমভাবে সুখদুঃখ ভোগ করেন, একসঙ্গে ঈশ্বরের উপাসনা করেন এবং স্ত্রী অনেক সময়ে নানা কার্য্যে স্বামীর সাহায্য করেন। অনেক সময়ে স্বামী অপারগ হইলে স্ত্রী পরিশ্রম করিয়া স্বামীর ও সন্তানদের আহার যোগাইয়া থাকেন।

বাস্তবিক ইংরাজদের দাম্পত্যজীবন আমাদের নিকট অতি সুখময় ও সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। সুখের সময় দুজনেই সমানরূপে সুখভোগ করে, এবং দুঃখের সময় স্ত্রীপুরুষ উভয়েই সমভাবে ক্লেশ সহ্য করে। এদেশে স্বামী বেড়াইতে বা কোন

আমোদের স্থানে গেলে স্ত্রীকে কখন পশ্চাতে ফেলিয়া যান না। স্বামী ধনোপার্জ্জন করিয়া কেবল নিজের সুখ হইলে সন্তুষ্ট না থাকিয়া স্ত্রীকেও যথাসাধ্য সুখী করিতে চেষ্টা পান। প্রতি রবিবারে স্ত্রীপুরুষে প্রায় একসঙ্গে গির্জ্জায় যায়, ও প্রার্থনা করে, একসঙ্গে ধর্ম্মপুস্তক পড়ে ও ধর্ম্মসঙ্গীত গায়। কোন কর্ম্ম করিতে হইলে বুদ্ধিমান ও সুচতুর স্বামী আগে স্ত্রীর পরামর্শ লন ও তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করেন। এবং বুদ্ধিমতী গৃহিণী স্বামীকে প্রভু না ভাবিয়া, অকৃত্রিম প্রণয় সহকারে প্রিয়তম স্বামীকে সুখী করিতে সাধ্যমত চেষ্টা পান। এজন্য ইংরাজ পুরুষেরা গৃহে শিক্ষিতা স্ত্রীর নিকট সুখ পান বলিয়া অন্য কোন বাহিরের সুখের নিমিত্ত লালায়িত হন না। এক কথায় ইংলণ্ডীয় স্ত্রী স্বামীর ডান হাত; ইঁহারা স্বামীদের অনেক সৎকর্ম্মে পরামর্শ দেন এবং স্বামীরাও আহ্লাদ ও আদরের সহিত তাহা গ্রহণ করেন।

আমাদের দেশের দম্পতির জীবন কি কষ্টকর তাহা বুঝিতে পারিলে মনে ভয়ঙ্কর বিষাদ উপস্থিত হয়। অবরুদ্ধা স্ত্রী, স্বামী কি প্রকারে সমস্ত দিন কাটান, তাহা জানেন না, এবং স্ত্রী কিরূপে কালযাপন করেন তাহাও স্বামী জানেন না। বাবুদের নামে বাড়ীর গৃহিণীরা ভয় পান। বাবুরা সুন্দর সাজান বৈটকখানায় বসিয়া হুঁকা টানেন, তাস পেটেন কিম্বা ইয়ারবর্গের সহিত গল্প আমোদ করেন ও বেড়াইতে যান; কিন্তু গৃহিণীরা সেই বাড়ীর ভিতর বসিয়া এক সংসার লইয়াই ব্যস্ত। স্ত্রী স্বামীকে ভাল বাসেন, তিনি কি প্রকারে ভাল খাইবেন ও সুখে সচ্ছন্দে থাকিবেন তাহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা

করেন; কিন্তু স্বামী তাঁহার প্রতি যথার্থ ব্যবহার করেন না। এবং তিনিও পতির প্রতি যথার্থ ব্যবহার করিতে পারেন না বা জানেন না। স্ত্রীপুরুষে যথার্থ কি সম্বন্ধ তাহা আমাদের দেশের অতি অল্প লোকই বুঝেন। আর স্ত্রীপুরুষদেরও অধিক দোষ দিতে পারি না; কুসংস্কার, দেশের কুপ্রথা, বাল্যবিবাহ ও পিতামাতার পুত্রকন্যার প্রতি অযথোচিত ব্যবহারই সমস্ত দুঃখের মূল। ভারতললনাদের সুদৃঢ় সতীত্ব-বন্ধন থাকিলেও ঐ সকল নানা কারণে দম্পতিরা পরস্পরের সুখের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন না।

আবার ইংরাজদের মধ্যে অনেক বিবাহিত স্ত্রীপুরুষে যথার্থ ভালবাসা ও ভাবী স্ত্রীপুরুষের মধ্যে বহুদিন হইতে আলাপ থাকিলেও, এদেশে অন্যান্য দেশের অপেক্ষা অধিক স্ত্রীত্যাগ ও স্বামীত্যাগের মোকদ্দমা শুনিতে পাওয়া যায়। (স্ত্রীর প্রতি স্বামী অত্যাচার করিলে বা স্বামী ব্যভিচার করিলে, স্ত্রী আদালতে গিয়া স্বচ্ছন্দে স্বামীর নামে নালিশ করিয়া তাঁহা হইতে পৃথক্ হইতে পারেন এবং স্বামীও স্ত্রীর চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শিলে তাঁহাকে ত্যাগ করিতে পারেন। আর এইরূপ পৃথক্ হইবার পর তাঁহারা দুইজনেই আবার ইচ্ছামত বিবাহ করিতে পারেন। আমাদের দেশে স্ত্রীত্যাগের ব্যবস্থা আছে কিন্তু স্বামীত্যাগের মোকদ্দমা কখন শুনিতে পাওয়া যায় না।) পতিব্রতা হিন্দুমহিলারা স্বামীর শত দোষ থাকিলেও এবং স্বামী ব্যভিচার করিলেও, গোপনে সমস্ত সহ্য করেন, আর স্বামীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করাকে অতিশয় লজ্জা ও ঘৃণার বিষয় বলিয়া ভাবেন। এদেশে বিবাহের পর ব্যভিচার করাকে উভয়

অন্যকেই ভয়ঙ্কর দোষ ও পাপ বলিয়া স্বীকার করেন। স্বামী যে কেবল নিজেরই ইচ্ছামত কাজ করিবেন তাহা এদেশে কখন খাটে না।

ইংরাজ জাতির সন্তানদের প্রতি ভালবাসা বা মমতা অতি অল্প বলিয়া আমার বিশ্বাস ছিল। ইহারা সমস্ত পরিবার একসঙ্গে বাস করে না এবং বিদেশীয়দের প্রতি মৌখিক স্নেহ দেখায় বটে, তথাপি ইহাদের মধ্যে যে পিতামাতা, পুত্রকন্যা প্রভৃতি আত্মীয় জনের প্রতি ভালবাসা নাই তাহা এখন আমি বিশ্বাস করি না। যতদিন না পুত্রকন্যারা নিজেদের যত্ন লইতে শিখে এবং যতদিন না তাহারা নিজেদের সংসারে প্রবেশ করে ততদিন ইংরাজ পিতামাতারা পুত্রকন্যাদের যথেষ্ট যত্ন লন, এবং তাহারা কিসে স্বাধীনভাবে থাকিতে পারে তাহার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করেন। এই অবস্থাতে এদেশীয় পিতামাতারা সন্তানদের প্রতি আমাদের দেশীয় পিতামাতাদের অপেক্ষা অধিক মমতা প্রকাশ করেন বলিয়া বোধ হয়। পুত্রকন্যারা বড় হইলে পিতামাতার গলগ্রহ না হইয়া ভিন্ন গৃহে বাস করে, সেজন্য উহাদের মধ্যে অধিক ঘনিষ্ঠতা থাকে না বটে; কিন্তু তাহা বলিয়া পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা ও সম্পর্ক ঘুচিয়া যায় না। যখন ইচ্ছা হয় ইহারা সকলে দেখা সাক্ষাৎ করে ও এক-সঙ্গে আহারাদি করিয়া থাকে। আমাদের দেশের মত এদেশে সচরাচর গৃহবিবাদ ঘটে না, সেজন্য পিতামাতা, সন্তানসন্ততি ও ভাই ভগিনী ইত্যাদির মধ্যে প্রায় যাবজ্জীবন পরস্পর সদ্ভাব থাকে। হিন্দুদের মধ্যে অপত্যস্নেহ কিছু অধিক এবং সময়ে সময়ে অতিরিক্ত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু সেখানকার পিতামাতারা

অনেক সময়ে পুত্রকন্যাদের প্রতি যথার্থ কর্ত্তব্য আচরণ করে না; আর সেখানে যেমন মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর গৃহবিচ্ছেদের কথা শুনা যায়, এখানে সেরূপ প্রায় হয় না।

ইংরাজ সন্তানেরা বয়স প্রাপ্ত হইলে পিতামাতা তাহাদের সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করেন এবং ভারতীয় জনকজননীর মত, সন্তানেরা নিজেদের মতানুসারে কোন কর্ম্ম করিলে, 'অবাধ্য' নাম দিয়া চিরকালের জন্য পুত্রকন্যাদের মনে কণ্টক-রোপণ করেন না আর নিজেরাও কষ্ট পান না। ইঁহারা বুঝেন যে, যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলেই মানুষের সদসৎ বিবেচনার শক্তি জন্মে, অতএব সন্তানেরা তখন বাল্যাবস্থার ন্যায় সমস্ত বিষয়ে পিতামাতার মতের অনুগামী হইতে চাহে না, সেজন্য ইঁহারা প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদিগকে তাহাদের ইচ্ছামত ভালমন্দ বুঝিয়া কাজ করিতে বলেন। পিতামাতারা উপযুক্ত পুত্রকন্যাদের পরামর্শ লইতে নিজেদের হীন বোধ করেন না, বরং অনেক সময়ে তাহাদের মত লইয়া চলেন। ছেলেরাও যথেচ্ছাচারী বাপমায়ের ভয়ে না কাঁপিয়া কিম্বা তাঁহাদের অবিবেকী ও অশিক্ষিত ভাবিয়া ঘৃণা করে না; সকল সময়েই তাঁহাদের সম্মান রাখিয়া যথোচিত ব্যবহার করে। পিতামাতা কোন অন্যায় করিলে, পুত্র কিম্বা কন্যা কোন কথা বলিয়া তাহার সংশোধনের চেষ্টা পাইলে, তাঁহারা ক্রোধান্ধ না হইয়া পুত্রকন্যাদের কথা যুক্তিযুক্ত কি না তাহা দেখিয়া তদনুরূপ কর্ম্ম করেন। এপ্রকার পিতামাতা ও সন্তানের ব্যবহার দেখিয়া ইংরাজদের গার্হস্থ্য জীবন সুখকর বলিয়া কাহার না বোধ হয়?

এদেশীয় ভাইবোনের পরস্পর ব্যবহার আমাদের হইতে একেবারে ভিন্ন। বাল্যকাল হইতে ভাইবোনে একস্থানে ও একভাবে পালিত হয়। ছেলেবেলা হইতে ভায়েরা বোনদের স্ত্রীলোক বলিয়া বা অন্য কোন কারণে নীচ ভাবিয়া ঘৃণা করিতে শিখে না। ইহারা যত বড় হইতে থাকে, ইহাদের সৌহার্দ্য তত বৃদ্ধি পায়। পিতামাতা পুত্রকন্যা উভয়কেই শিক্ষা দিতে সমভাবে যত্ন লন এবং সকলকেই একচক্ষে দেখেন; পুত্র বিষয়াধিকারী ও অর্থোপার্জ্জক এবং কন্যা পরগৃহবাসিনী বলিয়া দুজনকে ভিন্ন ভাবেন না। সেজন্য ভ্রাতা ও ভগিনীর মন বাল্যকাল হইতেই পরস্পরের হিতকামনায় একভাবে অগ্রসর হয়; এবং যতই কেন বয়স হউক না, দুইজনে একসঙ্গে কথা কয়, বই পড়ে, বেড়িয়া বেড়ায় ও খেলা করে। এদেশের ভাইবোনের মধ্যে প্রায় কখন কোন বিবাদ বা অমিল ঘটে না। অবিবাহিত ভাইবোনের মধ্যে যে কেবল ভালবাসা থাকে তাহা নয়, বিবাহের পরও ইহারা পরস্পরের প্রতি সমান স্নেহ প্রকাশ করে। উভয়ে নিজ নিজ সংসারে ব্যস্ত হয় বটে, তথাপি অবকাশ পাইলেই দেখাসাক্ষাৎ করে এবং অতি যত্ন ও আদরের সহিত পরস্পরের অভ্যর্থনা আর পরস্পরের প্রতি স্নেহ ও মমতা প্রকাশ করে।

ইংলণ্ডে পিতার বিষয় কেবল জ্যেষ্ঠ পুত্রেই পাইয়া থাকে। পিতা জীবদ্দশাতে অন্যান্য সন্তানদের প্রতি স্নেহবশতঃ তাহাদিগকে কিছু কিছু টাকা বা সম্পত্তি দিতে পারেন বটে, কিন্তু মৃত্যুর পর বড় ছেলে ভিন্ন আর কেহই সম্পত্তির অধিকারী নয়। এদেশে এই প্রকার জ্যেষ্ঠাধিকার থাকাতে

ভালমন্দ উভয় ফলই ঘটিয়া থাকে। কেবল বড় ছেলে সব পাইবে এবং আর কোন ছেলে কিছুরই অধিকারী নয়, ইহা বড় অন্যায় ও অবিচার বলিয়া বোধ হয়। ঘটনাক্রমে সর্ব্বাগ্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া, গণ্ডমূর্খ ও অকর্ম্মণ্য হইলেও, কেবল সেই জ্যেষ্ঠ পুত্র সমস্ত বিষয়ের অধিকারী, ইহা অন্য সন্তানদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর তাহার কোন সন্দেহ নাই। পিতার হঠাৎ মৃত্যু হইলে অন্যান্য সন্তানেরা একেবারে দরিদ্র ও নিঃসহায় হইয়া পড়ে। অনেক সময়ে দেখা যায় যে, বাপের বড় ছেলে সমস্ত সম্পত্তি পাইয়া নির্ব্বিঘ্নে যথেচ্ছ বিষয় ভোগ করিতেছে আর অন্য ছেলেরা দরিদ্রভাবে অনাহারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ভালপক্ষে আবার এই যে, বড়ছেলে বিষয়ের অধিকারী হওয়াতে অন্যান্য ছেলেরা মোকদ্দমা করিয়া, যে যত পারে সম্পত্তি লইতে ব্যস্ত হয় না আর বিষয়ের ভাগী হইতেও মিথ্যা ইচ্ছুক হয় না। ইহাদের গার্হস্থ্য জীবনের মধ্যে সর্ব্বদা বিবাদ, কলহ, হিংসা ইত্যাদি শত্রু আসিয়া ভ্রাতৃস্নেহের উচ্ছেদ সাধন করে না। বড় ছেলে ভিন্ন অন্য ছেলেরা অল্প বয়স হইতেই নিজে উপার্জ্জন করিতে চেষ্টা করে। তাহারা জানে যে, ধনী পিতার পুত্র হইলেও তাহাদের নিজের অর্থে আপন আপন সংসার চালাইতে হইবে সুতরাং তাহারা আত্মনির্ভর করিতে শিখে এবং নিজেই নিজের পথ দেখিয়া থাকে। এইরূপ বন্দোবস্ত থাকাতে এ দেশের বড় বড় বিষয় সম্পত্তি ছারখার হইয়া যায় না, আর হয় ত পুত্রদের মধ্যে কেবল এক জন অলসভাবে কাল কাটায় এবং অন্যেরা পরিশ্রম

করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে; কিন্তু আমাদের দেশে বড় মানুষদের সকল ছেলেই প্রায় অলস হইয়া যায়. আর সকলে পরস্পর মোকদ্দমা করিয়া সমস্ত বিষয় নষ্ট করিয়া ফেলে।

ঐরূপ বন্দোবস্তই আবার এখানে লোককে স্বার্থপর করিয়া তুলে। সকলেই স্বাধীন ভাবে থাকিতে চাহে; প্রত্যেক পুত্র বয়স প্রাপ্ত হইলে যেমন স্বাধীনতা চাহে সেইরূপ এক একটী নিজের বাড়ীতে থাকিতে ইচ্ছা করে। একান্নবর্ত্তী পরিবারের ন্যায় অনেক লোকের সঙ্গে বাস না করিয়া সকলেই কেবল নিজের স্ত্রী, সন্তান ও দাসদাসী লইয়া থাকে। অনেক সময়ে ইহারা কেবল নিজেরটিকে ও নিজকে বুঝে, অন্য আত্মীয় জনের সঙ্গে কোন সংস্রব রাখিতে ইচ্ছা করে না। আর সামান্য লোকদের মধ্যে এই সম্বন্ধে ভয়ঙ্কর বাড়াবাড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। পুত্রের সর্ব্বনাশ হইলেও পিতা ভ্রুক্ষেপ করে না; অপর বাহিরের লোক দূরে থাকুক, আত্মীয় জনের অতিশয় বিপদ বা দুরবস্থা ঘটিলেও ইহারা তাহাদের কোন সংবাদ রাখে না ও গ্রাহ্য করে না।

যাহা হউক, ইংরাজদের মধ্যে প্রত্যেক ভদ্র পরিবারের জীবনযাপনের প্রথা অতি চমৎকার। পরিবারের সমস্ত পরিজন একত্র আহার করে; বাড়ীর খোকা হইতে বাপ পর্য্যন্ত সকলে এক টেবিলের চারিদিকে বসিয়া ভোজন করে। ভোজনারম্ভের পূর্ব্বে গৃহস্বামী টেবিলের নিকট দাঁড়াইয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন এবং পরিবারের সকলে তাঁহার চারিদিকে দাঁড়াইয়া উহা নিশ্চলভাবে শুনে। এই প্রার্থনাকে 'গ্রেস' অর্থাৎ আশীর্ব্বাদ বলে। ঈশ্বরকে নিজেদের আহার

দিবার জন্য ধন্যবাদ দেওয়া এবং তাঁহার নিকট আশীর্ব্বাদ চাওয়া এই প্রার্থনার উদ্দেশ্য। পরিবারের সকলে একত্র আমোদ ও কথাবার্ত্তা করে। স্ত্রীলোক, পুরুষ সকলেই এইরূপ একসঙ্গে আহারাদি করাতে, বাল্যকাল হইতেই ভব্যতা ও সদাচার শিক্ষা করে। সংসারের দাসদাসীকেও ইহারা নিজ পুত্রকন্যার মত দেখে এবং তাহাদের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি বিষয়ে যত্ন লয়; তাহারাও প্রভুদের তদনুরূপ সম্মান ও ভক্তি করিয়া থাকে।

এদেশে এক একটি ধনী লোকের বাটীতে সচরাচর সাত আটজন করিয়া চাকরাণী থাকে—রাঁধুনী, রান্নাঘরের ঝি, দুই তিন জন সংসারের ঝি, একজন গৃহিণীর পরিচারিকা, কোচম্যান, এবং খানসামা। কোন কোন বাড়ীতে পনর জন, কোনটিতে বা আঠার জন পর্য্যন্তও দাসদাসী দেখা গিয়া থাকে। বড় মানুষদের বাড়ীতে সর্ব্বপ্রধান চাকরকে 'বট্‌লর' বলে। ইহার উপর সমস্ত বাড়ীর তত্ত্বাবধানের ভার, দরজার চাবি ও মদের ঘরের ভার থাকে; কোন জিনিস চুরী গেলে ইহাকেই তাহার জন্য দায়ী হইতে হয়। গৃহিণীর পরিচারিকা সমস্ত চাকরাণীদের উপর কর্ত্তৃত্ব করে; ইহার উপর ভাঁড়ার ঘরের ও অন্যান্য জিনিস পত্রের ভার থাকে। অধিকাংশ গৃহস্থদের বাড়ীতে কেবল চাকরাণী থাকে। এদেশে কেবল ধনীরাই পুরুষ চাকর রাখিতে পারে। চাকরদের মাহিনা চাকরাণীদের অপেক্ষা প্রায় তিনগুণ অধিক; তাহা ছাড়া আবার চাকর রাখিতে হইলে আলাদা টেক্স দিতে হয়। এদেশের চাকরাণী, রাঁধুনী প্রভৃতি প্রায় সকলেই

অবিবাহিতা ও অল্পবয়স্কা—বার হইতে পঁয়ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত। ইহাদের মাহিনা মাসে আট টাকা হইতে কুড়ি পঁচিশ টাকা পর্য্যন্ত; এবং পুরুষ চাকরদের মাহিনা মাসে পঁচিশ টাকা হইতে পঞ্চাশ ষাট টাকা পর্য্যন্ত।

আমাদের দেশে যেরূপ লোকের বাড়ীতে আট জন চাকর চাকরাণী থাকে, এদেশে সে প্রকার লোক দুই তিন জনের অধিক চাকরাণী রাখিতে পারে না। এখানকার চাকরাণী-দের বিলক্ষণ ভারী কাজ করিতে হয়, আর ইহারা সব রকমের কাজ করে। সমস্ত বাড়ী পরিষ্কার রাখে, ঘরের সব জিনিস ঝাড়ে, বিছানা করে, ফুলগাছে জল দেয়, জুতা সাফ্ করে, বাজার করে ও দরওয়ানের কাজ করে ইত্যাদি। এক এক জন ইংরাজ চাকরাণী আমাদের দেশের তিন জনের সমান কাজ করে, ভোর সাতটা হইতে রাত্রি দশ এগারটা পর্য্যন্ত ইহাদের বিশ্রাম নাই। এদেশের সমস্ত লোকের মত দাসদাসীকেও কখন কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করিতে দেখি না। ইহাদের কাজ করিবার জন্য ক্রমাগত বকিতে হয় না, একদিন যাহার যে কাজ বলিয়া দিলে, গৃহকর্ত্রীকে আর সেজন্য কিছু ভাবিতে হয় না। তিরস্কার খাওয়াকে ইহারা অতি লজ্জার কথা মনে করে, অতএব কিছু বলিবার আগেই ইহারা যখন যাহা কর্ত্তব্য তখন সেইটী করিয়া রাখে। অবশ্য ইহাদের মধ্যে দুই একটা মন্দ থাকিতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ ইংরাজ দাসদাসীই অতিশয় কর্ম্মক্ষম, পরিশ্রমী, চালাক ও বিশ্বাসী। দোষের মধ্যে এই যে, ইহারা স্বাধীন থাকিতে ভাল বাসে; অন্যান্য দেশের চাকরচাকরাণীদের মত ইহারা সর্ব্বদা পরের দ্বারা

পরিচালিত হইতে ইচ্ছা করে না, আর কাজ শেষ হইবার পর সময়ে সময়ে মনিবদের ন্যায় অধিক বেশবিন্যাস করিয়া বেড়াইতে ভাল বাসে।

অনেক ভদ্রলোকের বাড়ীতে ধর্ম্ম আলোচনার সময় দাস-দাসীরাও পরিবারের অন্তর্ভূত বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রতি রবিবারে গৃহকর্ত্তা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বন্ধুবান্ধব ও ভৃত্যদের লইয়া একত্র উপাসনা করে। সমস্ত পরিবার ও অভ্যাগত সকলে একসঙ্গে বসিয়া উচ্চস্বরে ধর্ম্মোপদেশ পড়ে ও প্রার্থনা করে, বাড়ীর কর্ত্তাই প্রায় আচার্য্যের কাজ করিয়া থাকেন। এই সময়ে ইংরাজ পরিবারের মনে ধর্ম্মভাব দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। প্রত্যেকে হাঁটু পাতিয়া বা মাথা হেঁট করিয়া বসে, সকলে একভাবে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়া থাকে। অবশেষে গৃহকর্ত্তা বাইবল হইতে একএকটী করিয়া ধর্ম্মকথা বলেন,আর আরাধকেরা এক একটি চরণ করিয়া তাহার উত্তর দেয়। উপাসনা শেষ হইলে ভৃত্যেরা ধীর ও গম্ভীরভাবে এক এক করিয়া চলিয়া যায়, এবং বাড়ীর লোকেরা ইচ্ছামত আলাপাদি করে।

ঐ সমস্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে, ইংরাজদের গার্হস্থ্য জীবনে স্বার্থ থাকিলেও, উহা অনেক বিষয়ে অন্যান্য জাতি-দের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও সুখজনক বলিয়া বোধ হয়। ইংরাজ-দের সামাজিক গুণ না থাকিলেও ইহাদের পারিবারিক জীবন অতি আনন্দময় ও চমৎকার। অসার বাবুগিরি ইহারা তত গ্রাহ্য করে না, নিজেদের আরাম ইহাদের প্রধান লক্ষ্য এবং উহাই ইংরাজেরা বিলক্ষণ বুঝে। প্রচুর অর্থ ও নিজের বাড়ী

থাকিলেই ইংরাজেরা অতি স্বচ্ছন্দে ও আরামে বাস করে। একটি সুন্দর, মনোনীত ও পরিষ্কার গৃহ-চারিদিকের জানালা দরজা সব বন্ধ—ঘরের ভিতরে জ্বলন্ত আগুনের সম্মুখে বসিয়া, পতিপরায়ণা, মনোরমা ও সুসজ্জিতা স্ত্রীর সহিত মধুর আলাপ —উত্তম লালিত পালিত ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সন্তানদের ঈষদা-রক্ত বদনের প্রফুল্ল হাসি—ঘরের প্রচুর আসবাব—আবশ্যক ও আরামদায়ক দ্রব্যসকলের সদ্ভাব—গৃহের সমস্ত জিনিস উত্তমরূপে সাজান-এইগুলিই এ প্রকার বিষাদজনক শীত ঋতুর অধিবাসী ইংরাজেরা পরম সুখ ও আরামের মধ্যে গণনা করিয়া থাকে। ইংরাজেরা যতই কেন বড়মানুষ হউক না, নিজের বাড়ীকে ব্যভিচার বা অন্য কোন জঘন্য কাণ্ড দ্বারা কলুষিত করে না। নিজ গৃহ পবিত্র স্থান, এ বিশ্বাস প্রত্যেক ভদ্র ইংরাজের মনে বদ্ধমূল রহিয়াছে, এবং নিজ সংসারকে বিশুদ্ধ ও সুখময় রাখাতেই ইংরাজদের গার্হস্থ্য জীবন এমন আনন্দময় ও উপাদেয় হইয়াছে।

---

## ত্রয়োদশ অধ্যায়।

### "মদ না গরল?"

ইংরাজেরা যে মদ ভাল বাসে তাহা বোধ হয় আমাদের দেশে কাহারই অজানা নাই। ইহাদের মত কোন জাতিই এত মদ খায় না ও মাতাল হইয়া পশুর ন্যায় ব্যবহার করে

না।) এখানে দিনে যে আট আনা করিয়া উপার্জ্জন করে সেও রোজ একবার কিম্বা দুইবার করিয়া মদের দোকানে যায়। ইহারা যে মদের শনি তাহা এখানকার রাস্তায় বেড়াইলে স্পষ্ট জানা যায়, প্রতি রাস্তায় যেখানে সেখানে পব্লিক হাউস দেখিতে পাই। এই মদের দোকানগুলির বর্ণনা পূর্ব্বে করিয়াছি; এখন মদের প্রভাবের বিষয় লিখিব।

(ইংলণ্ডে এত শিক্ষিত লোক আছে এবং ইংরাজেরা বিদেশ হইতে এত রাশি রাশি টাকা চুষিয়া আনিতেছে, তবে এদেশে এত দরিদ্র লোক কেন? এবং তাহাদের এত দুরবস্থাই বা কেন? এই প্রশ্নের সহসা উত্তর দেওয়া যায় না, কিন্তু ক্রমে ক্রমে দেখিয়া শুনিয়া জানিতে পারা যায় যে, এপ্রকার অনিবার্য্য দরিদ্রতার একমাত্র কারণ মদ্যপান এবং এই মদের দোষেই ইংলণ্ডের ছোট লোকেরা পশুর মত আচরণ করিয়া থাকে। পূর্ব্বকালে ইংলণ্ডে মদ খাওয়া এত প্রবল ছিল যে, ধনী লোকেরা এবং কোন কোন রাজ-পরিবারের লোক মাতাল হইয়া রাস্তায় গড়াগড়ি দিয়া আমোদ করিত। সৌভাগ্যক্রমে এখন সম্ভ্রান্তদের মধ্যে পানদোষ অনেক কমিয়া আসিয়াছে এবং বড় মানুষেরা এখন সেরূপ জঘন্য আচরণ করে না। কিন্তু ছোটলোকদের মধ্যে পূর্ব্বেও যে প্রকার ছিল এখনও প্রায় সেই প্রকার মদের প্রভাব রহিয়াছে। কথিত আছে যে, মাতাল হইলে ফরাসীরা বকে, জর্ম্মণেরা ঘুমায় আর ইংরাজেরা মারামারি করে। সত্যসত্যই ইহারা মাতাল হইয়া একেবারে বিবেকশূন্য হয় ও মানুষের সমস্ত গুণ হারায়। ইংরাজ ছোটলোকেরা মদ খাইয়া ভয়ঙ্কর গালাগালি ও মারা-

মারি করে এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে মাতাল হইয়া বিনা কারণে সময়ে সময়ে নিজের স্ত্রী ও ছেলেদের মারিয়া ফেলে।

কয়েক মাস হইল এদেশের দরিদ্রলোকদের দুরবস্থা ও তাহার কারণ লইয়া এখানকার সংবাদপত্র ও পত্রিকায় তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। ঐ সময়ে মদ্যপান ও তাহার পরিণাম সম্বন্ধে যে সকল জঘন্য বিষয় প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিয়া, বোধ হয় এমন কোন লোকই নাই যে তাহার শরীর শিহরিয়া না উঠে। আমি এই পুস্তকে অত্যুক্তি করিতে চাহি না, বরং যথাসাধ্য সংক্ষেপে সেই ঘৃণিত ব্যাপার বর্ণনা করিব, এবং ইংরাজেরা নিজে এই সম্বন্ধে কিরূপ বলিয়া থাকেন তাহা জানাইবার মানসে 'ডেলী নিউজ' নামক একখানি বিখ্যাত দৈনিক সংবাদপত্রে লিখিত বাস্তবিক ঘটনা সমুদায়ের কিয়দংশ এই স্থলে সন্নিবেশিত করিতেছি।

ইংরাজ ছোটলোকেরা যে বেশ রোজগার করিয়াও অতিশয় ঘৃণিত ও জঘন্য অবস্থাতে আছে, তাহার কারণ কেবল পানদোষ ও অমিতব্যয়। এত রাশি রাশি লোক মদ খাইয়া টাকা উড়াইয়া দেয় যে বোধ হয় কেহ কখন এই দুরবস্থা হইতে ইহাদের উদ্ধার করিতে পারিবে না। আর লণ্ডনে ও অন্যান্য নগরে যেরূপ প্রলোভনের ছড়াছড়ি তাহাতে যে দুর্ব্বলমনা গরিব লোকদের মদ খাইতে আসক্তি হইবে ইহা আশ্চর্য্য নহে। এমন কি যাহারা খাইতে বা কাপড় কিনিতে পয়সা পায় না, তাহারা পর্য্যন্ত বাঁধা দিয়া মদ্যপান করিয়া থাকে। আবার লণ্ডনের পূর্ব্ব দিকে ও অন্যত্র ইহারা যে প্রকার কষ্টে একটি ঘরে সমস্ত পরিবার বাস করে তাহাতে যে ঝক্ ঝকে

মদের দোকান দেখিয়া ইহাদের মন টলিবে তাহা বিচিত্র নহে। অন্যান্য বাবুয়ানার জিনিসের তুলনায় ব্রাণ্ডি, জিন, বিয়ার প্রভৃতি মদ অতিশয় শস্তা, সুতরাং দরিদ্রলোকে অল্প পয়সায় এই আপাতমধুর সুখ ভোগ করিতে পায় বলিয়া ক্রমে ক্রমে মদের দোকানে নিজেদের বলি দেয়। অনেক সময়ে ইহারা আপনাদের দুর্ভাগ্য জীবনের দুঃখ ও কষ্ট ভুলিবার জন্যই চক্‌চকে দোকানে বোতল বোতল মদ সাজান দেখিয়া দৌড়িয়া গিয়া এই বিষাক্ত অমৃত পান করে। সাধারণ ও মধ্যবিত্ত লোকদের মধ্যেও অনেকে দুই একবার মদের দোকানে যাইতে যাইতে শেষকালে এমন মন্দ অভ্যাসে আসিয়া পড়ে যে পব্‌লিক হাউস ব্যতিরেকে আর তাহাদের গতি থাকে না।

এদেশীয় দরিদ্রলোকেরা প্রতিদিনের উপার্জ্জনের চতুর্থাংশ কেবল মদে নষ্ট করে। বিশেষ শনিবার এখানকার একটি ভয়ঙ্কর দিন; দরিদ্রেরা মাহিনা পাইয়া ছুটীর পর বিকাল বেলায় মদের দোকানে গিয়া আশ্রয় লয় ও যতক্ষণ হাতে টাকা থাকে ততক্ষণ দোকান হইতে উঠে না। শনিবারে কোন একটা বড় রাস্তার চার পাঁচটা মদের দোকানে যত পয়সা পায়, রাস্তার দুধারের সমস্ত দোকানে জড়াইয়া তত পায় না। একটা পব্‌লিক হাউসের কাছে দাঁড়াইয়া দেখ, ভিতরে ভয়ানক ভিড়; রাজমিস্ত্রী, মজুর, ভারী, মেতুয়া ইত্যাদি যত নীচ শ্রেণীর লোকে এখানে চীৎকার করিতেছে ও মদ খাইতেছে। আহা! ইহারা যদি মদে পয়সা না উড়াইয়া ক্ষুধিত ও ছেঁড়া কাপড় পরা স্ত্রী ও ছেলেদের আহার ও বস্ত্র কিনিয়া দেয়, তাহা হইলে ইহাদের কষ্টের কত লাঘব হয়। কেবল পুরুষ

নয়, স্ত্রীলোকেরাও পুরুষদের মত সমানে মদ চুষিতেছে। ঠাকুরমা, মা ও মেয়ে আবার মেয়ের কোলে একটী খোকা সকলেই দোকানে গিয়া মদ খাইতে আরম্ভ করিয়াছে; ঠাকুরমা প্রায় আশি বৎসরের বুড়ী, মার বয়স পঞ্চাশ বৎসর, কন্যা প্রায় কুড়ি বৎসরের যুবতী, আর খোকাটি কেবল দুই মাসের। শিশু ভিন্ন ইহারা সকলেই এমন মাতাল হইয়াছে যে, ইহাদের দেখিলে মদে পাগল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই চারিপুরুষ একসঙ্গে মদের দোকানে পড়িয়া রহিয়াছে, সকলকেই দেখিতে অতি জঘন্য ও অপরিষ্কার। কখন কখন আবার মাতাল মায়েরা শিশু সন্তানদেব মুখ হাঁ করাইয়া 'জিন' দিতেছে ও বলিতেছে,—"খোকাও একটু মদের স্বাদ জানুক;" এই রহস্য শুনিয়া মদে মত্ত পিতা বিকটরূপে হাসিতেছে ও 'বেশ' 'বেশ' বলিয়া স্ত্রীর প্রশংসা করিতেছে। এরূপ ভয়ঙ্কর ও বীভৎস দৃশ্য ইংলণ্ড ভিন্ন আর কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না।

কোন শনিবার রাত্রি বারটার সময় ছোটলোকের পাড়াতে একটা মদের দোকানের কাছে দাঁড়াইলে দেখা যায় যে দোকান বন্ধ করিবার সময় হওয়াতে দোকানদারেরা জোর করিয়া যত মাতালদের তাড়াইয়া দিতেছে, আর তাহারা মদে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে—উঠিতে চাহে না বা উঠিতে পারে না। ক্রমে দোকান হইতে তাড়িত হইয়া দুর্ভাগ্য মাতালেরা টলিতে টলিতে রাস্তায় বাহির হয়। কেহ বা যাইতে যাইতে পড়িয়া যায়, ও মাথা মুখ কাটিয়া রক্ত পড়িতে থাকে; অনেক কষ্টে যদি বাড়ী পৌছায় ত নিজের মত মাতাল স্ত্রীর সহিত মারামারি করিতে আরম্ভ করে। কেহ কেহ বা রাস্তায়

পড়িয়াই রাত্ কাটায়, যদি তাহার কোন আত্মীয় কিম্বা দুর্ভাগ্য স্ত্রী, এই শীতের রাত্রিতে তাহাকে না উঠাইয়া লইয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে রাস্তাতেই কঠোর শীতে তাহার প্রাণ বহির্গত হয়।

দুঃখের বিষয় এই যে যাহারা সকলের অপেক্ষা গরিব তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মাতাল হয়। মদ্যপান বশতঃ এখানে যেরূপ ঘৃণাকর ও বীভৎস ঘটনা সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে তাহা কলমে লেখা যায় না। দোকান বন্ধের পর লণ্ডনের পূর্ব্বভাগে বড় বড় রাস্তা হইতে গলির মধ্যে প্রবেশিলে নানা প্রকার ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিতে হয়, কোন লোকেরই সেখানে চক্ষু খুলিয়া রাখিতে ইচ্ছা করে না। (স্ত্রীলোকেরা বিকৃত মুখে এদিক হইতে ওদিকে গড়াইয়া পড়িতেছে আর অতি কুৎসিত ভাষায় চীৎকার করিতেছে বা গান গাইতেছে। আবার পুরুষেরাও মদের ঝোঁকে পিশাচের মত হইয়া ঢলাঢলি করিতেছে। স্ত্রী-পুরুষে দেখা হইলে উভয়ে আরো ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করে; প্রথমে ঝগড়াঝগড়ি ও গালাগালি হইতে আরম্ভ হয়, শেষকালে মারামারি ও খুনাখুনিতে থামে। কোথাও বা চলিতে চলিতে শুনিতে পাইবে যে পাশের বাড়ীর ভিতর হইতে ভয়ানক চীৎকারের শব্দ আসিতেছে, মাতাল স্বামী বাড়ী আসিয়া মারামারির পর স্ত্রীকে সিঁড়ি হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছে বা লাঠি দিয়া তাহার মাথা ফাটাইতেছে আর মৃতপ্রায় দুর্ভাগা স্ত্রীর গোঁ গোঁ শব্দ এবং প্রতিবাসীদের "খুন" "খুন" এই চীৎকার রব গভীর রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া মানুষের হৃদয়ে বজ্রের ন্যায় আঘাত করিতেছে।

স্ত্রীলোকেরা ভয়ঙ্কর ভাবে চারি দিকে ছুটিতেছে, কেহ কেহ উন্মত্তপ্রায় মাতাল স্বামীকে ধরিবার জন্য তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে দৌড়াইতেছে, কেহ বা চলত্‌শক্তি হারাইয়া পড়িয়া রহিয়াছে—শরীর রক্তময় আর রাক্ষসীর ন্যায় অতি বিকট-ভাবে চীৎকার করিতেছে। এই সকল দেখিলে ইহাদের মানুষ বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু ইহা অপেক্ষাও অধিকতর ভয়ানক ব্যাপার প্রায় ঘটিয়া থাকে ;

(অনেক ধনীলোকও মদের বলে সমস্ত ধন উড়াইয়া শেষ-কালে এই ছোটলোকদের সহিত বাস করিতে বাধ্য হয়। চিকিৎসক, ধর্ম্মাচার্য্য, অধ্যাপক প্রভৃতি অনেক শিক্ষিতলোকও পানদোষে এত জঘন্য অবস্থায় আসিয়া পড়ে যে, অবশেষে রাস্তায় রাস্তায় দুই এক পয়সার দিয়াশলাই বেচিয়া বা ভিক্ষা করিয়া অতি কষ্টে জীবন ধারণ করে। দু এক জন ধনী লোক সুরাদেবীর প্রভাবে এমন উৎসন্ন গিয়াছেন যে পথে ঘাটে ফুল বেচিবার ছলে বা গান গাইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ান। কোন কোন দরিদ্রলোকের ঘর দেখিলে কুকুরের বা শূকরের গর্ত্ত বলিয়া বোধ হয় ; স্ত্রী. পুরুষ ও ছেলেরা সকলে পশুর মত জঘন্য ও অপরিস্কারভাবে কেবল একটি ঘরে জীবন কাটায়। কত যে বড় ও মধ্যবিত্ত লোক এই প্রকার ঘৃণিত নিঃসহায় অবস্থায় আসিয়া পড়ে তাহার সংখ্যা করা যায় না, এবং এই মদোন্মত্ত ও সর্ব্বস্বহীন ছোটলোকদের মধ্যে ধনী ও সৎকুল-জাত স্ত্রীলোকদেরও অভাব নাই।

এদেশের দরিদ্রলোকদের এই প্রকার দুরবস্থার বিষয় দেখিলে ও শুনিলে যথার্থই মনে অতিশয় কষ্ট হয়, কিন্তু ইং-

লণ্ডীয় ধনীলোকেরা এ বিষয়ে অত্যন্ত ঔদাস্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা নিজ নিজ সুখ ও স্বার্থ অন্বেষণে সর্ব্বদা ব্যস্ত, এই দুর্ভাগ্যদের কষ্ট ভাবিয়া ব্যাকুলিত হইতে গ্রাহ্য করেন না। বড়মানুষেরা অন্যান্য নানা প্রকার সৎকার্য্যে অনেক অর্থ ব্যয় করেন ও আস্থা দেখান, কিন্তু গরিবদের দুঃখ মোচন করা দূরে থাকুক, অনেকে ইহাদের দুঃখের কথা পর্য্যন্ত অবগত নহেন। কারণ এরূপ জঘন্য কাণ্ডসকল ছোটলোক-দের পাড়াতেই ঘটিয়া থাকে, ভদ্র পাড়াতে বা ভদ্রলোকদের মধ্যে দেখা যায় না। আর পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এদেশের ভদ্রলোকেরা ছোটলোকদিগকে অতিশয় ঘৃণা করে এবং ধনী-লোকেরা ইহাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করে না। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এরূপ মদের প্রভাব নাই, এজন্য কোন স্থানে দরিদ্রদের মধ্যে এমন জঘন্য ও পশুবৎ লোক নাই; বিশেষ ইংলণ্ড ভিন্ন কোন দেশেই স্ত্রীলোকেরা মাতাল হইয়া এপ্রকার বীভৎস আকার ধারণ করে না। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের পবিত্র ভারতবর্ষও এই মদে কলুষিত হইতেছে। আজকাল সে দেশের ধনীলোকদের মধ্যে মদের আদর দেখিতে পাই, এবং শিক্ষিত যুবকসম্প্রদায়ও ইংরাজদের সুরাপান অনুকরণ করিতে ত্রুটি করেন না। আশা করি তাঁহারা উপরি উক্ত বিষয়-গুলি ভাল করিয়া হৃদয়ে লিখিয়া রাখিবেন এবং সাবধান হইয়া চলিবেন।

অনেকে বলেন, মদ না খাইলে ইংলণ্ডে থাকা যায় না ও শরীর সুস্থ থাকে না। আমার বিবেচনায় ইহা সম্পূর্ণ ভুল, মদ খাওয়া বা না খাওয়া কেবল অভ্যাস। আজকাল ইংরাজ-

দের মধ্যেও অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা একেবারে মদ স্পর্শ করে না; আর ধনী ও ভদ্রলোকদের মধ্যে মদ্যপান অনেক কমিয়া আসিয়াছে, ইহাতে তাহাদের উন্নতি ভিন্ন অবনতি হয় নাই। কিন্তু পূর্ব্বকার ন্যায় এখনও অনেক স্থানে বন্ধু বা ভদ্র লোক বাড়ী আসিলে আমাদের দেশের পান তামাকের মত এদেশে মদ ও চুরুট খাইতে দেয়। সেই সময়ে বারংবার খাইতে অস্বীকার করিলে গৃহকর্ত্তা দুঃখিত হন অথবা তাঁহার অবমাননা করা হয়, এই জন্য কোন কোন ভারতবর্ষীয় অনিচ্ছা সত্বেও একটু আধটু পান করিয়া থাকেন, তাহা বলিয়া ইংলণ্ডে আসিলেই যে লোকে মদ খাইয়া বেড়ায় বা মাতাল হয়, ইহা কখন মনে করা উচিত নয়। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মদ দিয়া অভ্যর্থনা করা এদেশের শিক্ষিত লোকদের মধ্য হইতে একেবারে উঠিয়া যাইতেছে, আর সাধারণতঃ মদ্যপানের প্রথার অনেক হ্রাস হইয়া আসিতেছে, তথাপি আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকেরা যদি ইংরাজদের এই কুরীতি অবলম্বন করেন তাহা হইলে ইহা যৎপরোনাস্তি দুঃখের বিষয় হইবে।

---

## চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

### ইংলণ্ডের অন্তর্ভাগ—চাষা ও জমীদার—এদেশের জলবায়ু।

ইংলণ্ডের নগরগুলি যেমন বাড়ী ও কারখানায় আচ্ছাদিত এদেশের পল্লীগ্রাম সেইরূপ প্রকৃতির সবুজ বর্ণ অলঙ্কারে সুসজ্জিত। নগরের বাহিরে গেলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে দুধারে শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র বিস্তৃত রহিয়াছে; মধ্যে মধ্যে ছোট গাছের বেড়াতে সেই ক্ষেতগুলি বিভক্ত হইয়াছে এবং মাঠের উপরে এখানে একটা সেখানে একটা বড় বৃক্ষ উঠিয়া সমতল ভূমির শোভা আরো বৃদ্ধি করিতেছে। দেখিলেই মনে হয় যে মানুষের মন ক্রমাগত একরূপ দ্রব্য দেখিয়া বিরক্ত হইয়া যায়, এই জন্যই অন্তর্যামী পরমেশ্বর মাঝে মাঝে বৃক্ষ নির্ম্মাণ করিয়া মানবমনের সেই বিরক্তির অপনোদন করিয়াছেন। অনেক দূরে চাষাদের দুই একটি কুটীর দেখা যায়, তাহা ভিন্ন সমস্তই সবুজবর্ণ—চারিদিক নানা প্রকার তরু, লতা, গুল্মাদির দ্বারা আচ্ছাদিত। কোন একটা উচ্চ স্থানে উঠিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলে দেখিতে পাই, যে নিম্নদেশে সর্ব্বত্রই একরকম দৃশ্য, যতদূর চক্ষুগোচর হয় দেখি, কেবল সবুজবর্ণ ক্ষেত পড়িয়া রহিয়াছে। বনজঙ্গল কিছুই নাই, কিন্তু কোন কোন স্থান "রুট," "ক্লোভর" ও "হপ" ইত্যাদি প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ ও ছোট ছোট ঝোপে পরিপূর্ণ। আবার কোথাও বা মাঝে মাঝে পীতবর্ণ

ক্ষুদ্র প্রবাহিনী সর্পের ন্যায় বক্রভাবে বহিয়া যাইতেছে, এবং উহার দুই পাশের মাঠ অধিকতর উর্ব্বরতা প্রাপ্ত হইয়া প্রচুর পরিমাণে ঘাস উৎপাদন করিতেছে; ঐ ঘাসের উপর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গরু ও ভেড়া প্রভৃতি গ্রাম্যজন্তুরা মনের আনন্দে চরিতেছে, রোমন্থ করিতেছে বা খেলিয়া বেড়াইতেছে। বোধ হয় এইরূপ অপরিমিত খাদ্য পায় বলিয়াই ইংলণ্ডীয় জন্তুরা এত হৃষ্টপুষ্ট ও বলবান। যে ক্ষেতগুলিতে চাষ দেওয়া হইয়াছে সেগুলির উপর আবার নানা প্রকার শস্য ও শাকসবজী ইত্যাদি আহার্য্য দ্রব্য জন্মিয়াছে; যব, গম, আলু ও কপি অধিকাংশ ভূমি ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

আমরা যখন সমস্ত লোকজন ছাড়িয়া মাঠের ধারে ধারে বেড়াই, তখন ইংলণ্ডের নগরসমূহের শোভা ভুলিয়া কেবল প্রকৃতির এই কমনীয় সৌন্দর্য্যের আলোচনা করি। যেদিকে চাই, সে দিকেই সবুজ দেখি এবং সেই একপ্রকার নয়নের প্রীতিকর দৃশ্য আমাদের মনোরঞ্জন করে। এই সকল তরুলতাপূর্ণ ভূমিকে ইংরাজীতে "মেডো" অর্থাৎ মাঠ বলে। এই মেডো ব্যতীত মধ্যে মধ্যে আবার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পড়াভূমি দেখিতে পাওয়া যায়; ইংরাজীতে সেগুলাকে 'কমন্স' অর্থাৎ 'সাধারণ ভূমি' বলে। মানুষে গৃহনির্ম্মাণ বা কৃষিচালনা দ্বারা এইগুলির অকৃত্রিম শোভাকে এখনও বিনষ্ট বা কলঙ্কিত করে নাই। এই নিস্তব্ধ জনশূন্য স্থানে কেবল অনেক দূর অন্তরে দুই একটা ঘোড়া চরিতেছে, তাহা ভিন্ন এখানে আর অন্য কোন জীবের সমাগম নাই। এই পড়াভূমি আমাদের দেশের জঙ্গলময় পড়াভূমির মত নয়, এখানে কোন হিংস্র জন্তুর

উপদ্রব নাই, এবং ইহার উপর বেড়াইতে সাপ ইত্যাদির ভয়ে সঙ্কুচিত হইতে হয় না। এ জমীর উপর কেবল ঘাস ও ছোট ছোট বন্য তরু জন্মিয়া থাকে, ইহার মাটী অতিশয় কঠিন ও অসমান। ইংলণ্ডের সমস্ত জমী আদিম অবস্থায় এইরূপ দৃঢ় ছিল, এই ভূমিকে চাষ দিতে ও মানুষের বাসের উপযোগী করিতে যে কত ধৈর্য্য ও পরিশ্রমের আবশ্যক হইয়াছিল, তাহা ভাবিলে রোমাঞ্চ হয়। কিন্তু ইংরাজেরা সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়ের বলে এই কঠিন ও কষ্টকর কর্ম্মে সম্পূর্ণরূপে সফল হইয়াছে। উহা অপেক্ষাও অনেক নিকৃষ্ট বন্যজমীর সহস্র সহস্র বিঘা ইহারা প্রতি শতাব্দীতে পরিষ্কার করিয়া সুন্দর মাঠ প্রস্তুত করে এবং পরে ঐ মাঠকে ক্ষেতের মত করিয়া উহার উপর চাষ দেয় ও উহাকে ফলবতী করে।

ঐ সকল মাঠে বেড়াইতে বেড়াইতে অনেক সময়ে প্রায় দুই ঘণ্টা অন্তর বৃষ্টি খাইতে হয়, কিন্তু ইহাতে ভূমির শোভা অধিকতর মনোহর হইয়া সে কষ্ট দূর করিয়া দেয়। মাঠের ঘাস নবীন ও সজীব হইয়া উঠে, ছোট ছোটবৃক্ষ পত্র হইতে পতোনোন্মুখ জলবিন্দুগুলি মুক্তারাজির ন্যায় ঝকিতে থাকে, নবোদিত সূর্য্যকিরণে আচ্ছাদিত হইয়া সমস্ত মাঠ আরো উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয় এবং শুভ্র ও পীতবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘাসের ফুলগুলিতে সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হইয়া উহাদের মনোহারিতা দ্বিগুণতর বৃদ্ধি করে। মাথার উপর ঐ ধূসরবর্ণ আকাশেও আবার কখন কখন মনোহর দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। উহা প্রায় সকল সময়েই কাল ও পাঁশুটে মেঘে আচ্ছন্ন; কোন কোন মেঘ দ্রুতবেগে ছুটিতেছে, আবার কোনটিবা স্থিরভাবে

রহিয়াছে। দেখিতে দেখিতে কতকগুলি মেঘ মৃদু মন্দ গতিতে আসিয়া ঐ নিশ্চল মেঘরাশিকে ঢাকিয়া ফেলিল, অমনি উহা পদদলিত সর্পের ন্যায় যেন ফণা তুলিয়া দূরে সরিয়া গেল; অনতিবিলম্বে আর একটি মেঘ আসিয়া তাহার স্থান পূর্ণ করিল,—এইরূপে একটির পর আর একটি, সিঁড়ির ন্যায় স্তরে স্তরে মেঘ আসিয়া সমস্ত আকাশ ব্যাপিতে লাগিল। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই আবার হাতীর মত ধূসরবর্ণ ও বৃহদাকার মেঘরাশি আসিয়া আকাশে প্রলয় উপস্থিত করিল, স্তরীকৃত মেঘগুলি ছিন্নভিন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া পলাইতে লাগিল এবং ক্রমে ঐ ভীষণাকার মেঘ হইতে জলধারা পতিত হইয়া সমস্ত শোভা বিনষ্ট করিয়া ফেলিল।

(ইংলণ্ডের পল্লীগ্রামের কুটীরগুলি দেখিতে অতিশয় দরিদ্র; দূর হইতে দেখিলে আমাদের দেশের চাষাদের কুঁড়েঘর মনে পড়ে। এই সকল কুটীরের দেয়াল কেবল মাটি ও কাঠ দিয়া নির্ম্মিত, ছাদ খড়ের দ্বারা ছাওয়া, ঘরগুলি অত্যন্ত নীচু ও কম চওড়া, জানালা অতি অল্প ও ছোট ছোট, এবং পাশাপাশি দুটি ঘরের মাঝখানকার দেয়াল অতিশয় পাতলা। শীতকালে এই রকম দুটি ঘরে একটি বৃহৎ পরিবার অতি কষ্টে এক রকম জড়সড় হইয়া বাস করে; ইহাদের এই সময়ের অবস্থা ভাবিলে দুঃখ হয়। ঘরের ভিতর ধূ ধূ করিয়া একটি প্রকাণ্ড আগুন জ্বলিতেছে এবং চারিদিকে ছেলেদের আধ ভিজা কাপড়গুলি শুকাইতেছে; আবার যখন ক্রমাগত বৃষ্টি বা বরফ পড়িতে থাকে, তখন তাহারা বাহিরে যাইতে পারে না, এবং এই ঘরের অস্বাস্থ্যকর বায়ু সেবন করিয়া আগুন ও কাপড়ের

ধোঁয়ার মধ্যে একাদিক্রমে অনেক ঘণ্টা বাস করিতে বাধ্য হয়। এইরূপ একটা খড়ুয়া ঘরে একজন চাষা বাস করে, সে মাসে প্রায় ত্রিশ টাকা উপার্জ্জন করে; এই বাড়ীর জন্য তাহাকে বৎসরে চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা ভাড়া দিতে হয়, তাহা ছাড়া চার পাঁচটি ছেলে ও স্ত্রীর আহার, পরিচ্ছদাদি যোগাইতে হয়। যাহা হউক, এই ক্ষুদ্র কুটীরটিও অতি পরিষ্কার, সমস্ত জিনিস-গুলি পরিপাটীরূপে সাজান রহিয়াছে, আগুনের জায়গাটি লোহাদ্বারা অতি উত্তমরূপে নির্ম্মিত। গৃহের অন্ততঃ একটি ঘরের মেজেতে পুরাণ গালিচা বা কার্পেট পাতা, কোন কোন বাড়ীর দেয়ালে চিত্রিত কাগজ মারা এবং তার উপর দুই চার খানা ছবি টাঙ্গান থাকে; ঘরে কতকগুলি পালিস্ করা কাঠের চৌকী ও একটি টেবিল আছে। একটি থাকের উপর একখানি বড় বাইবেল, আবার কখন কখন অনেক-গুলি ধর্ম্মপুস্তক, নূতন গল্পের ও চাষবাসসম্বন্ধীয় বহিও থাকে। অধিক কি, যথার্থই এ প্রকার একটি দরিদ্রের কুটীরে আমাদের দেশীয় অনেক গৃহস্থদের বাড়ীর অপেক্ষা নানা প্রকার আবশ্যক ও অনাবশ্যক দ্রব্য আছে। ভারতীয় কৃষকদের গৃহের মত ইহাদের বাড়ীতে ভাঙ্গা জানালা বা দরজা, পচা নর্দ্দামা, চারিদিকে গোবরের ঢিপি, ময়লা ও এলোমেলো জিনিস ইত্যাদি কিছুই দেখিতে পাই না।

সকালবেলা নয় দশটার সময় একজন ইংরাজ কৃষকের বাড়ী গেলে দেখিতে পাইবে, যে ঘরের গৃহিণী খাটিয়া খাটিয়া একবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তবুও তাহার কর্ম্মে বিরক্তি নাই। সে তাহার ছোট ছোট ছেলেদের নাওয়াইয়া,

অনেক কষ্টে নিজের কাচা পরিষ্কার কাপড়গুলি পরাইয়া দিতেছে; পরে তাহাদের খাওয়াইয়া নিকটে কোন পাঠশালা থাকিলে বড়গুলিকে সেখানে পাঠাইয়া এবং ছোট ছেলেদের ঘুম পাড়াইয়া নিজে সংসারের কাজে মন দিতেছে। আবার বিকাল বেলা ছয় সাতটার সময় দেখিবে, বাড়ীর কর্ত্তা সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া বাড়ী আসিবার পর সমস্ত পরিবার এক সঙ্গে রুটী ও চা খাইতেছে। ভোজন শেষ হইলে পর গৃহ-স্বামী একটি চৌকীর উপর বসিয়া বিশ্রাম লইতেছে এবং তাহার পাশে গৃহিণী ও সন্তানেরা বসিয়া আছে; গৃহিণী সেলাই করিতে করিতে স্বামীর সহিত নানা প্রকার কথা কহিতেছে আর ছেলেরা পিতামাতার গল্প শুনিতেছে বা নিজে নিজে খেলিতেছে। ইহারা শিক্ষিত নয় বটে, কিন্তু তবুও ইহাদের সকল কর্ম্মের নিয়ম ও সুশৃঙ্খলা দেখিলে আশ্চর্য্য ও আনন্দিত হইতে হয়। আমাদের দেশে চাষাদের মধ্যে এ রকম পরিষ্কার ও পরিপাটী কুটীর প্রায় দেখা যায় না।

এদেশের গ্রামসকল ভারতবর্ষের গ্রাম অপেক্ষা বড় বড়; অনেক গ্রামে পাঁচ ছয় শত লোকের বাস এবং সেগুলির বাড়ী ও রাস্তা সে দেশের গ্রামের বাড়ী ও রাস্তা অপেক্ষা ভাল ও পরিষ্কার। প্রতিগ্রামেই এক একটি ছোট ও পরিষ্কার সরাই আছে, তাহাতে বেশ স্বচ্ছন্দে দু চার দিন থাকা যায়। এখানেও অনেক কোঠা বাড়ী দেখিতে পাই, ছুতার, কামার ইত্যাদি শ্রমজীবীদের বাসস্থানগুলিও ইটের নির্ম্মিত, এবং উহাদের ছাদ লাল টাইল দিয়া ঢাকা। এই ঘরগুলি চাষা-

দের কুটীরের অপেক্ষা অনেক ভাল, এবং বাড়ীর সম্মুখে ও পশ্চাতে এক একটি ছোট বাগান আছে। এই সকল শ্রমজীবীদের বাড়ীতে কৃষকদের গৃহের অপেক্ষা অধিক ও দামী জিনিস আছে—সমস্তই বেশ পরিষ্কার ও সাজান। দুঃখের বিষয় নগরবাসী লোকদের মত এই সকল গ্রাম্য শ্রমজীবী লোকেরাও অনেক খাইতে ও পান করিতে ভাল বাসে এবং মাংস ও মদ খাইয়া টাকা উড়াইয়া দেয়।

(ইংলণ্ডের চাষবাসের ব্যবস্থা আমাদের দেশের হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভারতবর্ষের কৃষকেরা জমীদারের নিকট হইতে জমী ভাড়া লইয়া নিজেরা চাষ দেয়; কিন্তু এদেশে একদল লোক বড় বড় জমীদারের কাছ থেকে এক সঙ্গে অনেক জমী ভাড়া লয় এবং তাহারাই মাহিনা দিয়া চাষাদের নিযুক্ত করে; ঐ লোকদের ইংরাজীতে "ফার্ম্মার" বলে এবং তাহাদের দখলের জমীকে "ফারম্" বলে।) এখানে অনেক রকমের ফারম্ আছে; কোনটিতে কেবল গমাদি শস্য জন্মে, কোনটিতে অনেক গরু থাকে এবং কেবল দুধ ও দুধের জিনিসের কারবার করে, এবং কোন কোনটিতে বা মুর্গী, ভেড়া, ঘোড়া ইত্যাদি অনেক জন্তু থাকে। ফারম্গুলি অতি পরিষ্কার এবং উহাদের সমস্ত কাজ অতি সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহিত হয়। কোন কোন ফার্ম্মারের তাঁবে তিন শত বিঘা জমী থাকে, তাহাকে ঐ ভূমির জন্য জমীদারকে খাজনা এবং রাজসরকারকে টেক্স দিতে হয়। কেহ কেহ বার তের শত বিঘা পর্য্যন্ত জমী ভাড়া লইয়া চাষ দেয়। চাষারা দিনের বেলায় আসিয়া কেবল মজুরের মত খাটে

ও মাহিনা পায়, জমীতে তাহাদের কোন স্বত্ব নাই; ফার্ম্মার বা ক্ষেত্রস্বামীরাই জমীর চাষবাস ও ভালমন্দ দেখাশুনা করে এবং সমস্ত খরচ বাদ দিয়া ফসল হইতে যাহা লাভ হয়, তাহা নিজেরাই ভোগ করে। ক্ষেত্রস্বামীরা এক একটি অতি চমৎকার বাড়ীতে বাস করে, বাড়ীর চারিদিকে সুন্দর বাগান ও বড় বড় গাছ এবং সম্মুখে একটি ছোট গাড়ীবারাণ্ডা আছে। বাড়ীর ভিতরটী সুন্দররূপে সাজান, গৃহে কোন প্রকার আসবাব বা দ্রব্যের অভাব নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্র-স্বামীরাই বড় বড় ব্যবসায়ীদের মত খুব জাঁকজমকে বাস করে; ইহারা বেশ শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান্ এবং ইহাদের গৃহিণীরাও বুদ্ধিমতী ও সংসারের কাজকর্ম্ম উত্তমরূপ বুঝে।

ফারমে ভিতরে অনেক গরু, ঘোড়া, ভেড়া, মুর্গী ইত্যাদি জন্তুরা আলাদা ঘরে থাকে, ঐ ঘরগুলি পরিষ্কার এবং উহাতে সর্ব্বদা বাতাস খেলে। প্রায় সকল ফারমে বড় বড় আস্তা-বল আছে, এখানে ঘোড়া, গরু প্রভৃতি জন্তুকে অতি যত্নে রাখে। কোথাও কোথাও ঐ জন্তুদিগকে হৃষ্ট পুষ্ট ও বলবান্ করিবার জন্য প্রায় ছয়মাস একাদিক্রমে আস্তাবলে রাখিয়া দেয় এবং উহাদের উত্তম উত্তম পুষ্টিকর দ্রব্য খাইতে দেয়। ইংলণ্ডের প্রায় সকল প্রকার গ্রাম্য জন্তুই আমাদের দেশের অপেক্ষা বড় ও মোটা; অপরিমিত আহার, মানুষের যত্ন ও স্বাস্থ্যকর বায়ু উহাদের এত বলিষ্ঠ, স্থূলকায় ও বৃহদাকার করে। এখানকার ভেড়া এত বৃহৎ ও লোমময় যে, ভারতবর্ষ হইতে আসিয়া ইহাদের প্রথম দেখিলে ভেড়া বলিয়াই বিশ্বাস হয় না। এক একটা সামান্য গরু সেদেশের পাহাড়ী গরু

অপেক্ষা বড় ও মোটা এবং দিন প্রায় দশ বার সের করিয়া দুধ দেয়। লণ্ডন ও অন্যান্য স্থানের সামান্য ঘোড়াগুলি অনেক সময়ে আমাদের দেশের ধনীলোকদের ঘোড়া অপেক্ষা বৃহৎ, সবল ও হৃষ্ট পুষ্ট। এদেশের কতকগুলি ঘোড়া এত প্রকাণ্ড যে উহাদের দেখিলে হাতীর জাত বলিয়া বোধ হয়। লণ্ডনে এবং অন্যত্র সচরাচর অনেক ঘোড়া দেখিতে পাই, তাহারা প্রায় পাঁচ ছয় হাত উঁচু আর এত বড় ও বলিষ্ঠ যে ভারতের ঘোড়ারা ইহাদের শাবক বলিয়া বোধ হয়। এদেশে গ্রাম্য জন্তুদের উপর অতিশয় যত্ন করিয়া থাকে, এবং এইগুলি অন্যান্য দেশের জন্তুদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইলেও ইংরাজেরা ঘোড়া, গরু ইত্যাদিকে অধিকতর বলবান্ ও হৃষ্ট পুষ্ট করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে এখানে ঘোড়দৌড় ও জন্তুর মেলা প্রায়ই হইয়া থাকে, এইজন্য আড়াআড়ি করিয়া ইংরাজেরা জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সাহায্যে গ্রাম্য জন্তুদের উন্নত করিতে প্রাণপণে যত্ন করে।

(এদেশে চাষ সম্বন্ধীয় প্রায় সমস্ত কর্ম্ম হাত, গরু বা ঘোড়ার পরিবর্ত্তে ধোঁয়াকলের দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। লাঙ্গল দেওয়া, মই দেওয়া, শস্য মাড়া, ভূমি পরিষ্কার রাখা ইত্যাদি সকল কাজই কলের দ্বারা অতি শীঘ্র ও সুন্দররূপে সম্পাদিত হয়।) এই কল ব্যবহার করাতে মানুষের যে কত কষ্ট ও পরিশ্রমের লাঘব হয় তাহা বলা যায় না, আর সময় ত অনেক বাঁচেই; এবং সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাতে অধিক ব্যয়ের পরিবর্ত্তে হাতে চাষদেওয়ার অপেক্ষা অল্প খরচ পড়ে।) দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের কৃষকেরা এই সকল কলের ব্যবহার

সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ, আর এ বিষয়ে জমীদারদের ত কোন চেষ্টাই নাই; এবং তাহারা এই কল ব্যবহারের সুবিধা জানিলেও সেই চিরপ্রচলিত প্রথা ত্যজিতে অগ্রসর হয় না। সেখানে প্রাণপণে শ্রম করিয়া যে কাজ সাধিতে প্রায় এক মাস কাটায়, এখানে সেই কাজ কলের সাহায্যে প্রায় দশ দিনে করিয়া ফেলে। ইংরাজেরা অন্যান্য সকল কর্ম্মের ন্যায় কৃষিবিদ্যাতেও যথেষ্ট যত্ন লয় এবং যাহাতে ইহার উন্নতি হয় ক্রমাগত তাহার চেষ্টা করে। কৃষিবিদ্যাতেও অন্যান্য বিদ্যার মত বুদ্ধি, বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়, বিশেষ এদেশের ভূমি ভারতের মত উর্ব্বরা ও ফলবতী নহে—এখানে বিনাকষ্টে কিছুই হয় না; অতএব এখানকার কৃষকেরা এই-রূপ বুদ্ধি ও কৌশল খাটাইয়া নানা প্রকার কলের ব্যবহার ও অন্যান্য উপায়ের দ্বারা ইংলণ্ডের মাটিকে ফলোৎপাদনের উপযুক্ত না করিলে এদেশে কোন প্রয়োজনীয় শস্য বা ফল জন্মিত কি না সন্দেহ।

(যদিও ক্ষেত্রস্বামী ও কৃষকদের দূর হইতে সুখী বলিয়া বোধ হয়, তথাপি এদেশের দরিদ্রদের অবস্থা ক্রমে আরো মন্দ হইয়া যাইতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ইংলণ্ডীয় চাষাদের ভূমিতে কোন প্রকার স্বত্ব নাই, আর ইহারা কেবল মজুরের মত খাটে। যথেষ্ট উপার্জ্জন করিলেও ইহারা অমিতব্যয়িতার দোষে সুখস্বচ্ছন্দতা কাহাকে বলে জানে না। ভারতবর্ষীয় কৃষকেরা ইহাদের মত এত কাজ ও এত উপার্জ্জন করে না বটে কিন্তু তাহারা ইংরাজ চাষাদের অপেক্ষা অনেক সুখী। আমাদের দেশের চাষারা মদ্যপান, রাশি রাশি মাংস আহার

ইত্যাদিকে জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ভাবিয়া এখানকার ঐ অবস্থার লোকদের মত পশুবৎ হইয়া থাকে না। এদেশে সকলদিকেই বাবুয়ানা ক্রমাগত বাড়িতেছে; চাষারা পর্য্যন্তও প্রতিদিন টাট্‌কা মাংস, বোতলপোরা মদ খাওয়া ও নানা প্রকার শারীরিক আরামে সমস্ত টাকা খরচ করে। আবার এদেশের বড় ক্ষেতগুলির ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে; ভূস্বামীরা পড়ামাঠগুলা কিনিয়া ঘিরিয়া লইতেছে; এইজন্য ঐগুলি ক্রমে ছোট হইয়া যাইতেছে বা একেবারে লোপ পাইতেছে। সেই জন্য চাষাদের মুর্গী, শূকরাদি রাখিবার উপায় ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। এইরূপে চাষাদের জমীতে কোন অধিকার না থাকায় নিজেদের হস্তচালনাই তাহাদের একমাত্র জীবনোপায় হইয়াছে এবং এমন কি তাহাদের স্ত্রী পুত্রেরাও অনেক সময়ে ক্ষেতের কাজ করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে। এদেশের কৃষিকর্ম্ম কারুকর্ম্মের ন্যায় নির্ব্বাহিত হওয়াতে নাগরিক শ্রমজীবীদের মধ্যে যে সকল দোষ ও উহাদের জীবনে যে সকল ক্লেশ লক্ষিত হয় কৃষিজীবীদের মধ্যেও প্রায় সেই সকল দেখিতে পাওয়া যায়।

(ডিউক, আর্‌ল, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত লোকেরা এদেশের অধিকাংশ ভূমির স্বামী; ইহাঁরাই ফার্ম্মার বা ক্ষেত্রস্বামীদের সমস্ত জমী ভাগ করিয়া ভাড়া দেন।) অবশ্য এদেশের ভূস্বামীরা ঠিক্ ভারতবর্ষের জমীদারদের মত নয়, বিশেষ বাঙ্গালার জমীদারেরা কেবল ইংরাজ সরকারের করসংগ্রাহক বলিলেই হয়। এখানকার ভূস্বামীরা অতিশয় ধনী এবং ইহাঁরা অনেক সৎ বিষয়ে অর্থ দান করিয়া থাকেন, আর

ইঁহারা আমাদের দেশের জমীদারদের অপেক্ষা অধিক শিক্ষিত, উন্নতমনা ও শ্রমসহিষ্ণু। এদেশে কেবল জ্যেষ্ঠ পুত্র বিষয় পাওয়াতে আমাদের দেশের মত কোন সম্পত্তিই একেবারে ছারখার হইয়া যায় না; বিষয়গুলি কমিয়া যাইবার পরিবর্ত্তে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। মন্দ পক্ষে আবার এই যে, এদেশের ভূমি অতি অল্প লোকের হাতে এবং তাঁহারা যে কেবল স্বার্থ বুঝেন আর দান করিলেও যে দরিদ্রদের প্রতি যথার্থ অনুকূল নহেন তাহা এদেশের শ্রেণীভেদ ও দরিদ্র লোকের অবস্থা দেখিলেই অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। ভূস্বামীরা কেবল গ্রীষ্মকালের তিন চারি মাস লণ্ডনে থাকেন এবং বৎসরের অবশিষ্ট ভাগ প্রায়ই পল্লীগ্রামে স্ব স্ব জমীতে নির্ম্মিত বড় বড় উদ্যানবেষ্টিত অট্টালিকায় বাস করেন। (ইংলণ্ডে ছোট বড় অনেক সম্পত্তিশালী নগর আছে, বোধ হয় তাহাদের মধ্যে লিবারপুল ও মাঞ্চেষ্টারের নাম অধিকাংশ ভারতবাসীই শুনিয়াছেন।) লিবারপুলে নানা দেশ হইতে তুলার আমদানী হয়; সেই তুলা মাঞ্চেষ্টারে পাঠানর পর সেখানে বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া আবার লিবারপুলে ফিরিয়া আসে. এবং এই বন্দর হইতেই কাপড়গুলি পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে পাঠান হইয়া থাকে। আজ কাল ভারতবর্ষের এক জোড়া সামান্য কাপড় বা গামছার থান কিনিলে তাহাতে মাঞ্চেষ্টারের ছাপ দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব ছোট বড় সকলেই মাঞ্চেষ্টারের কার্পাসের বিষয় জানেন। মাঞ্চেষ্টারকে একটা কারখানার নগর বলিলেই হয়। ইহার সমস্ত ভাগে কেবল বড় বড় কারখানা আছে এবং উহাদের ভিতরে কলগুলি সোঁ

সোঁ, ঘট্ ঘট্ করিয়া সমস্ত দিন চলিতেছে। শুনিয়াছি পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নাই যেখানে ম্যাঞ্চেষ্টারনির্ম্মিত সূতা বা বস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায় না।

লিবারপুল একটি প্রকাণ্ড নগর; ইহাতে প্রায় ছয় লক্ষ লোকের বাস এবং অনেক বিষয়ে লণ্ডনের সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য আছে। লিবারপুল ইংলণ্ডের উত্তর দিকে, সমুদ্রের অতি নিকটে মার্সী নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে অনেকগুলি বৃহৎ বৃহৎ "ডক" অর্থাৎ জাহাজের আড্ডা আছে; তাহাদের উপর রাশি রাশি তুলার গুদামঘর দুর্গপ্রাচীরের মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, প্রায় সমস্ত পৃথিবীর কার্পাস এখানে আসিয়া রাশীকৃত হইয়াছে। মার্সী নদীর উপর প্রায় তিন ক্রোশ পর্য্যন্ত এত জাহাজের ভিড় যে শীতকালে ইহাদের স্তূপাকার শত শত মাস্তল একত্র দেখিলে বৃহৎ বৃক্ষরাজিপূর্ণ বিশাল অরণ্য ক্ষেত্র বলিয়া ভ্রম হয়। এই জাহাজগুলি নানা দেশ হইতে দ্রব্য ও ধন আনিয়া এখানে উপস্থিত হয়; দেখিবামাত্র মনে হয় যেন জগতের সমস্ত অর্থ কেবল ইংলণ্ডের জন্য স্বষ্ট হইয়াছিল। বাণিজ্যের জন্যই এই নগর এত বিখ্যাত এবং বাণিজ্যের প্রভাবেই ইহা এত ঐশ্বর্য্যশালী। এখানকার প্রায় সকল স্থান লণ্ডনের মত প্রকাণ্ড ও সমৃদ্ধ। ইংলণ্ডের সকল বড় বড় নগরেই মদ খাওয়ার অতিশয় ধুম্‌ধাম্, কিন্তু শুনিয়াছি এই সম্বন্ধে লিবারপুলে যেরূপ নির্লজ্জ ও জঘন্য কাণ্ড হয় এরূপ আর কোথাও দেখা যায় না। আমি দেখিতে পাই যে এদেশে যেখানে যত ধন, কারখানা ও বাণিজ্যের প্রাদুর্ভাব সেইখানেই তত মদ্যপানের আধিক্য।

অন্যত্র বলিয়াছি যে এদেশ পাথরিয়া কয়লা ও লোহার খনির জন্য বিখ্যাত। ইংলণ্ডের উত্তর দিকে বকিংহাম্ নগর হইতে উলবরহাম্পটন্ নগর পর্য্যন্ত ছয় ক্রোশ স্থানে ক্রমাগত কেবল কয়লার খনি ও লোহার কারখানা দেখিতে পাওয়া যায়, এবং এই দেশভাগটি ধোঁয়া ও কয়লায় সর্ব্বদাই কালময় হইয়া থাকে, এই জন্য ইংরাজেরা ইহাকে "কাল দেশ" কহিয়া থাকে। এরূপ অদ্ভুত স্থান পৃথিবীর অন্য কোন দেশে দৃষ্ট হয় না। এই "কাল দেশ" দেখিলে, অন্ততঃ ইহার বিষয় পড়িলে ইংরাজদের পরিশ্রম ও সহিষ্ণুতার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, এবং ইংলণ্ড যে কি কারণে এত সমৃদ্ধিশালী তাহাও বোধগম্য হয়। মাঞ্চেষ্টার, লিবারপুল প্রভৃতি নগর যেমন সূতা ও কাপড়ের কারখানা, তুলা ও তুলার গুদাম, রাশি রাশি পরিচ্ছদ বস্ত্র ইত্যাদি মূল্যবান দ্রব্যে পরিপূর্ণ, এই স্থানটি সেইরূপ কয়লা ও লোহা এই দুইটি অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দ্বারা আচ্ছাদিত। এই কয়লা ও লোহা হইতে ইংলণ্ড এত ধনবান হইয়াছে বলিয়া অনেকে এই দুই সামগ্রীকে " কাল সোনা " নাম দিয়া থাকে।

এই "কালদেশের" জমী কাল, মাথার উপরে আকাশ কাল, এবং মাটির নীচে অনেক ক্রোশ পর্য্যন্ত গভীর কৃষ্টবর্ণ, স্তরে স্তরে কাটা, খনি বিস্তৃত রহিয়াছে। এই দৃশ্য ভাবিতে অতি আশ্চর্য্য এবং দেখিলে যে কি পর্য্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইতে হয় তাহা প্রকাশ করা অসাধ্য, আবার রাত্রিতে আসিয়া প্রথম নিরীক্ষণ করিলে এই স্থান অতি ভয়ঙ্কর বলিয়া বোধ হয়। ঐ সময়ে লৌহকারখানার বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডসমূহ প্রদীপ্ত

হইয়া আগ্নেয়গিরির ন্যায় ভীষণ স্পন্দমান শিখা উদ্গত করিতেছে; উহাদের গর্জ্জনশব্দ চতুর্দ্দিকে বহুদূর অবধি শ্রবণ-গোচর হইতেছে; শত শত ধূমনলরাজি-বিনির্গত অগ্নিদ্যুতি তামসী নিশা ভেদিয়া লোহিত ময়ূরপুচ্ছের শোভা বিস্তার করিতেছে; স্তূপাকার জ্বলন্ত লৌহপাথরের নিষ্প্রভ দ্যুতি নিরখিয়া ভ্রম হয় যেন পৃথিবীতে প্রলয় উপস্থিত হইয়াছে এবং সমস্ত জগৎ মহাগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত হইয়া যাইতেছে; মস্তকো-পরি অতিঘনসন্নিবিষ্ট ধূমরাশিতে নিম্নবর্ত্তী অগ্নিকুণ্ডের মলিন প্রতিবিম্ব পতিত হইয়াছে এবং সেই ঈষদুদ্দীপ্ত ধূমরাশি একত্রীভূত হইয়া বায়ু দ্বারা মেঘবৎ নিরন্তর সঞ্চালিত হইতেছে; আবার এই সময়ে বাষ্পের শন শন শব্দ, কলবলের ঘট ঘট ধ্বনি, জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের গর্জ্জন এবং বৃহদাকার লৌহমুদ্গরের ভীষণ আঘাতনিনাদ এই নির্জ্জন ও অন্ধকার রাত্রিতে দ্বিগুণতর ভয়ঙ্কর হইয়া চক্ষু ও কর্ণ উভয় ইন্দ্রিয়কেই একেবারে অবশ করিয়া দেয়। এই বীভৎস পাতালভূমি হইতে পলাইয়া যাইতে ইচ্ছা করে। দিনের বেলায় এই স্থানের পাশ দিয়া গেলে ঐ সকল শব্দ শ্রুতিগোচর হয় বটে কিন্তু রাত্রিকার সেই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে না। এই-রূপ ভয়াবহ কাণ্ডই যে ইংলণ্ডের এত সমৃদ্ধির মূল এবং ব্রিটিষ ব্যবসায়ের একটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বিভাগ ইহা শীঘ্র বিশ্বাস হইবে না। কয়লা ও লোহার যে কত বিপুল প্রভাব তাহা এইখানে আসিলে জীবনে প্রথম অবগত হওয়া যায়। মনে হয় না যে এ স্থল কখন মানুষের আবাসভূমি হইতে পারে কিন্তু এইখানেই আবার খনক, কামার প্রভৃতি শ্রমজীবীলোক

বাস করে। সূর্য্য চন্দ্রের আলোক তাহাদের কুটীরে কখনই প্রবেশ করে না বলিলে হয়, এবং এই সকলপ্রকার আরাম ও সৌন্দর্য্য বিহীন প্রদেশে তাহারা যে কিরূপে জীবন যাপন করে তাহা সম্যক্‌রূপে বোধগম্য হওয়া এক প্রকার অসাধ্য।

অন্যান্য অনেক দ্রব্যের ন্যায় ইংলণ্ডের জলবায়ুও অতি অপরূপ। সকলেই ইংলণ্ডকে শীতপ্রধান দেশ বলিয়া জানেন, কিন্তু এখানকার জলবায়ু যে কি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল তাহা কেহ এদেশে না বাস করিলে উত্তমরূপে বুঝিতে পারিবেন না। এখানে নামমাত্র ভিন্ন ভিন্ন ঋতু আছে বটে, কিন্তু কখন যে শীতকাল শেষ হয় ও বসন্তকাল আরম্ভ হয় বা কতদিন গ্রীষ্ম-কাল থাকিবে তাহা ঠিক্ করিয়া বলা অতি দুষ্কর। যদিও এই দ্বীপে চারিদিক হইতে সমুদ্রের বাতাস বহাতে ফ্রান্স জর্ম্মণি প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী দেশের ন্যায় ভয়ঙ্কর শীত বা অধিক গ্রীষ্ম হয় না তথাপি এরূপ জঘন্য পরিবর্ত্তনশীল জলবায়ু আর কোথাও দেখি নাই। পশ্চিমে আটলাণ্টিক মহাসাগর হইতে অনবরত ভয়ানক ঝড় ও বৃষ্টি আসিয়া থাকে এবং মধ্যে মধ্যে উত্তর ও পূর্ব্বদিক হইতে অতি তীক্ষ্ণ শীতল বায়ু বয়। বৎসরে দুই তিন মাস ভিন্ন এখানে দুর্ব্বল বা পীড়িত লোকদের বাস করা অতি কষ্টকর, এবং বিদেশীয়েরা আসিয়া এদেশে অতি সতর্কভাবে না থাকিলে শীঘ্রই পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু এত মন্দের সঙ্গে অনেক ভাল গুণও আছে। এখানকার আবহাওয়া পরিবর্ত্তনশীল হইলেও অস্বাস্থ্যকর নয়। ইংরাজেরা বাল্যকাল হইতে এই অস্থির ও কষ্টজনক জলবায়ু সহ্য করিতে শিখে বলিয়া ইহারা অতিশয় কষ্টসহ হয় এবং কোন প্রকার

কঠিন কর্ম্ম করিতে সঙ্কুচিত বা শীঘ্র কাতর হয় না। এই প্রকার দেশে জন্মগ্রহণ হেতু ইংরাজ নাবিকেরা সমস্ত ক্লেশকে অগ্রাহ্য করিয়া দিবারাত্র সমুদ্রের উপর ভ্রমণ করে ও নানাদেশ ঘুরিয়া বেড়ায়, এবং এইরূপ ক্লেশদায়ক জলবায়ুই ইংরাজদের কঠিন,বলবান ও কর্ম্মক্ষম করিয়া ইহাদিগকে পরিশ্রমের আধার করিয়া তুলে। কথিত আছে, যে ব্যক্তি এই কদর্য্য জলবায় সহ্য করিয়া অনেক দিন ইংলণ্ডে বিনাকষ্টে থাকিতে পারে সে পৃথিবীর সকল দেশেই অনায়াসে বাস করিতে পারে।

ইংলণ্ডে গ্রীষ্ম, শরৎ, শীত ও বসন্ত এই চারিটি ঋতু পরে পরে গণিত হইয়া থাকে। কিন্তু কখন কখন গ্রীষ্মকালের মধ্যে শীতকালের মত ঠাণ্ডা ও শীতকালের কোন কোন দিন শরৎকালের মত গরম হইয়া উঠে, আর বৎসরের সকল সময়েই ঝড় বৃষ্টি হইয়া সব ঋতুতেই বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়া দেয়। এজন্য লোকে সর্ব্বদাই শীতল ও ভয়ঙ্কর সময়ের প্রতীক্ষায় সশঙ্ক হইয়া থাকে।

জুন, জুলাই ও অগষ্ট মাস এদেশের গ্রীষ্মকাল। এই তিন মাসের মধ্যে প্রায় পনর কুড়ি দিন আমাদের দেশের আষাঢ় মাসের মত গরম হয়, তদ্ভিন্ন অবশিষ্ট সময় সে দেশের কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসের ন্যায় অল্প শীত ও গ্রীষ্মে মিশ্রিত। এই কালের রাত্রি অতিশয় ছোট, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কেবল চার ঘণ্টা হইতে আট ঘণ্টা পর্য্যন্ত অন্ধকার থাকে, এবং জুন মাসের শেষে দুই একদিন প্রায় সমস্ত রাত্রিতেই অল্প অল্প আলো দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ হইতে এদেশে গ্রীষ্মকালের মধ্যে আসিলে, এদিকে নয় দশটার সময় সন্ধ্যা আর ওদিকে

রাত্রি একটা দুটার সময় সকাল দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্য বোধ হয়। কিন্তু এরূপ লম্বা দিন অধিক কাল থাকে না, ক্রমে দিনের হ্রাসের সহিত বিস্ময়েরও হ্রাস হইয়া আসে। গ্রীষ্মকাল এদেশের সুখের সময়। এই কয় মাসে ইংলণ্ডে সমস্ত বৃক্ষলতা পাতা, ফুল ও ফলের দ্বারা শোভিত হইয়া, নগর, জনপদ ও পল্লীগ্রামকে অতিশয় মনোহর করিয়া তুলে। এই সময়ে সকল লোকেই আমোদ করিয়া বেড়ায় এবং অনেকে সমস্ত বৎসর গাধার মত একভাবে খাটিয়া এখন বিশ্রাম লয়।

সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নবেম্বর এই তিন মাস ইংলণ্ডের শরৎকাল। ইহা আমাদের দেশের শরৎকাল হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন; এই কালের শেষ ভাগ অতিশয় বিষাদজনক। এই সময়ে স্বভাবের কান্তি একেবারে লোপ পাইয়া যায়; প্রকৃতি সমস্ত গাছ পালা ফুল পাতা হারাইয়া যেন বেশভূষাহীন হইয়া কাঁদিতে থাকে। প্রত্যেক গাছের নীচে রাশীকৃত শুষ্কপাতা পড়িয়া থাকে এবং প্রতি বাতাসের ঝাপটে ঝুর ঝুর করিয়া গাছের পাতাগুলি পড়িয়া যায়। এই তিন মাসের মধ্যে এত পরিবর্ত্তন দেখিয়া যথার্থই আমাদের মন বিচলিত হইয়া উঠে। ক্রমে দিন ছোট হইতে আরম্ভ হয়, বেলা ছয় সাতটার সময় সকাল আর পাঁচ ছয়টার সময় সন্ধ্যা হয়। নগরগুলি আবার পূর্ব্বকার গম্ভীরমূর্ত্তি ধরিয়া প্রচণ্ড শীতকালকে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রস্তুত হয়; লোকেরা গ্রীষ্মকালের আমোদ ও ছুটী ছাড়িয়া নিজ নিজ কর্ম্মে মনোনিবেশ করে, আর যাহারা ইংলণ্ডে বেড়াইতে আসে তাহারাও চলিয়া যায়।

নবেম্বর মাসটি অতি ভয়ঙ্কর, এই সময়ে প্রায়ই গাঢ় কোয়াসা হইয়া থাকে এবং এই মাসই যথার্থ শীতকালের প্রারম্ভ বলিলেই হয়।

ডিসেম্বর, জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি এই তিন মাস এদেশের প্রকৃত শীতকাল। এই সময় অতি কষ্টজনক; প্রকৃতিদেবী ও একেবারে বিমুখা, তাহার পর হাড়ভাঙ্গা শীত, ফগ বা গাঢ় কোয়াসা, অহরহ বিন্দু বিন্দু শীতল বৃষ্টিপাত, মধ্যে মধ্যে তুষারবর্ষণ ইত্যাদি একত্র হইয়া মানুষের জীবনকে অতিশয় দুঃখময় করিয়া তুলে। জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসের অনেক দিন শীতে সমস্ত জমিয়া যায়। রাস্তার মাটি জমিয়া পাথরের মত শক্ত হয়, কখন কখন ঘরের ভিতরে চীনে মাটির কলসীতে করা জল জমিয়া একবারে কলসী ভাঙ্গিয়া যায়। এই সময়ে জলের জন্য অতিশয় কষ্ট হয়, বাড়ীর জল সমস্ত জমিয়া বরফ হইয়া যায়, সেই বরফ ভাঙ্গিয়া আগুনে গলাইয়া আবার জল করিতে হয়। কখন কখন রাস্তার নীচে নলের জল জমিয়া যাওয়াতে বাড়ীতে জল আসা পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া যায়। কোন কোন বৎসরে এত শীত হয় যে, বাগানের ভিতরের কৃত্রিম হ্রদগুলি জমিয়া জলের পরিবর্ত্তে বরফরাশিতে পূর্ণ হইয়া থাকে। এই দুর্দ্দান্ত শীতেও ইংরাজেরা অনেক আমোদ করিয়া থাকে। রাস্তা, মাঠ, ঘাট, সব জমিয়া গিয়াছে, চারিদিক পাথরের মত শক্ত ও হড় হড়ে, তাহার উপর ইংরাজ যুবকেরা 'স্কেট' নামক এক রকম লোহাবাঁধান কাঠের খড়ম পায়ে দিয়া সর সর করিয়া সাপের মত বক্রভাবে চলে। রাস্তার উপর রাশি রাশি সাদা বরফ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার উপর অনেকে

এক্ রকম চাকাহীন গাড়ী করিয়া অতি শীঘ্র যাওয়া আসা করে। কখন কখন রাত্রিতে এই সময়ে খুব ঘটা হইয়া থাকে। স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা সকলেই মশাল জ্বালিয়া জমা হ্রদ বা খালের উপর অতি আনন্দের সহিত ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়; তাহাদের রৈ রৈ শব্দ ও হাস্যধ্বনি অনেক দূর হইতে শুনা যায়।

ঐ প্রকার ভয়ঙ্কর শীত এদেশে প্রতি বৎসর হয় না, বোধ হয় ক্রমান্বয়ে কয়েক বৎসর এইরূপ কঠোর শীত হইলে লোকের ইংলণ্ডে তিষ্ঠান ভার হইত। বলা বাহুল্য যে, এদেশে শীতকালে আগুণ ভিন্ন গৃহে থাকা যায় না এবং বাহিরে যাইবার সময় অতিশয় গরম কাপড় পরিতে হয়, তাহা না হইলে হাত পা জমিয়া যাইবার মত অবশ হইয়া যায়। এখানে দু এক স্থানে এমন শীত হয় যে, মানুষ মাঠের উপর বসিলে হাত পা একেবারে জমিয়া যায় কিম্বা সমস্ত শরীর জমিয়া যায়। শীতকালের দিনগুলি অতিশয় ছোট ছোট, বেলা আট নয়টার সময় সকাল এবং তিন চারিটার সময় সন্ধ্যা হয়। এই সময়ে আকাশ সর্ব্বদাই মেঘাচ্ছন্ন বা ধূমময়, সূর্য্যকে অধিকাংশ দিন দেখাই যায় না এবং কদাচ সূর্য্য উঠিলেও তাহা এত শীতল ও মলিন যে এদেশে সূর্য্য আছে বলিয়াই বোধ হয় না। শীতকালে অনেক তেল ও কয়লা পোড়াইতে হয় এবং অনেক গরম কাপড়ের আবশ্যক, আবার কখন কখন সমস্ত জমিয়া যাওয়াতে অনেক শ্রমজীবী লোক-দিগের কর্ম্ম স্থগিত থাকে, সুতরাং এই কালে দরিদ্রলোকদিগের ভয়ঙ্কর কষ্ট হয়।

মার্চ্চ, এপ্রেল ও মে, এই তিন মাস ইংলণ্ডের বসন্ত-কাল। মার্চ্চমাস বসন্ত কালের মধ্যে গণিত হইলেও আমাদের দেশের মাঘ মাস অপেক্ষা বেশি ঠাণ্ডা। এই মাসে ক্রমাগত প্রচণ্ড ঝড় বয় আর বাতাস এত তীক্ষ্ণ যে সমস্ত মোটা গরম কাপড় ভেদিয়া শরীরের ভিতর প্রবেশ করে ও শীতে হাড় কাঁপাইয়া দেয়; আবার ইহার সঙ্গে মাঝে মাঝে অতি শীতল বৃষ্টি ও বরফ পড়িয়া থাকে। এপ্রেল মাসে শীত একটু কমিয়া আসে কিন্তু তথাপি এই সময় এদেশে আমাদের দেশের মাঘমাসের মত ও কখন কখন তদপেক্ষাও অধিক শীতল। এই মাসে ভারতবর্ষের বর্ষাকালের ন্যায় ক্রমাগত বৃষ্টি পড়ে, আর কৃষকেরা চাষ আরম্ভ করে। গাছ পালা আবার নূতন গজাইতে আরম্ভ করে; দিনগুলি বাড়িতে ও রাত্রি ছোট হইতে থাকে; সূর্য্যদেব দু একদিন দেখা দেন আর তাঁহার তেজও অল্প অল্প করিয়া বৃদ্ধি পায়; ইংলণ্ড যেন আবার নবজীবন পায়। মে মাস এদেশের যথার্থ বসন্তকাল। এই সময়ে সমস্ত বৃক্ষ লতাদি সবুজ বর্ণ পাতা ও বিচিত্র ফুলরাজি দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া যেন নবযৌবন প্রাপ্ত হয়। নগর, পল্লীগ্রাম—সকল স্থানই ঝকমকিয়া উঠে। এমন কি বড় বড় বৃক্ষ হইতে সামান্য ঘাস পর্য্যন্ত সমুদায় উদ্ভিদই এই মাসে ফুলে পরিপূর্ণ হয়; কি বাগান, কি মাঠ, কি সহর, কি পল্লীগ্রাম, যেখানে যাও দেখিবে যে সর্ব্বত্রই ফুলের ছড়াছড়ি। দুঃখের বিষয় এ রকম সুন্দর ফুল দুই এক মাসের বেশি থাকে না। মে ও জুন মাসের বায়ু অতি সুখসেব্য এবং এই সময়ের সূর্য্যকিরণ অতিশয় মৃদুমধুর। সকল দেশেই সুখ দুঃখ দুই আছে;

এদেশে শীতকালে অধিক কষ্টভোগ করিতে হয় বটে, কিন্তু গ্রীষ্মকালের সুখ ও আরামে লোকে সে সকল ক্লেশ ভুলিয়া যায়।

---

# পঞ্চদশ অধ্যায়।

## শিক্ষা ও শিক্ষার ব্যবস্থা।

কোন দেশের শিক্ষার অবস্থা জানিলে উহার সভ্যতা ও উন্নতির অবস্থা বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায়। দেশের লোকেরা কতদূর উচ্চশিক্ষা পাইয়াছে, সর্ব্বসাধারণে কত দূর শিক্ষা লাভ করিয়াছে আর সামান্য ও দরিদ্র লোকদের মধ্যে কতগুলি লেখা পড়া করিতে পারে, এবং সেই শিক্ষালব্ধ জ্ঞান কতদূর কার্য্যে পরিণত করে—এই বিষয়গুলি যথার্থ রূপে জানিলে, সে দেশ কত সভ্য ও সমৃদ্ধিশালী তাহা আমরা অনায়াসে বলিতে পারি। দেখ, চীনদেশ শিক্ষা সম্বন্ধে যদিও এখন আসিয়ার অন্যান্য দেশের উপর দাঁড়াইয়াছে, যদিও ঐ দেশের অতি সামান্য লোকে পর্য্যন্ত লিখিতে ও পড়িতে পারে এবং সাধারণ পরীক্ষা সকল অতিশয় কঠিন, তথাপি সভ্যতা সম্বন্ধে চীন ইউরোপের কত নীচে পড়িয়া রহিয়াছে। ইহার কারণ এই যে চীনের উচ্চশিক্ষার অবস্থা ইউরোপীয় দেশের মত উত্তম নয় এবং কিছু কিছু বিজ্ঞান জানিলেও চীনেরা তাহাদের জ্ঞানকে তত কার্য্যে পরিণত করিতে পারে না। আবার দেখ, জর্ম্মণেরা অতি সুশিক্ষিত, তথাকার সামান্য লোকে দুই

তিনটি ভাষা জানে এবং সাধারণ বিষয়ে সম্যক্‌রূপে ব্যুৎপন্ন, পণ্ডিতেরা জগদ্বিখ্যাত, কত নূতন বিষয়ের আবিষ্কার করিতেছেন, কত গূঢ় বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিতেছেন, কিন্তু তথাপি সাধারণ সমৃদ্ধিতে ইংলণ্ড জর্ম্মণি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; ইহার কারণ, জর্ম্মণেরা ইংরাজদের মত তাহাদের জ্ঞান কার্য্যে পরিণত করিতে পারে না। ইংরাজেরা বলেন যে জর্ম্মণ পণ্ডিতেরা নূতন নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া থাকেন কিন্তু ইংরাজেরাই তাহার ফলভোগ করেন।

ইংলণ্ডের কোন নগরেই বিদ্যাচর্চ্চা ও শিক্ষার উপায়ের অভাব নাই, প্রতি গ্রামেই দুই তিনটি করিয়া স্কুল আছে, সুতরাং কি নগরবাসী, কি পল্লীগ্রামবাসী, কেহই মূর্খ থাকিতে ইচ্ছা করে না। এখানে সর্ব্বশুদ্ধ কত স্কুল ও কলেজ আছে তাহার সংখ্যা করা যায় না; এবং তাহা ছাড়া সর্ব্ব-সাধারণের শিক্ষার জন্য নানা প্রকার উপায় আছে। ইহা-দের শিক্ষার বন্দোবস্ত দেখিলে কোন বিদ্যাভিলাষী লোক সুখী না হইয়া থাকিতে পারেন না। এদেশে কেহই কোন স্কুল বা কলেজ স্থাপনের জন্য গবর্ণমেণ্টের সাহায্যের অপেক্ষা করে না, অধিকাংশ বিদ্যালয় কোন ধনী বা সাধারণ লোকের দ্বারা স্থাপিত। আবার পুরুষদের মত স্ত্রীলোকদের বিদ্যা-লয়েরও অভাব নাই, যেখানে যাও, যেমন বালকদের তেমনি বালিকাদেরও পাঠশালা দেখিতে পাইবে; ইহা ছাড়া অনেক স্থানে, বিশেষ লণ্ডনে স্ত্রীলোকেরা বড় বড় কলেজে গিয়া পুরুষদের সহিত একসঙ্গে শিক্ষা করে।

বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজেরা বলকর শারীরিক ক্রীড়া-

তেও দক্ষ হয়; অধিকাংশ বিদ্যালয়েই "জিমনাষ্টিক" কুস্তিকরা, ও ব্যাট ও গোলা ইত্যাদি খেলিবার স্থান আছে। ইহারা ছয় সাত বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর পর্য্যন্ত স্কুলে বা কলেজে পড়ে। কিন্তু স্কুলের শিক্ষা ইহাদের প্রকৃত শিক্ষা নহে, বিদ্যালয়ের জীবন শেষ হইবার পরে ইহারা নিজে নিজে জ্ঞান লাভ করিতে আরম্ভ করে, সেই জ্ঞানলাভই ইহাদের যথার্থ শিক্ষা। আমাদের দেশের বাঙ্গালায় যেমন বিদ্যার আদর ও চর্চ্চা করে এমন ভারতের আর কোন স্থানে করে না এবং সেইজন্যই ভারতের অন্যান্য লোক অপেক্ষা বাঙ্গালীদের কত উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অধিকাংশ যুবক কলেজের পাঠ শেষ হইলেই শিক্ষা সমাপন হইয়াছে মনে করিয়া লেখা পড়ায় জলাঞ্জলি দেন। এখানে লোকে কলেজের শিক্ষা ও পরীক্ষা দেওয়াকে জ্ঞানভাণ্ডারের পথদর্শক স্বরূপ ভাবে; বিদ্যালয়ের শিক্ষার দ্বারা, কি করিয়া শিখিতে হয়, কেবল যেন তাহাই শিক্ষা করে; পরে নিজের যত্নে ও পরিশ্রমে নানা প্রকার বিদ্যা ও জ্ঞানে মনকে ভূষিত করে। স্কুলের শিক্ষার সময় কেবল "সহাধ্যায়ীদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইব" এই ভাবিয়া লোকে উৎসাহ সহকারে পড়ে ও বিদ্যালয়ের ধারানুসারে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট পুস্তক পড়িয়া জ্ঞানকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে; কিন্তু কলেজের পাঠ ও পরীক্ষা শেষ হইলে অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশ করিবার জন্য যে কৌতূহল জন্মায় তাহাই যথার্থ শিক্ষার মূল, এবং এই মূল অবলম্বন করিয়াই ইহারা জ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশিয়া যথাসাধ্য জ্ঞান সঞ্চয়পূর্ব্বক আপনাদের এত উন্নতি করে।

এখানে এমন অনেক লোক আছেন যে, তাঁহারা কেবল বিদ্যা লইয়াই সমস্ত জীবন কাটান। গ্রন্থরচনা কোন কোন ব্যক্তির জীবনের ক্রীড়াস্বরূপ, কেহ বা নূতন নূতন জ্যোতিষের আবিষ্কার করাকে একমাত্র সুখ বলিয়া গণনা করেন, এবং নানা প্রকার বিজ্ঞানের অনুশীলন কোন কোন লোকের চিরসহচর। এখানে যে কত কবি, গ্রন্থকার ইত্যাদি আছেন তাহার সংখ্যা নাই এবং ইহা ভিন্ন অঙ্কশাস্ত্র-বিশারদ, জ্যোতির্বিদ্যানিপুণ ও অন্যান্য বিজ্ঞানবেত্তাদেরও গণনা করা সহজ নয়। এদেশের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, ক্লব, হাঁসপাতাল ও ডাক্তারখানা ইত্যাদি সকল স্থানই যথার্থ শিক্ষিত লোকের দ্বারা চালিত ও পর্য্যবেক্ষিত হইয়া থাকে। আবার ব্যারিষ্টার, এটর্ণী, ডাক্তার, শিক্ষক প্রভৃতি সকল প্রকার পদবিশিষ্ট লোকেরও ছড়াছড়ি, এবং এমন কি এদেশ ধনের ভাণ্ডার হইলেও অনেক শিক্ষিত লোক দরিদ্রতার করাল কবলে পতিত হন। ইহার কারণ কেবল শিক্ষার আতিশয্য; যত অধিক লোকে শিক্ষিত হইতেছে ততই সকল বিষয়ে আড়া-আড়ি বাড়িতেছে। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ কত বিদ্যাবান্ ও জ্ঞানবান্ লোক কর্ম্মের জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছেন। সমস্ত শিক্ষার পদ পরিপূর্ণ; একটি শিক্ষ-কের জন্য বিজ্ঞাপন বাহির হইলে প্রায় পাঁচ শত লোক তাহার জন্য আবেদন করেন; একজন অধ্যাপকের মৃত্যু হইলে প্রায় তিন শত ব্যক্তি তাঁহার পদলাভের আশায় আশ্বা-সিত হন। এদেশে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত লোকদেরও সংখ্যা বাড়িতেছে, সুতরাং প্রত্যেকের জন্য কর্ম্মের পথ কুলান ভার।

আমাদের দেশে হেমচন্দ্র বাবু, বঙ্কিম বাবু প্রভৃতি গ্রন্থকার কতকগুলি উৎকৃষ্ট পুস্তক লিখিয়া মাতৃভাষার মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন বলিয়া সমস্ত বঙ্গদেশে তাঁহাদের নাম বিখ্যাত হইয়াছে; এখানে ওরূপ গ্রন্থকার যে কত আছেন তাহার সংখ্যা নাই, সেজন্য তাহাদের অত নামও নাই। যে দ্রব্য বেশি থাকে লোকে তাহার আদর করে না, কিন্তু তবুও এদেশে বিদ্যার আদর অন্যান্য দেশের অপেক্ষা কম নয়। ইংরাজেরা অর্থের দাস হইলেও শিক্ষার অবমাননা করে না, সেই জন্যই এখানে এত বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে। বিদ্যার প্রতি ইংরাজদের ভালবাসা আছে বলিয়াই ইংলণ্ডে সহস্র সহস্র ভিন্ন ভিন্ন পুস্তক লিখিত ও প্রকাশিত হয় এবং ঐ সকল পুস্তক পড়িবার নিমিত্ত লক্ষ লক্ষ লোকেরও অভাব নাই। ইহাতেই জানা যায়, ইহাদের শিক্ষার কত প্রভাব ও গৌরব, এবং ইহাদের মধ্যে বিদ্যার আদর থাকাতেই ইংরাজী ভাষা এত সমৃদ্ধ। পৃথিবীতে এমন কোন বিষয় নাই বা এমন কোন দ্রব্যের আবিষ্কার হয় নাই যে, সেই সম্বন্ধে ইংরাজীতে বহি নাই। এক একটি পুস্তকালয়ে গেলে, ইংরাজ-সাহিত্যের যে কত দৌড়, তাহা জানা যায়। কুড়ি, পঁচিশ হাজার বহি ঘরে সাজান রহিয়াছে, ইহা ব্যতীত বহুসংখ্যক পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে বা মুদ্রিত হইবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি কোন প্রকার গূঢ় ও ও কঠিন বিষয়ের পুস্তকের অভাব নাই; আবার জীবনচরিত, নাটক, প্রহসন, নবন্যাস ইত্যাদি কোন রকম চিত্তবিনোদক ও রহস্যোদ্দীপক পুস্তকেরও অপ্রতুল দেখিতে পাই না।

এ প্রকার পুস্তকালয় ইংলণ্ডে প্রায় এক শতটা আছে। ব্রিটিশ মিউজিয়মের লাইব্রেরীর কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; তাহা ব্যতীত কেবল লণ্ডনে এমন অনেক পুস্তকালয় আছে, যেখানে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার ও দু একটাতে এক লক্ষ পর্য্যন্ত পুস্তক আছে।

(ইংরাজদের মধ্যে অনেকে ফরাসী, জর্ম্মণ ইত্যাদি বিদেশীয় ভাষা জানিলেও ইহারা কখন নিজের ভাষা ত্যজিয়া অন্য ভাষায় লিখিত পুস্তক পড়িতে ইচ্ছা করে না এবং কোন বিদেশীয় ভাষায় উত্তম গ্রন্থ থাকিলে বা প্রকাশিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া লয়।) কিন্তু ইদানীন্তন অনেক শিক্ষিত ভারতবর্ষীয়েরা ইংরাজী শিখিয়া আর স্বদেশীয় ভাষায় লিখিত পুস্তক পড়িতে চাহেন না কিম্বা ঘৃণা করেন। আমার বোধ হয় ভাল পুস্তকের অভাবই তাঁহাদের এ প্রকার ঘৃণার কারণ; কিন্তু অবজ্ঞার পরিবর্ত্তে যদি তাঁহারা অন্যান্য ভাষা হইতে অনুবাদ করিয়া, কিম্বা যে প্রকারে হউক, আবশ্যক ও উপকারী পুস্তক লিখেন, তাহা হইলে দেশীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ও দেশীয় লোকের উন্নতি হইতে পারে। অতি অল্প লোকই বিদেশীয় ভাষায় রচিত পুস্তক পড়িয়া উত্তমরূপে জ্ঞান ও বিদ্যা লাভ করিতে সক্ষম হয়। সর্ব্বসাধারণে যে ভাষায় কথা কহে, লোকে দিবারাত্র যে ভাষায় নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করে, সেই ভাষায় উত্তম উত্তম পাঠোপযোগী পুস্তক না থাকিলে সর্ব্বসাধারণের কোন প্রকার উপকার বা উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

এদেশের রাশি রাশি পুস্তক, সংবাদ পত্র, পত্রিকা ইত্যাদি দেখিলেই এখানে কত লোক পড়িতে ও লিখিতে পারে

তাহা জানিতে পারা যায়। এখানকার সাধারণ লোক, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, প্রায় সকলেই কিছু না কিছু লেখা পড়া শিখে, অন্ততঃ সংবাদপত্র, নাটক, নবন্যাসাদি অনায়াসে বুঝিতে পারে। প্রায় সকল ইংরাজেরই রাজনীতি ও রাজ্যশাসনে আস্থা আছে, এই জন্যই ইহারা সংবাদপত্র পাঠ করাকে একটি আবশ্যক কর্ম্ম বলিয়া গণনা করে। আমাদের দেশে যে প্রকার লোকে সংবাদপত্র কাহাকে বলে জানে না, এখানে সে শ্রেণীর লোকেরা অতি আগ্রহের সহিত খবরের কাগজ পড়ে এবং উহা হইতে অনেক জ্ঞান লাভ করে। এখানকার দোকানদারেরা—মুদী, কসাই, আলুওয়ালা ইত্যাদি—সকলেই খবরের কাগজ পড়ে; গাড়োয়ানেরা গাড়ী চালাইতে চালাইতে স্বদেশে বা বিদেশে কোথায় কি ঘটিতেছে, কোন প্রকার যুদ্ধ, বিগ্রহাদি হইতেছে কি না জানিবার নিমিত্ত ব্যগ্রতা সহকারে সংবাদপত্র পাঠ করে। আবার ইহারা কেবল নির্জীবের মত ঐ সকল বিষয় পড়ে না, নিজেদের মনে ভালমন্দ বিবেচনা এবং পরস্পরের মধ্যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য বিষয় লইয়া নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক করিয়া থাকে। ভারতবর্ষে ও দু একটি অন্যান্য দেশেও সাধারণ লোকেরা কহিয়া থাকে যে, "রাজ্যের ও রাজ্যশাসনের ভার যাহাদের উপর অর্পিত হইয়াছে, ঐ সকল বিষয় লইয়া আন্দোলন করা তাহাদেরই কর্ত্তব্য; আমাদের সহিত উহার কি সম্পর্ক যে আমরা রাজনীতি পড়িয়া মাথা ব্যথা করিব?" কিন্তু এদেশে এ প্রকার চিন্তাও নাই আর এ প্রকার কথাও নাই। এখানে লোকে ভাবে যে, সমস্ত রাজ্যের শাসনে প্রতি ব্যক্তি-

রই কিঞ্চিৎ ভাগ আছে, অতএব যতই লোক শাসনে নিযুক্ত থাকুক না কেন প্রত্যেকেরই রাজকার্য্যের ভাল মন্দ বিবেচনা করা উচিত।

এখানে একজন সামান্য ছুতারের সঙ্গে কথা কহিয়া ইংলণ্ডের রাজ্যশাসন ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে যত জানিতে পারিবে, আমাদের দেশের একজন শিক্ষিত কেরাণীর নিকটেও সে প্রকার সংবাদ পাইবে না। সংবাদপত্র পাঠ এদেশের লোকের প্রাতর্ভোজনের অংশ স্বরূপ; সকালবেলা যাহারই বাড়ী যাও দেখিতে পাইবে যে, সে খাদ্যদ্রব্যের দ্বারা যেমন শরীরের পুষ্টি করিতেছে, সেইরূপ সংবাদপত্র পড়িয়া মনের ক্ষুধা নিবারণ করিতেছে। কোন দোকানে কিছু দ্রব্য কিনিতে গেলে দেখিতে পাই যে, দোকানদার একটু অবসর পাইয়া খবরের কাগজ পড়িতেছে; শুধু যে পড়িতেছে তাহা নয়, পড়ার সহিত তাহার মুখে শোকহর্ষাদিজনিত নানাপ্রকার ভাব দেখা যাইতেছে। আবার দেখ গৃহের পরিচারিকা সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার সময় একটু অবকাশ পাইয়া পুস্তক বা কাগজ পড়িয়া জ্ঞান সঞ্চয় করিতেছে। এদেশে এত সংবাদপত্র আছে ও সেগুলি এত শস্তায় পাওয়া যায় যে, দরিদ্রলোকেরা পর্য্যন্ত দুচার পয়সা ব্যয় করিয়া উহা স্বচ্ছন্দে কিনিয়া পড়িতে পারে।

লণ্ডনে প্রায় কুড়িখানা দৈনিক সংবাদপত্র প্রত্যহ প্রাতঃকালে বাহির হয়, তাহাদের মধ্যে 'টাইম্‌স' সর্ব্বপ্রধান, ইহার দাম প্রায় দুই আনা। অবশিষ্টের মধ্যে 'ডেলী নিউস,' 'ডেলী টেলিগ্রাফ,' 'ষ্ট্যাণ্ডাড,' 'ক্রণিকেল' প্রধান; ইহাদের

প্রত্যেকটির দাম তিন পয়সা মাত্র, এবং সর্ব্বসাধারণে এই কাগজগুলি অধিক পড়িয়া থাকে। আবার প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় আটখানা সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়; ইহাদের মধ্যে দুইখানার মূল্য দেড় পয়সামাত্র এবং অন্যান্যগুলি তিন পয়সা। কেবল লণ্ডনে প্রায় তিন শত সাপ্তাহিক পত্র ও পঞ্চাশখানা মাসিক বা ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাহির হয়। ইহাদেরও মূল্য অধিক নয় এবং এইগুলিতে নানাপ্রকার বিষয় থাকে। লণ্ডন ব্যতীত ইংলণ্ডের অন্যান্য নগরেও অতি উত্তম উত্তম দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়, এবং এমন কি অতি ক্ষুদ্র নগরেও দুই একটি সংবাদপত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে এদেশে অতি দরিদ্র বা ছোট লোকেরা কিছুই লেখা পড়া শিখিত না এবং তাহাদের শিখিবারও বিশেষ কোন সুবিধা ছিল না। কয়েক বৎসর হইল একটি আইন প্রচলিত হইয়াছে যে, সকল ব্যক্তিকেই নিজ নিজ সন্তানদের লেখাপড়া শিখাইতে হইবে, এবং যে কোন লোক তাহার বয়সপ্রাপ্ত ছেলেদের স্কুলে না পাঠায়, তাহাকে জরিমানা করে ও ছেলে-দের কোন নির্দ্দিষ্ট পাঠশালায় ধরিয়া লইয়া যায়। ঐ দরিদ্র লোকদের সন্তানের জন্য গবর্ণমেণ্ট দ্বারা অনেক গুলি স্কুল স্থাপিত হইয়াছে, সেই গুলিকে "বোর্ডস্কুল" বলে এবং সেই সকল স্কুলে দরিদ্রসন্তানেরা বিনা পয়সায় বা অতি অল্প পয়সায় বিদ্যালাভ করিতে পারে। এই আইনের দ্বারা এদেশের যে কত উপকার হইয়াছে তাহা বলা যায় না। দশ বৎসর আগে যে সকল লোক লেখাপড়ার নাম মাত্র জানিত না, এখন

তাহাদের নীচেকার শ্রেণীর লোকেরা পর্য্যন্ত অন্ততঃ পড়িতে ও লিখিতে পারে। বোধ হয় আর পঞ্চাশ বৎসর পরে ইংলণ্ডে একটিও গণ্ডমূর্খ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

এদেশে গুটিকতক প্রসিদ্ধ ও পুরাতন স্কুল আছে, তাহাদের "পবলিক স্কুল" অর্থাৎ "সাধারণ পাঠশালা" বলে। এগুলি ধনীদের সন্তানেরই পড়িবার স্থান, মধ্যবিত্ত লোকের ছেলেরাও পড়িয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে "হ্যারো" "ইটন" ও "রাগ্‌বি" এই তিনটি স্কুল প্রধান। এখানকার ছাত্রেরা বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার বলকর খেলা ও ব্যায়াম শিক্ষা করে। "ক্রিকেট," "ফুটবল," "টেনিস," দাঁড়বহা, ইত্যাদি সকল রকম ক্রীড়াতেই ইহারা দক্ষ হয়। হ্যারো ও ইটন পাঠশালা পরস্পরের মধ্যে অতিশয় আড়াআড়ি; এক স্কুলের ছাত্রেরা ভাল হইলে অন্যটির অপমান হইবে বলিয়া দুই দলেই প্রাণপণ শক্তিতে শ্রেষ্ঠ হইতে চেষ্টা করে। প্রত্যেকটির ছাত্রেরা নিজেদের মধ্যে সমাজ করিয়া নানা বিষয় লইয়া পরস্পর তর্ক করে, এবং কি বিদ্যাশিক্ষা কি ব্যায়ামশিক্ষা সকল বিষয়েই আড়াআড়ি করিয়া সাধ্যমত উত্তমরূপে শিখে। আবার দুই স্কুলের মধ্যে অনেক বিষয়ে সমকক্ষতা থাকা বশতঃ প্রত্যেকটির আরো উন্নতি হয়। দুই স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে নৌকাদৌড়, ব্যাট ও গোলা ইত্যাদি নানা প্রকার ক্রীড়া হইয়া থাকে; এবং এই সকলে যে স্কুলের জয় হয়, সেইটি কোন প্রকার পুরস্কার পায়, এইজন্য উভয়েই ছাত্রদের ঐ সকল বিষয় শিক্ষা দিতে অতিশয় যত্ন লয়।

শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের দেশে কেবল বাঙ্গালীদেরই ইহা-

দের সহিত তুলনা করিতে পারা যায়, কিন্তু বঙ্গীয় বালকেরা চতুর ও বুদ্ধিমান্ হইলেও অপরিণতত্ব বশতঃ অনেক শারীরিক ও মানসিক আমোদ হারায়। বাঙ্গালীরা সতর আঠার বৎসর বয়স প্রাপ্ত হইলেই অমনি যৌবনের মধ্যভাগে আসিয়াছেন, ভাবিয়া গাম্ভীর্য্য ধারণ করেন এবং সকল প্রকার বলদায়ক ক্রীড়া ও শারীরিক ব্যায়ামকে বালকের যোগ্য বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে অনেকে, ঐ সমুদায় ক্রীড়া শিখিলে লেখা পড়া শিখিতে পারে না বা দুষ্ট হইয়া যায়, বলিয়া আপত্তি করেন। তাঁহাদের আমি অধিক কি বলিব, তাঁহারা একবার ইংলণ্ডে আসিয়া এখানকার স্কুল ও কলেজের শিক্ষার সহিত খেলার বন্দোবস্ত দেখিলে তাঁহাদের সে ভ্রম দূর হইবে। মানসিক শিক্ষার সহিত শারীরিক সুখ, অসুখ, বল ও দুর্ব্বলতার যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, তাহা বোধ হয়, সকলেই স্বীকার করিবেন। অনেক বিদ্যাবান্, জ্ঞানবান্ ও মহৎ লোকের জীবনচরিতে দেখা যায় যে তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই দরিদ্রের সন্তান বলিয়া বাল্যকালে দৌড়াদৌড়ি, লাফালাফি ইত্যাদি শরীরসঞ্চালক ক্রীড়াতে রত থাকিয়া যে স্বাস্থ্য ও বল লাভ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহাদের ভবিষ্যৎ জীবনে বিদ্যা ও জ্ঞানের সহায়স্বরূপ হইয়াছিল।

ইহা সকলেই জানেন যে শরীর অসুস্থ হইলে মন অসুস্থ থাকে, মানসিক কষ্ট হইলে শারীরিক পীড়া জন্মায় এবং শরীর হৃষ্ট পুষ্ট ও বলবান্ থাকিলে মন সতেজ ও সক্ষম থাকে, সুতরাং বলবান্ বালকেরা যে লেখাপড়ায় অধিক পারদর্শী হইবে এবং তাহাদের জ্ঞান বহুদিন স্থায়ী হইবে ইহাতে কোন

আশ্চর্য্য নাই। বিশেষ দেখিতে হইবে যে, মানুষের শরীর ও মন দুই আছে, একটিকে অবহেলা করিয়া কেবল অন্যটির চর্চ্চা করিলে শেষকালে উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার হয়, এবং শরীরের দুর্ব্বলতার সহিত তেজোহীনতা, ভীরুতা প্রভৃতি মন্দ গুণেরও আবির্ভাব হয়। শুনিয়াছি, কয়েকজন ভারতবর্ষীয় যুবক অতি অল্প বয়সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি গ্রহণ করিয়া বিদ্যাশিক্ষায় অনেক খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন ; কিন্তু শরীর অবহেলাপূর্ব্বক দিবারাত্র কেবল মস্তিষ্কচালন করিয়াছিলেন বলিয়া অল্পদিন পরেই পীড়িত হইয়া জীবন হারাইয়াছিলেন। ইহা কি অল্প আক্ষেপের বিষয়? ইংরাজেরা এ সকল বিষয় অতি উত্তম বুঝে ; ইহারা বরং মানসিক শিক্ষাকে অবহেলা করিবে তথাপি শরীরকে কদাচ অগ্রাহ্য করিবে না। এদেশে অনেক স্থানে বালকেরা পাঠ পরিত্যাগ করিয়া ব্যায়াম ও খেলাতে রত থাকে এবং বিদ্যা অপেক্ষা ক্রীড়াতেই অধিক নিপুণ হয়। যদিও অতিরিক্ত কিছুই ভাল নয়, তথাপি অল্প বয়সেই সমস্ত শারীরিক ও মানসিক সুখ হইতে বঞ্চিত হওয়ার অপেক্ষা সবল শরীরে দীর্ঘায়ু হইয়া থাকা অনেকাংশে শ্রেয়ঃ।

এদেশের স্কুলে বিশেষ ঐ সকল বড় বড় পাব্লিক স্কুলে যেরূপ নানাপ্রকার জ্ঞান ও ব্যায়াম শিক্ষার চমৎকার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ হ্যারো ও ইটন এই দুইটী বড় মানুষের স্কুলে একটি অতিশয় মন্দ রীতি চলিত আছে। এই রীতিকে এখানে 'ফ্যাগিং' বন্দোবস্ত বলে। অনেক ছোট ও দুর্ব্বল বালকেরা বড় ও বলবান্ বালকদের ক্রীতদাস বা

চাকরস্বরূপ হইয়া থাকে। এক একটি বড় বালকের এই প্রকার অনেকগুলি ভৃত্য থাকে; উহারা তাহার ফরমাস্ খাটে, ঘর ঝাঁট দেয়, বাতিদান পরিষ্কার করে, রুটি টোষ্ট্ করে, খেলিবার সময় তাহাকে সাহায্য করে, সকালবেলা তাহাকে বিছানা হইতে উঠাইয়া দেয়, ইত্যাদি নানাপ্রকার চাকরের কর্ম্ম করে। এই কুরীতি পূর্ব্বাপেক্ষা এখন কমিয়া আসিতেছে, আশা করি শীঘ্রই এই অসভ্য আচার একেবারে উঠিয়া যাইবে। এই সকল পাঠশালায় শিক্ষকেরা ছাত্রদের অতিরিক্ত শাসনে রাখে না। এজন্য ইহারা বাল্যকাল হইতেই আত্মসাহায্য করিতে ও আত্মমান রাখিতে শিক্ষা করে। লাটিন ও গ্রীক ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করা এবং ঐ দুই ভাষাতে উত্তম ও বিশুদ্ধরূপে গদ্য ও পদ্য রচনা করা এই পব্লিক স্কুলগুলির প্রধান লক্ষ্য, কিন্তু আজকাল অঙ্ক ও বিজ্ঞান ইত্যাদিও শিখাইয়া থাকে। শুনিয়াছি, হ্যারো বা ইটন পাঠশালায় পড়িতে হইলে মাসে দুই শত টাকা করিয়া খরচ পড়ে।

এদেশের উচ্চশিক্ষা সচরাচর বিশ্ববিদ্যালয়েই দেওয়া হইয়া থাকে। গ্রেট ব্রিটেন ও আয়র্লণ্ডে সর্ব্বশুদ্ধ এগারটা বিশ্ববিদ্যালয় আছে, তাহার মধ্যে অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, লণ্ডন ও ডব্লিন্ এই চারি বিশ্ববিদ্যালয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। লণ্ডনের বিশ্ববিদ্যালয় মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের প্রারম্ভে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছে। ইহা অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের ন্যায় ব্যয়সাধ্য নহে, এবং ইহাতে ধর্ম্ম বা অন্য কোন বিষয়ে গোঁড়ামি নাই। যে কোন জাতি বা ধর্ম্মের লোক

হউক না কেন, সকলেই এখানে নির্ব্বিঘ্নে ও অল্পব্যয়ে বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্দোবস্ত প্রায় কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের মত, কেবল প্রভেদ এই যে এখানকার পরীক্ষাগুলি কলিকাতার অপেক্ষা অনেক কঠিন। কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের বিশ্ববিদ্যালয়সকল এই লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথা ও দৃষ্টান্ত অনুসারে স্থাপিত হইয়াছে, এবং ঐগুলি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অবিকল অনুকৃতি, সেজন্য ইহার বিষয় সূক্ষ্মরূপে লিখিবার আবশ্যক নাই।

লণ্ডনের বিশ্ববিদ্যালয় অন্যান্য গুলি হইতে একটি বিষয়ে বিভিন্ন। এখানে পুরুষদের মত স্ত্রীলোকদের শিক্ষা করিবার সমান সুবিধা আছে, এবং এদেশে স্ত্রীলোকেরা এই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রথম উপাধি পাইয়াছে বলিয়া ইহা অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়ে কতকটা লণ্ডনের অনুগমন করিয়াছে। ঐ দুই স্থানে স্ত্রীলোকেরা পুরুষের মত কোন কোন পরীক্ষা দিতে পারে বটে, তথাপি ইহারা একেবারে পুরুষের ন্যায় এখনও বি এ, এম্ এ, উপাধি গ্রহণ করিতে পারে না। অল্প দিন হইল অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজে কেবল স্ত্রীলোকদের জন্য কয়েকটি কলেজ স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু এদেশের মধ্যে লণ্ডনই ইংরাজমহিলাদের উচ্চ শিক্ষার প্রধান স্থান। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার স্ত্রীলোক ও পুরুষ উভয়ের নিকট একভাবে খোলা রহিয়াছে। স্ত্রীলোক ও পুরুষ এক কলেজে যাইতেছে, এক পাঠ অভ্যাস করিতেছে, এক অধ্যাপকের নিকট শিক্ষা লইতেছে, এবং উভয়ে এক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এক উপাধি ধারণ করিতেছে।

ইহা আমাদের নিকট অতি অদ্ভুত ও অপরূপ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ইহা দেখিলে কাহার মনে না আহ্লাদ হয়? উভয়েই এক বায়ু সেবন করে, উভয়েই এক খাদ্য আহার করে, উভয়েই এক গৃহে বাস করে, তখন স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই মন এক ভাবে পুষ্ট ও এক ভাবে অভ্যস্ত হয়, ইহা দেখিতে কাহার না ইচ্ছা হয়?

অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় এক প্রকার। এই দুটি অতিশয় ধনী ও পুরাণ, এবং জগতের অন্যান্য সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইহারা কোন কোন বিষয়ে একেবারে স্বতন্ত্র। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় আটশত ছিয়াশি খৃষ্টাব্দে রাজা আলফ্রেড্ কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল, কথিত আছে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় উহা অপেক্ষাও পুরাণ। এই পুস্তকে আমি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষরূপে বর্ণনা করিতেছি, পাঠক পাঠিকাগণ ঐ সঙ্গে অক্সফোর্ডের বিষয়ও বুঝিয়া লইবেন।

শিক্ষা দেওয়া, পরীক্ষা করা, উপাধি, ছাত্রবৃত্তি ও পুরস্কার বিতরণ করা এবং ছাত্রদের নিয়মে রাখা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য। কলেজের লোক ব্যতীত এখানে একদল অধ্যাপক আছেন, তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ গৃহে নানা-বিষয়ে "লেক্চার" উপদেশ দিয়া থাকেন, সেখানে সকল কলে-জের ছাত্রেরা যোগ দিতে পারে। কেম্ব্রিজে বহুবিধ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার মধ্যে অঙ্কশাস্ত্র, লাটিন, গ্রীক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রধান। অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষার জন্য কেম্ব্রিজ জগদ্বিখ্যাত। এই সকল বিষয়ে যে সকল ছাত্রেরা সম্যক্ রূপে

ব্যুৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে অপক্ষপাতভাবে পুরস্কার, জলপ্পানী ইত্যাদি বিতরিত হয়। এইগুলি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির দত্ত ধন হইতে দেওয়া হইয়া থাকে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অতি উত্তম পুস্তকশালা, যাদুঘর, উদ্ভিদের বাগান ইত্যাদি অনেকগুলি সাধারণ অধিষ্ঠান আছে। যাঁহারা এখানে ছাত্রদের নিয়মে রাখেন, তাঁহাদের "প্রক্টার" বলে। এই প্রক্টারগণ ও ইঁহাদের সহকারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের দারোগা স্বরূপ; ইঁহারা সকল ছাত্রের উপর চৌকী দেন, কোন ছাত্র অন্যায় আচরণ করিলে ইঁহারা তাহাকে শাস্তি দিয়া থাকেন।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষা হইয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে কোন একটিতে ভাল করিয়া উত্তীর্ণ হইলে উপাধি লওয়া যায়। উপাধি গ্রহণের পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে প্রত্যেক ছাত্রকে "প্রিভিয়স্" অর্থাৎ পূর্ব্ব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়। এই পরীক্ষাকে সচরাচর "লিটিল্ গো" অর্থাৎ "অল্প যাওয়া" বলে। এখানে দুই প্রকারের উপাধি গ্রহণ করা যায়—সামান্য উপাধি ও মানের সহিত উপাধি। মানের সহিত উপাধি গ্রহণার্থ পরীক্ষা অপেক্ষাকৃত অনেক কঠিন। এদেশে, লণ্ডনে ও অন্যান্য প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই এই প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়; কলিকাতার পরীক্ষা বা উপাধিতে এরূপ তারতম্য নাই। কেম্ব্রিজে মানের উপাধির জন্য যে সকল পরীক্ষা হয়, তাহাদের "ট্রাই-পস্" বলে। কোন প্রকার উপাধি গ্রহণার্থ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে বি, এ, উপাধি দেওয়া হয়। বোধ হয় অনেকে জানেন না যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এম্, এ, উপাধির জন্য অন্য কোন

পরীক্ষা দিতে হয় না; যাঁহারা বি, এ, উপাধি গ্রহণ করেন তাঁহারা ইচ্ছা করিলে তিন বৎসর পরে বিনা পরীক্ষায় এম্, এ, উপাধি লইতে পারেন।

(কেম্ব্রিজে সর্ব্বশুদ্ধ সতরটা কলেজ আছে। এই গুলি ভিন্ন ভিন্ন বদান্য ব্যক্তির দানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে স্থাপিত হইয়াছে।) প্রত্যেক কলেজের এক একটি অধ্যক্ষ আছেন, তাঁহাকে সচরাচর "মাষ্টার" বলে। ইনি এবং "ফেলো" নামক কতকগুলি উপাধি-ধারী লোক কলেজের উপর কর্ত্তৃত্ব করেন। কলেজের অধ্যক্ষ এই ফেলোবর্গ দ্বারা মনোনীত হইয়া থাকেন। ফেলোরা কলেজের স্থাপকদের দত্ত অর্থ হইতে বাৎসরিক বৃত্তি পাইয়া থাকেন। ইঁহাদের সংখ্যা সকল কলেজে সমান নয়, কোনটিতে কেবল সাত আট জন আছেন, কোনটিতে বা কুড়ি পঁচিশটিও দেখিতে পাওয়া যায়। কোন ফেলোর পদ খালি হইলে কলেজের অধ্যক্ষ এবং অপর ফেলো-গণ সেই কলেজ হইতে উত্তীর্ণ উপাধিধারীদের মধ্যে সর্ব্বোৎ-কৃষ্ট ব্যক্তিকে বাছিয়া লইয়া সেই পদে অভিষিক্ত করেন। যে ফেলো ছাত্রদের শিক্ষা ইত্যাদির পর্য্যবেক্ষণ করেন, তাঁহাকে "টিউটর" বলে।) এই টিউটরের নিকটে ছাত্রেরা অনেক বিষয় জিজ্ঞাসিতে ও জানিতে পারে; ইনি কলেজের ছাত্রদের উপদেশক ও পরিপালক স্বরূপ। যে ফেলো ছাত্র-দের ধর্ম্মসম্বন্ধে তত্ত্বাবধান করেন, তাঁহাকে "ডীন" বলে। এখানে প্রতি কলেজেই একটি ছোট গির্জ্জা আছে; সেখানে প্রতিদিন উপাসনার সময় সকল ছাত্রেরা উপস্থিত থাকে কি না তাহার খবর রাখা ডীনের কর্ম্ম; ইনি কলেজের পুরোহিত

স্বরূপ। প্রত্যেক কলেজে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যাপক নিযুক্ত আছেন, ইঁহারা ছাত্রদের নানা বিষয়ে শিক্ষা দিয়া থাকেন। কলেজের ফেলোরাই প্রায় এই অধ্যাপকের কাজ করেন। প্রতি কলেজের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রদিগকে ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হয়; এই ছাত্রবৃত্তিগুলি মাসে ত্রিশ টাকা হইতে প্রায় দুই শত টাকা পর্য্যন্ত।

ছাত্রেরা কলেজের ভিতরে বা নগরের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট বাসায় থাকে। তাহাদের প্রতিদিন প্রাতঃকালে কিম্বা সন্ধ্যার সময় দিনে একবার করিয়া কলেজের গির্জ্জায় যাইতে হয়। আজ কাল অনেক কলেজে এই নিয়ম শিথিল হইয়া আসিয়াছে; বিশেষ কারণ থাকিলে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা কোন কোন ছাত্রকে এই বিষয়ে নিষ্কৃতি দিয়া থাকেন। প্রত্যেক কলেজে প্রত্যহ বেলা নয়টা হইতে বারটা পর্য্যন্ত ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়। সন্ধ্যার সময় কলেজের "হলের" বা বড় ঘরের এক দিকে ছাত্রেরা ও অপরদিকে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বসিয়া আহার করেন। ভোজনের আরম্ভে ও শেষে একজন বৃত্তিধারী ছাত্র "গ্রেস" অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রসাদ পাঠ করিয়া থাকে। এখানে প্রায় সকল ছাত্রেরাই বিকাল বেলায় বাড়ীর বাহিরে গিয়া ব্যায়াম বা বলদায়ক ক্রীড়া করে। ইহারা অতি আগ্রহের সহিত দাঁড়বহা, ব্যাট ও গোলা ইত্যাদি খেলা করিয়া থাকে এবং কখন কখন লেখা পড়ার অপেক্ষা ঐগুলিতে অধিক রত থাকে।

প্রত্যেক কলেজে তর্ককরা, দাঁড়বহা, ব্যাট ও বল খেলা প্রভৃতির নানা প্রকার সমাজ আছে। আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের

সমস্ত ছাত্রদের মিশিবার সুবিধার জন্য একটি "মিলন-সমাজ" আছে। ইহা ক্লবের মত, এখানে সংবাদপত্র পুস্তকাদি পড়িতে পাওয়া যায়। ছাত্রেরা এখানে প্রতি সপ্তাহে সভা করিয়া রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অন্যান্য বিষয় লইয়া তর্কবিতর্ক করে। ইহাদের আস্থা ও আগ্রহ দেখিলে ঐ সভাকে ক্ষুদ্র পার্লিয়ামেণ্ট সভা বলিয়া মনে হয়। এই মিলন-সমাজ ব্যতীত কেম্ব্রিজে সাহিত্য, সঙ্গীত ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধীয় আরো অনেক সমাজ আছে।

বি, এ, উপাধি লইতে হইলে প্রায় তিন বৎসর কোন কলেজের ছাত্র থাকিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়। কেহ কেহ কোন কলেজে না গিয়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেয়। এই প্রকারের ছাত্রেরা অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে পাঠাদি করিতে পারে বটে কিন্তু তাহারা কলেজ-জীবনের সুখে একেবারে বঞ্চিত থাকে। এখানে ছাত্রেরা কোন সাধারণ স্থানে যাইবার, অধ্যাপকের লেক্‌চার শুনিবার, গির্জ্জায় যাইবার, কলেজের হলে আহার করিবার ও উপাধি লইবার সময় গাউন ও চেপ্টা টুপি পরে।

বোধ হয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ণনা পড়িয়া অনেকে বুঝিতে পারিবেন যে, এখানে উপাধি লওয়া অতি অল্প ব্যয়ের কর্ম্ম নয়। ইহাতে পড়িতে হইলে মাসে প্রায় তিন শত টাকা করিয়া খরচ পড়ে, কেহ কেহ উহা অপেক্ষা বেশীও ব্যয় করে, কিন্তু অনেকে আবার ইহার কমেও চালায়। বড় মানুষের ছেলেরাই এখানে অধিক যায়, এজন্য তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া চলিতে হইলে আবশ্যকের অপেক্ষা কিছু অধিক খরচ

পড়ে। যাহা হউক, অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করিলে অনেকগুলি বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। প্রত্যেক কলেজের ছাত্র এক বাড়ীতে বাস করে, এক সঙ্গে আহার করে, এক লেক্‌চার শুনে—এইরূপে পরস্পরের মধ্যে অতিশয় ঘনিষ্ঠতা জন্মে। প্রতি কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুবিধ সমাজ থাকায় ছাত্রেরা একত্র মিলিবার অনেক সুবিধা ও অবসর পায়, ইহা ব্যতীত সকলে এক সঙ্গে ব্যায়াম ও ক্রীড়া করিয়া থাকে। আর সকলেই যুবক ও প্রায় এক প্রকার অবস্থার লোক, এই জন্য ইহাদের মধ্যে সহজেই বন্ধুত্ব জন্মে এবং অনেক সময়ে সেই বন্ধুত্ব চিরজীবন স্থায়ী হইয়া থাকে। ছাত্রেরা যেন এই খানে সাংসারিক জীবনের প্রথম পরিচয় পায় এবং মানুষ ও মানুষের স্বভাব, আচার, ব্যবহার ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করে।

---

# ষোড়শ অধ্যায়।

## ইংরাজদের ধর্ম্ম ও মহোৎসব।

আমার বিশ্বাস ছিল যে, ইংলণ্ডের সমস্ত লোকে এক প্রথা অনুসারে ধর্ম্মচর্য্যা করিয়া থাকে, কিন্তু এখন এদেশে এক ধর্ম্মের বহুবিধ বিভাগ দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়াছি। আমাদের দেশে ধর্ম্মবৈচিত্র্যের কিছু ত্রুটি নাই। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি নানা প্রকার বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী

লোক বাস করে; আবার এক হিন্দুদের মধ্যে অনেক সম্প্রদায়-মণ্ডলীর সংখ্যা গণনা করা একটি ভয়ানক দুরূহ ব্যাপার। ভারতবর্ষ যেরূপ বৃহৎ ও বিচিত্র দেশ তাহাতে সেখানে নানা ধর্ম্মের নানা সম্প্রদায় থাকা আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র দ্বীপে অতি অল্প সংখ্যক য়িহুদী ও ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী বিদেশীয়দের বাদ দিলে কেবল এক খৃষ্টানদের মধ্যে প্রায় এক শত পঁচিশটি সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়।

খৃষ্টধর্ম্ম দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত—রোমানকাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্ট। প্রায় সমস্ত ইংরাজেরা প্রটেষ্টাণ্ট খৃষ্টান এবং এই প্রটেষ্টাণ্ট বিভাগেরই এদেশে এতগুলি ভিন্ন ভিন্ন দল আছে। এই এক শত পঁচিশ সম্প্রদায়ের প্রত্যেকেই বাইবলকে তাহাদের মূল ধর্ম্মপুস্তক বলিয়া স্বীকার করে, কিন্তু কেহ কেহ ঐ পুস্তকের কোন কোন ভাগ অগ্রাহ্য করিয়া থাকে। ইহাদের পরস্পরের উপাসনাপ্রণালীতেও অনেক প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। সকলেই যীশুখৃষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র ও মানুষের ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করে এবং কহিয়া থাকে যে তিনি কেবল পাপীদের উদ্ধার করিবার জন্য ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আজকাল কিন্তু এদেশে দুই একটি সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা যীশুখৃষ্টকে সামান্য মানুষ বলিয়া থাকে। তাহাদের মতে ইনি একজন অতিশয় সাধু, ধার্ম্মিক ও সৎপথপ্রদর্শক লোক ছিলেন, কিন্তু তথাপি তাহারা আপনাদের খ্রীষ্টান বলিয়া পরিচয় দেয়।

এদেশে প্রটেষ্টাণ্টদের বিবিধ দলের মধ্যে সর্ব্বপ্রধানকে "ইংলণ্ডের গির্জ্জা" সম্প্রদায় কহিয়া থাকে। ইংলণ্ডের সমস্ত

অধিবাসীর অর্দ্ধেকের কিছু অধিক এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত, এবং এই ধর্ম্মপ্রণালীই এদেশের রাজধর্ম্ম, যেহেতু ইহা রাজসরকার দ্বারা পরিপোষিত ও পর্য্যবেক্ষিত হয়। এই ধর্ম্মব্যবস্থা অনুসারে সমস্ত ক্রিয়াকর্ম্ম দুই জন প্রধান যাজক, আটাশ অন্য যাজক ও তাঁহাদের সহকারিবর্গ দ্বারা সম্পাদিত হয়। ঐ যাজকমণ্ডলী গবর্ণমেণ্ট দ্বারা নিয়োজিত হয়। সাধারণ সমাজে ইহাঁরা সম্ভ্রান্তদের ন্যায় সম্মানিত হন এবং পার্লিয়ামেণ্টে সম্ভ্রান্তদের সভায় বসিয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন। ইহাঁরা সকলেই অতি উচ্চ বেতন পান; প্রধান যাজকদ্বয়ের মধ্যে একজন মাসে পনর হাজার টাকা ও অপরটি দশ হাজার টাকা করিয়া পান এবং অন্য যাজকদের বেতন মাসে দশ হাজার টাকা হইতে দুই হাজার চারি শত টাকা পর্য্যন্ত।

ইংলণ্ডের পুরোহিতবর্গের মধ্যে যাজকেরাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহাঁদের সহায়তা করিবার নিমিত্ত কতকগুলি উপযাজক ও তাঁহাদের নীচে অনেক গুরু আছেন। এই পশ্চালিখিত পুরোহিতদের কোন নির্দ্দিষ্ট বেতন নাই; ইহাঁরা ধর্ম্মদায় বা দেবত্র পাইয়া থাকেন, উহাই ইহাঁদের জীবিকার উপায়। ইহাঁদের আয়ে অতিশয় প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন ধর্ম্মদায় হইতে মাসে এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে, কিন্তু অধিকাংশ গুরুই ইহা অপেক্ষা অনেক অল্প টাকা উপার্জ্জন করেন; কেহ কেহ আবার মাসে এক শত টাকা মাত্র পাইয়া থাকেন। ঐ ধর্ম্মদায় সকল ডিউক আর্ল প্রভৃতি সম্ভ্রান্তদের ও অন্যান্য ধনী লোকদের হস্তগত

এবং তাঁহারাই অনুগ্রহ করিয়া, যাহাকে ইচ্ছা হয়, ঐগুলি দানস্বরূপ বিতরণ করেন।

এদেশে পুরোহিতের কর্ম্ম অতিশয় সম্মানের ও লাভের বলিয়া গণিত হয়। ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, হইবার মত অনেকে পুরোহিতের কর্ম্ম শিক্ষা করিয়া থাকে। অনেক ভদ্র পরিবারের পুত্র অতি আহ্লাদ সহকারে ধর্ম্মগুরু হইয়া থাকে এবং অনেক সদ্‌বংশজাত কন্যা পুরোহিতদের সহিত বিবাহ করিতে ভাল বাসে। পুরোহিতেরা প্রায় সকলেই ভদ্রবংশজাত, শিক্ষিত ও অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী, এবং অনেকের ধনসম্পত্তিও আছে। ইহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ বড়মানুষী রকমে থাকেন, ভাল গাড়ী ঘোড়া ইত্যাদি রাখেন এবং ধনী ও ক্ষমতাশালী লোকদের সহিত মিশেন। সাধারণ লোকেরা ইহাঁদের ভক্তি ও মর্য্যাদা করিয়া থাকে। পল্লীগ্রামে পুরোহিতেরা লোকের বাড়ী গিয়া ছোট ছেলেদের আদর করেন, তাহাদের লেখাপড়ার বিষয় জিজ্ঞাসেন, মন্দটিকে ভর্ৎসনা করেন, মদ্যপানের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেন, লোকদের নিজ কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা করেন এবং উহাদিগকে সকল বিষয়ে উপদেশ দিয়া থাকেন। ইংরাজ পুরোহিতদের মধ্যে যদিও অনেকে গোঁড়া বা বিলাসী, তথাপি তাঁহারা প্রায় সকলেই সাধু ও সচ্চরিত্র। তাঁহাদের যত্নে শিক্ষা ও নীতি সম্বন্ধে দেশের সাধারণ লোকের অনেক উন্নতি হইয়াছে।

ইংরাজদের ধর্ম্ম আমাদের ধর্ম্ম অপেক্ষা ভাল কি মন্দ তাহা আমি এস্থলে বিচার করিতে চাহি না। প্রায় সকল

ধর্ম্মেই পরমেশ্বর মানে এবং সকলগুলিতেই পাপপুণ্যের কথা আছে। কেবল হিন্দুধর্ম্মই যে, কুসংস্কারময় তাহা নহে, এই বিষয়ে খ্রীষ্টধর্ম্মও বাদ যায় না। দুইটির মন্দ ভাগ ফেলিয়া দিলে, কোন্‌টি অপেক্ষাকৃত শ্রেয়, তাহা বলা ভার। হিন্দু-ধর্ম্মের অনেক অবনতি হইয়াছে, এবং হিন্দুরাও একেবারে অপদার্থ হইয়া পড়িয়াছে; আর খ্রীষ্টানদের অনেক উন্নতি হইয়াছে এবং পৃথিবীতে আজকাল তাহাদেরই প্রভাব অধিক। এই সকল দেখিয়া যে অনেকে খ্রীষ্টান ধর্ম্মকে সর্ব্বোত্তম বলিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ইংরাজেরা খ্রীষ্টধর্ম্মকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও এই ধর্ম্ম-গ্রহণই মানুষের মুক্তির একমাত্র উপায় বলিয়া থাকে। অন্য কোন ধর্ম্ম ইহাদের ধর্ম্ম অপেক্ষা উত্তম ও কুসংস্কারশূন্য বলিয়া মনে হইলেও সুশিক্ষিত বা অশিক্ষিত কোন ইংরাজ খ্রীষ্টধর্ম্ম ত্যজিয়া নিজধর্ম্মের অবমাননা করে না। ইহাতেই বুঝা যায় যে, ইংরাজেরা ধার্ম্মিক হউক বা না হউক, ইহাদের নিজধর্ম্মে অটল বিশ্বাস আছে; বোধ হয়, কেবল আত্মগৌরবই এই বিশ্বাসের মূল,। আমাদের সুশিক্ষিতা রমাবাই যেমন ইংলণ্ডে আসিয়া হিন্দুধর্ম্ম ত্যজিয়া খ্রীষ্টান হইয়াছেন এবং আত্মগৌরবে জলাঞ্জলি দিয়া সমস্ত হিন্দুজাতিকে অবনতশির করিয়াছেন, এরূপ এদেশে কোন ইংরাজের বিষয় শুনিতে পাই না। )

ইংরাজদের বেশ ধর্ম্মভক্তি দেখিতে পাই। ইহারা কেবল পুরোহিতদের হাতে ধর্ম্মকর্ম্মের সমস্ত ভার না দিয়া, নিজেরা নিয়মমত ধর্ম্মচর্য্যা ও উপাসনা করিয়া থাকে। প্রতি রবিবারে সপরিবারে গির্জ্জায় গিয়া ধর্ম্মোপাসনা করা এবং বাড়ীতে

বাইবেল পড়া ও ধর্ম্মসম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহা এদেশের একটি প্রধান ব্যবস্থা। ইংলণ্ডে আবার অনেক গোঁড়ামিও দেখিতে পাই। কোন লোক রবিবারে কোন কর্ম্ম করিলে বা গির্জ্জায় না গেলে সকলে তাহাকে অধার্ম্মিক বলে। রবিবারে তাস ও অন্য কোন রকম খেলা বা গল্পের বই পড়া এদেশে মহাপাপ বলিয়া গণিত হয়। রবিবারে লণ্ডনের কিরূপ অবস্থা হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; ইংলণ্ডের সর্ব্বত্রই প্রায় ঐরূপ হইয়া থাকে। শুনিয়াছি দু এক স্থানে রবিবারে চীৎকার করিয়া কথা কহা পর্য্যন্ত বারণ।

যেমন গোঁড়ামি আবার তেমনি ভণ্ডামিও দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে কেবল লোকলজ্জায় গির্জ্জায় গিয়া থাকে আর যুবতীদের মধ্যে অধিকাংশই কেবল বেশভূষা দেখাইবার নিমিত্ত ধর্ম্মালয়ে উপস্থিত হয়। যথার্থ ধর্ম্ম কি তাহা অনেকে বুঝে না বা বুঝিতে চাহে না। আজকাল লণ্ডনে যুবকদলের মধ্যে অনেকের ধর্ম্মে বিশেষ আস্থা নাই এবং আমাদের দেশের নব্যসম্প্রদায়ের মত অনেক ইংরাজ কোন ধর্ম্মকে গ্রাহ্য করে না বা একেবারে নাস্তিক। অনেকে আবার কেবল একেশ্বরবাদী, যীশুখ্রীষ্টকে মানুষ বলিয়া ধরে। ইহাদের সংখ্যা অতি অল্প। লণ্ডনে একেশ্বরবাদীদের দুইটি মাত্র গির্জ্জা আছে। আমি একটিতে কোন রবিবারে গিয়াছিলাম, কতক্ষণ পরে মনে হইল যেন, ব্রাহ্মসমাজে বসিয়া আছি; প্রভেদ এই, যে এখানে প্রার্থনাদি সমস্ত ইংরাজীতে বলা হয়।

এদেশে নানা সম্প্রদায়ের ছোট বড় যে কত গির্জ্জা আছে,

তাহার গণনা করা ভার, কিন্তু তথাপি এখানে গরিব লোক-দের অধিক গির্জ্জায় যাইতে দেখি না। সকল দেশের দরিদ্র লোকদের মধ্যে অধিকাংশকেই পূজা বা উপাসনা করিতে দেখা যায়, কিন্তু ইংলণ্ডে গরিবদের যেমন দয়া, মায়া প্রভৃতি গুণ অতি বিরল সেইরূপ ইহারা ধর্ম্মচর্চ্চা কাহাকে বলে জানে না। কেবল নামমাত্র খ্রীষ্টান। ইহাদের মনে ধর্ম্মভাব সঞ্চার করাই-বার নিমিত্ত আজকাল "স্যালভেশন আর্মি" নামে এক নূতন দল হইয়াছে। ইহারা সঙ্কীর্ত্তনের মত রাস্তায় রাস্তায় ধর্ম্মের গান গাইয়া ও প্রার্থনা করিয়া বেড়ায় এবং ছোটলোকদের মন টানিবার জন্য ধর্ম্মের গানগুলা টপ্পা বা পাঁচালীর মত সুরে গায় আর উপাসনার সময় নানা প্রকার ভঙ্গিমা করিয়া থাকে। ইহারা অনেক মাতাল ও পাপীদের কুপথ হইতে উদ্ধার করিয়াছে বটে, কিন্তু ধর্ম্মকে আমোদের দ্রব্যের মত করিয়া সকলের মনে বিরক্তি জন্মাইয়া দেয়।

ইংরাজদের ধর্ম্মোৎসবের সংখ্যা হিন্দুদের হইতে অনেক অল্প। আমাদের দেশে যথার্থ হিন্দুরা কথায় কথায় পূজা অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, কিন্তু ইংরাজদের প্রতি রবিবার ভিন্ন উপাসনার দিন অতি বিরল। অন্য পক্ষে আবার দেখিতে হইবে যে আমরা এক দিনে পূজাও করি আমোদও করি; ইংরাজেরা পূজার দিন আমোদ না করিয়া রবিবারে সমস্ত পূরিয়া লয়। বোধ হয় সকলেই "বড় দিন," "গুড ফ্রাই ডে" ইত্যাদি কয়েকটি ইংরাজী পর্ব্বদিনের নাম শুনিয়াছেন। এই পর্ব্বগুলির মধ্যে "বড়দিন" সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

ইংরাজদের এই মহোৎসব ২৫ শে ডিসেম্বর তারিখে হইয়া

থাকুক। বৎসরের ঐ দিনে যীশুখ্রীষ্ট জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইংরাজীতে এই পর্ব্ব দিনকে "খ্রীষ্ট্‌মাস্ ডে" বলে। আমাদের দেশে যে ইহাকে কেন বড় দিন বলে, তাহা ঠিক বলিতে পারি না; বোধ হয় উহা রাজার জাতির প্রধান উৎসবের দিন বলিয়া, কিম্বা ২৫ শে ডিসেম্বর বৎসরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট দিন হওয়াতে উহাকে আদর করিয়া ঐরূপ নাম দিয়া থাকে। খ্রীষ্ট্‌মাস্‌কে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উৎসব বলে বটে কিন্তু ধর্ম্মের সহিত ইহার কোন সংস্রব দেখিতে পাই না। ধর্ম্মমতে ইহাতে কোন নিয়ম বা কুসংস্কার নাই এবং সমস্ত দিন যীশুখ্রীষ্টকে প্রার্থনা করিবারও আবশ্যক নাই। বাস্তবিক খ্রীষ্টমাস্ এখন যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে ইহাকে সামাজিক বা গার্হস্থ্য উৎসব বলিলেই হয়। এই সময়ে ইংরাজেরা কতকগুলি মজার নিয়ম পালন করে, সেগুলি এদেশে অতি প্রাচীন কালের "ড্রুইড্" নামক পুরোহিতদের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। এক সময়ে ঐ সকল নিয়ম ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ছিল বটে, কিন্তু এখন ইংরাজেরা সামাজিক আচার ব্যবহারের মত ঐ সকল পালন করিয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশের দুর্গাপূজার মত খৃষ্ট্‌মাস্ এদেশের মহা আনন্দের সময় এবং এই সময়ে লোকে দান ধ্যান করিয়া থাকে। যথার্থই এই আনন্দময় খৃষ্ট্‌মাস্ অনেক চিন্তাদগ্ধ ও দুঃখপীড়িত ইংরাজের হৃদয়ে সুখবারি বর্ষণ করে। কত শত পরিবারের আত্মীয় লোকেরা জীবিকা নির্ব্বাহের অনুরোধে সমস্ত বৎসর দেশের নানা ভাগে ও পৃথিবীর নানা দেশে ছড়াইয়া থাকে, আজ তাহারা সকলে আবার একত্রিত হইয়া সৌহার্দ্যসুখে নিমগ্ন

থাকিয়া পরস্পরের শুভচিন্তায় রত হয়। খৃষ্টানদের পুরাতন বৎসর এই সময়ে প্রিয়বন্ধুদের সম্মিলিত করাইয়া ভোজন ও আমোদের মধ্যে ধীরে ধীরে বিদায় লয়; এইকালে ইহাদের মনে কত প্রকার পুরাতন চিন্তার আবির্ভাব হয় এবং কত লোকে নববর্ষের আগমন প্রতীক্ষায় নূতন আশায় আশ্বাসিত হয়।

খৃষ্ট্‌মাসের পূর্ব্ব দিনের সন্ধ্যাকে "খ্রীষ্টমাস ইভ্‌" বলে, এখানে উহা আমাদের দেশের পূজার ষষ্ঠীর দিনের সন্ধ্যার মত আনন্দময়। এই সন্ধ্যাকালে ইহারা সমস্ত পরিবারে একত্র হইয়া একটি ঘরে বসে, ঘরের ছাদের মধ্যভাগ হইতে "মিস্‌লটো" নামক বৃক্ষের একটি বড় ডাল ঝুলিতে থাকে আর সম্মুখে আগুনের স্থানে একটি প্রকাণ্ড গুঁড়িকাঠ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে থাকে। এদেশের রীতি এই যে, ঐ মিস্‌-লটোর নীচে ছোট ও বড়, বিবাহিত ও অবিবাহিত, স্ত্রী ও পুরুষ—সকলেই আজ অকুণ্ঠিতভাবে পরস্পরকে চুম্বন করিতে পারে; অতএব সকলেই ঐ ডালের তলায় অতি উল্লাস ও হাস্যধ্বনির সহিত পরস্পরকে চুম্বন করিতেছে। আজ বাক্‌শূন্য ও গম্ভীরমূর্ত্তি ইংরাজজাতি অন্য এক ভাব ধারণ করে। বাড়ীর সমস্ত ছেলেরা ও বড় লোকেরা পর্য্যন্ত এই সন্ধ্যাকালে "কানামাছি" প্রভৃতি নানা প্রকার লাফা-লাফির খেলা করে; পরে হুড়াহুড়ি ও দৌড়াদৌড়ি করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলে সকলে জ্বলন্ত আগুনের সম্মুখে বসিয়া রাত্রিভোজনে রত হয়। ইহারা এই সন্ধ্যাপালনের জন্য কতকগুলি বিশেষ দ্রব্য লইয়া থাকে। টেবিলের উপর

মাঝখানে একটি প্রকাণ্ড খোরাবাটীতে সোঁ সোঁ, টগ্ বগ্ শব্দে গরম গরম আপেল ভাসিতেছে, তাহাদের মিষ্ট গন্ধে ও মধুর শব্দে লোকের লোভ সম্বরণ করা অতি কঠিন হইয়া উঠে। এইরূপ নানা প্রকার আহারদ্রব্য ও মদ খাইয়া উদর পূর্ণ করে, পরে পুত্রকন্যা, দাসদাসীর সহিত সমস্ত পরিবার আগুনের সম্মুখে বসিয়া খ্রীষ্ট্‌মাস্ দিনকে আহ্বান করিয়া ঘরে লইবার জন্য রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে। এই অবসরে ইহারা অনেক রকম খেলা করে ও গল্প বলে, হয় ত বাড়ীর বাহিরে ভয়ানক বরফ পড়িতেছে কিম্বা অতি তীক্ষ্ণ শীতল বাতাস বহিতেছে আর এই গভীর রাত্রিতে কেহ বা ভয়ঙ্কর ভূতের গল্প বলিয়া সকলের শরীর কাঁপাইয়া দিতেছে। মধ্যে মধ্যে আবার মদ চলিতেছে, কেহ বা এই সময়ে আগমনী গান আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, আর সকলে উল্লাসের সহিত উচ্চরবে তাহাতে যোগ দিতেছে কিম্বা অতিশয় কোলাহলপূর্ব্বক করতালি দিতেছে।

হিন্দুরা পর্ব্বের সময় সমস্ত দিন উপবাস করিয়া পূজাতে রত থাকে এবং অনেক লোককে নিমন্ত্রণপূর্ব্বক খাওয়াইয়া নিজেদের চরিতার্থ বোধ করে; কিন্তু এদেশে খ্রীষ্ট্‌মাস্ দিনে কেবল সকাল বেলায় কেহ কেহ একবার গির্জ্জায় গিয়া থাকে, পরে কি ধনী, কি দরিদ্র সকলেই নিজ নিজ ভোজনে রত হয়। খৃষ্ট্‌মাসের সময় ভাল করিয়া খাইবে বলিয়া অনেকে টাকা জমাইয়া রাখে এবং এই সময়ে নানা প্রকার সুখাদ্য মাংস, মদ, ফল, ও মিষ্টান্ন খাইয়া আমোদ করে। প্রধান ভোজনের সময় ইহারা ঝলসান গোমাংস, প্লাম্ পুডিং প্রভৃতি

অনেকগুলি বিশেষ দ্রব্য খাইয়া থাকে আর মদের সর্ব্বনাশ করে। আহারের পর সকলে গান বাজনা নাচ ও খেলা করিয়া থাকে। এবং কোথাও কোথাও ইহাদের কোলাহলপুর্ণ আনন্দ-ধ্বনি বহুদুর হইতে শুনা যায়।

আমাদের দেশের পূজার সময়ের মত এখানে খৃষ্টমাস্ দিনে লোকে নূতন পোষাক পরে ও আত্মীয় বন্ধুদের বাড়ী নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্য উপহারস্বরূপ পাঠায়। ইহা ভিন্ন বন্ধুবান্ধবেরা পরস্পরকে "খৃষ্টমাস্ কার্ড" পাঠাইয়া দেয়, উহা দেখিতে তাসের মত এবং উহার উপরে নানা প্রকার ফুল পাতাদি ও আশীর্ব্বাদসূচক ছন্দ ছাপান থাকে। কোন ব্যক্তি সম্বৎসর দুঃখে মগ্ন থাকিলেও আজ খাইয়া ও গাইয়া, হাসিয়া ও খেলিয়া আমোদ করিবে; এবং যাহারা সমস্ত বৎসর অর্দ্ধাহারে বা মন্দাহারে ও জীর্ণবাসে থাকে, আজ তাহারা নূতন কাপড় পরিয়া প্রাণ ভরিয়া আহার করে। প্রত্তি ব্যক্তির মুখেই আজ খাদ্যদ্রব্য ও আনন্দের কথা; কিন্তু এ সকল আমোদ নিজ নিজ পরিবার ও দুই চারিটি বন্ধু ভিন্ন অন্য কোন লোকে দেখিতে পায় না। বাস্তবিক ইহাদের উৎসবের দিন ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মনে না হইয়া আহারসম্বন্ধীয় বলিয়া বোধ হয়। খ্রীষ্টমাস্ উপলক্ষে এদেশে দুই এক জন ধনাঢ্য ব্যক্তি কদাচ কখন দরিদ্রদের আহার বা বস্ত্র দান করিলেও আমাদের দেশের মত মুক্ত হস্তে দান করা এদেশে নাই বলিলেই হয়। সে দেশে উৎসবের সময় লোকে দুই তিন হাজার লোক খাওয়ায় ও সকলকে অকাতরে খাদ্য-সামগ্রী বিতরণ করে, কিন্তু এখানে পর্ব্বের সময় পর্য্যন্ত

ইংরাজ বদান্যতা কেবল এক একটি পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং স্বার্থপর জাতিতে কেবল নিজের উদর পূর্ণ করা-কেই পরম সুখ বলিয়া মনে করে।

---

# সপ্তদশ অধ্যায়।

## স্বাধীন ইংরাজ—রাজ্যব্যবস্থা—পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য-নির্ব্বাচন।

যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে "ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডে এত প্রভেদ দেখিলে কিন্তু সকলের অপেক্ষা কোনটি বিশেষ করিয়া তোমার মনে লাগিয়াছে?" তাহা হইলে আমি সংক্ষেপে উত্তর দি যে ইংলণ্ড স্বাধীন জীবনের আধার, আর আমাদের ভারত একেবারে পরাধীন। কথায় বলে যে, ক্রীতদাস পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের মাটিতে পা দিলে তৎক্ষণাৎ স্বাধীন হইয়া যায়; আমি নিজেও দেখিতেছি যে, যতদিন হইতে ইংলণ্ডের স্বাধীন বায়ু সেবন করিতেছি, যতদিন হইতে স্বাধীন মানুষের সহিত একত্র বাস করিতেছি, ততদিন হইতে আমার মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইয়াছে। এ ভাব যে কি তাহা আমার দেশীয় ভাই ভগিনীদের নিকটে প্রকাশ করিতে আমি অক্ষম। ভারতবর্ষে যতদিন ছিলাম ততদিন এ সকল কিছুই জানিতাম না, মনেও ভাবিতাম না যে মানুষের জীবনের এত রূপান্তর আছে। পুস্তকে নানা দেশের বিষয় পড়িতাম—

এদেশ স্বাধীন, ওদেশ পরাধীন, এদেশের শাসনপ্রণালী যথেচ্ছাচার, ওদেশের রাজ্যব্যবস্থা নিয়মতন্ত্র—এইরূপ কত পড়িতাম, একরকম করিয়া কথার মানে বুঝিতাম; কিন্তু ঐ কথাগুলি যে কত ভাব প্রকাশ করিতেছে, কত গূঢ় বিষয় সূচনা করিতেছে, তাহা কখনই আমার হৃদয়ঙ্গম হইত না। যথেচ্ছাচার, নিয়মতন্ত্র এই সকল বাক্য আমার মনের কোন প্রকার বিকার জন্মাইয়া দিত না, যেমন পড়িতাম অমনি সেই পর্য্যন্ত শেষ হইত। এখন দেখিতেছি যে যেমন অন্ধের কিবা দিন কিবা রাত, তাহাকে রাত দিনের প্রভেদ যতই কেন বুঝাইয়া দাও না সে সকল জিনিসকে কাল দেখিবে, সেইরূপ আমিও এতদিন সকল লোককে পরাধীন চক্ষে দেখিতাম। এখন ছেলেবেলায় যাহা পড়িতাম তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি, কথাগুলির ঠিক ভাব মনে লাগিতেছে। যতই এদেশ আর সেদেশ মিলাইয়া দেখিতেছি ততই আমার জ্ঞান বাড়িতেছে।

(ইংরাজদিগের যতই কেন দোষ থাকুক না, ইহাদের অন্তরে মনুষ্যের সর্ব্বপ্রধান গুণগুলি অতি জাজ্বল্যমানভাবে বিরাজমান রহিয়াছে। শরীরের বল, মনের তেজ, পরিশ্রম ও কার্য্যক্ষমতা এইগুলিতে ইংরাজেরা কাহারও নিকট পরাজয় স্বীকার করে না এবং এই গুণ সকল থাকাতেই ইহারা এত স্বাধীন ও ইহাদের অবস্থা এত উন্নত। যেমন কোন কোন দেশে এমন অনেক লোক আছে যে, তাহাদের উপর অত্যাচার কর, তাহাদের অতিশয় পীড়া দাও, তাহারা পশুর অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকে, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে

কখন মস্তকোত্তোলন করে না; সেইরূপ এই পৃথিবীতে অনেক জাতি পদানত হইয়াও অবনতমুখে কালাতিপাত করিতেছে, এক যথেচ্ছাচারী অধিপতি কিম্বা বিদেশীয়দের হাতে সমস্ত রাজ্যভার দিয়া অম্লান-বদনে আহার নিদ্রা করিতেছে—আত্মমান ও আত্মগৌরব সকলই হারাইয়াছে। ইংরাজজাতি ঐ সকল জাতি হইতে একেবারে বিভিন্ন।

এদেশের লোকেরা যথেচ্ছাচারিতা কাহাকে বলে জানে না। এদেশে একজন রাণী আছেন বটে, কিন্তু ইংরাজেরা জানে যে, কেবল একজন লোকের ইচ্ছায় কোন কাজ করা হয় না, আর রাজ্যশাসনে ইহাদের সকলেরই কিছু কিছু অংশ আছে। দেশটা যে, দেশের লোকেদেরই, তাহা প্রত্যেক ইংরাজের বিলক্ষণ জ্ঞান আছে; দেশীয় হউক বা বিদেশীয় হউক, কেহ ইহাদের উপর বসিয়া যে, নিজের ইচ্ছা ও সুবিধা মত ইংলণ্ডের রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করে, তাহা ইহারা প্রাণ থাকিতে সহিবে না। রাজা বা রাণীর নামে অনেক কাজ হয় বটে, কিন্তু বস্তুতঃ ইংরাজজাতি নিজেরাই সব আসল রাজকর্ম্ম করিয়া থাকে। যুদ্ধ বিগ্রহাদি সম্বন্ধে কোন সামান্য ইংরাজকে জিজ্ঞাসা কর, সে "আমাদের চতুর সৈন্য, আমাদের সাহসী লোক" ইত্যাদি কথা ব্যবহার করিয়া অতি আগ্রহের সহিত উত্তর দিবে। লোকের কথাবার্ত্তায় "এ স্বাধীন দেশ" "আমি ইংরাজ" প্রভৃতি তেজাল কথা সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায়।

এদেশে কেহ কাহারও উপর আধিপত্য সহিতে পারে না, কেহ কাহাকে ঘাড়ে চাপিতে দেয় না। যাহার যে মত সে স্বচ্ছন্দে তাহা প্রকাশ করে; রাজা বা গবর্ণমেণ্টের ভয়ে কেহ

কাঁপে না। সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, বলপূর্ব্বক কেহ কাহাকে কোন কাজ করাইতে পারে না। প্রত্যহ রাশি রাশি সংবাদপত্র বাহির হইতেছে ও তাহাতে সমস্ত রাজকার্য্য সমালোচিত হইতেছে; যাহার যে মত সে তাহা অনায়াসে ও অকুণ্ঠিতভাবে প্রকাশ করিতেছে। দেশে কোন প্রকার অন্যায় বা অবিচার হইলে তাহা তৎক্ষণাৎ সমস্ত সংবাদপত্রে আন্দোলিত হয় এবং যত দিন না তাহার প্রতীকার হয়, তত দিন উহা প্রতি গৃহে প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে। সংবাদপত্রগুলি সর্ব্বসাধারণের মতামতের প্রতিবিম্বস্বরূপ; সাধারণ লোকে সংবাদপত্র দ্বারাই তাহাদের মতামত ব্যক্ত করিয়া থাকে এবং কর্তৃপক্ষীয়েরা সেই সাধারণের মত উপেক্ষা না করিয়া উহা শিরোধার্য্য করেন। সর্ব্বসাধারণের সম্পূর্ণ স্বধীনতাই এদেশের সংবাদপত্রের অলঙ্ঘনীয় প্রভাবের মূল। ইহাদের আর একটি বিশেষ গুণ এই যে, ইহারা কখন স্বাধীনতার অপব্যবহার করে না। সকল বিষয়ে অতি সতর্কতা ও বিবেচনার সহিত কাজ করে; ক্ষমতা আছে বলিয়া কখন অন্যায় বা যুক্তিবিরুদ্ধ কর্ম্ম করে না।

ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়িলে ঐ সকলের দৃষ্টান্ত ক্রমান্বয়ে দেখিতে পাওয়া যায়। অতি পূর্ব্বকালে সাক্সনদের সময়েও এদেশের জ্ঞানী লোকেরা সভায় বসিয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিত এবং রাজাকে ভালমন্দ বিষয়ে উপদেশ দিত, আর তাহারাই রাজাকে মনোনীত করিত। নর্ম্মাণেরা ইংলণ্ড জয় করিবার পর রাজ্যব্যবস্থার কিছু বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল বটে, কিন্তু তখনও রাজা একেবারে যথেচ্ছাচারী ছিলেন না। তখন

সাধারণ লোকদের অধিক স্বাধীনতা ছিল না, কিন্তু রাজা নর্ম্মাণ সম্ভ্রান্তদের দমনে ছিলেন। সম্ভ্রান্ত লোকেরা ক্রমে রাজার ক্ষমতা অনেক কমাইয়া আনিয়াছিল; অনেক সময়ে রাজা তাঁহাদের উপদেশ লইয়া চলিতেন। নর্ম্মাণ ও সাক্সনেরা ক্রমে মিশিয়া গেলে উভয় জাতির সম্ভ্রান্তেরা একত্রে সভায় বসিয়া রাজাকে ঐরূপ পরামর্শ দিত। রাজপদ কৌলিক হইয়া আসিল, সেই জন্য রাজা ঐ সভার সম্মতি বিনা কোন আইন চালাইতে বা প্রজাদের নিকট হইতে কোন নূতন কর গ্রহণ করিতে পারিতেন না। যত বৎসর চলিয়া গেল, সাধারণ লোকদের ক্ষমতা অল্প অল্প করিয়া তত বাড়িতে লাগিল, ক্রমে তাহাদের মধ্য হইতে অনেকে মনোনীত হইয়া রাজার উপদেশক সভায় বসিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে সেই সভা ক্রমে আধুনিক পার্লিয়ামেণ্ট সভায় পরিণত হইল, কিন্তু অতি পুরাকাল হইতেই এদেশে উহার মূল স্থাপিত হইয়াছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজা প্রথম চার্লস যথেচ্ছাচার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই চেষ্টায় তিনি প্রাণ হারাইলেন। পার্লিয়ামেণ্টের বিনা সম্মতিতে তিনি নানা প্রকার কর আদায় করিতে গিয়াছিলেন, তাহাতে সম্ভ্রান্তদের অধিকাংশই রাজার পক্ষ অবলম্বন করিল, কিন্তু পার্লিয়ামেণ্টের অন্যান্য সভ্যেরা উহা সহ্য করিতে না পারিয়া রাজার বিপক্ষে প্রতিবাদ করিল। রাজা তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। রাজা ও পার্লিয়ামেণ্ট সভার মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাজার দল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল এবং বিজয়ীদের অনুজ্ঞায় রাজার

শিরশ্ছেদন হইল; রাজসভায় সাধারণ সভ্যদের ক্ষমতা দ্বিগুণ-তর বাড়িল এবং সম্ভ্রান্তদের একাধিপত্য ভগ্নমূল হইল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পার্লিয়ামেণ্টের এক পক্ষ নিজের ইচ্ছামত বা কেবল নিজেদের সুবিধার জন্য কোন আইন প্রস্তুত করিতে বা চালাইতে পারে না। এদেশে রাজার পদ পৈতৃক; সচরাচর লোকে যেরূপ বিষয় পাইয়া থাকে, সেইরূপ যে উত্তরাধিকারী হয় সেই রাজমুকুট পরিধান করে। ইউরোপের মধ্যে কেবল ইংলণ্ডে স্ত্রীলোক সিংহাসনে বসিয়া রাজ্য করিতে পারে। ভারতবর্ষে হিন্দুদের মধ্যে অনেক সতী ও তেজস্বিনী রাণীর বিষয় ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত আছে, এবং আমরা রাণীর রাজপদ শুনিয়া কোন প্রকার আশ্চর্য্য হই না; কিন্তু ফ্রান্‌স, জর্ম্মণি, রুসিয়া প্রভৃতি দেশে নারীর রাজত্বের কথা শুনা যায় না।

এদেশে যে সভায় সমস্ত আইন প্রস্তুত হয়, তাহাকে পার্লিয়ামেণ্ট সভা বলে; ইহা আবার দুটি স্বতন্ত্র সমাজে বিভক্ত, তাহাদের মধ্যে একটিকে "হাউস অফ লর্ডস" অর্থাৎ সম্ভ্রান্তদের সমাজ, এবং অপরটিকে "হাউস অফ্ কমন্স" অর্থাৎ সাধারণ লোকদের সমাজ কহে। সম্ভ্রান্তদের সমাজে শ্রেষ্ঠ কুলজাত ব্যক্তিরা ও যাজকেরা মিলিত হইয়া রাজ্য ও শাসন সম্বন্ধীয় বিষয়ে তর্কবিতর্ক করিয়া থাকেন। দুই জন প্রধান যাজক এবং চব্বিশ জন যাজক এই সভায় বসেন, কিন্তু লর্ডদের সংখ্যার ঠিক্ নাই; রাজা বা রাণীর ইচ্ছানুসারে তাঁহাদের সংখ্যার বৃদ্ধি হইতে পারে। ইহাঁদের মধ্যে পাঁচ রকম উপাধি আছে—ডিউক, মার্কুইস, আর্‌ল, ভাইকাউণ্ট ও ব্যারণ;

এই সকল উপাধিধারী ভদ্রকুলজাত লোকদের ইংরাজীতে সচরাচর লর্ড বলে। রাজার ন্যায় এই সম্ভ্রান্ত লোকদের শাসন-ক্ষমতা কুলক্রমাগত। সম্ভ্রান্তদের সমাজ ব্রিটিস্ সাম্রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ বিচারালয়; কোন মকদ্দমার সর্ব্বশেষ নিষ্পত্তি এই সভাতেই হইয়া থাকে। সাধারণদের সমাজে প্রায় ছয় শত সত্তর জন সভ্য আছেন। এদেশে সম্ভ্রান্ত লোক ভিন্ন অন্য সকল লোকেরা বাছিয়া এই সভ্যগুলিকে হাউস অফ্ কমন্সে পাঠায়। ইহাঁরা নগর, জেলা, পল্লীগ্রাম ও বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক দ্বারা মনোনীত হইয়া তাহাদের প্রতিনিধি স্বরূপ ঐ সমাজে রাজকার্য্য সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিা থাকেন। সাধারণদের সমাজের বিশেষ ক্ষমতা এই যে, সমস্ত রাজ্যের আয়ব্যয়ের ভার ইহাঁদের হাতে এবং এইজন্যই ইহাঁরা রাজাকে দমনে রাখিতে পারেন।

পার্লিয়ামেণ্টের দুই ভাগের সভ্যদের মধ্য হইতে মন্ত্রিবর্গ মনোনীত হইয়া থাকেন এবং বস্তুতঃ এই মন্ত্রীরাই রাজা বা রাণীর নামে রাজ্য শাসন করেন। পার্লিয়ামেণ্ট সভার দুই বিভাগেই নূতন আইন প্রস্তাব করা যাইতে পারে। যখন কোন নূতন আইন প্রথম প্রস্তাবিত হয়, তখন ইহাকে "বিল" বলে। এই বিল যে সমাজে প্রস্তাবিত হয়, সেখানে ইহা তিন বার পঠিত হয় এবং অনেক তর্কবিতর্কের পর ঐ বিলের কোন সংশোধন বা উন্নতি করা হইলে যদি প্রতিবারেই সেই সমাজের অধিকাংশ সভ্য পাণ্ডুলিপির সপক্ষতা করে, তাহা হইলে ঐ বিল অপর সমাজে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এ সমাজেও আবার উহা তিন বার পড়া হয়, এবং তর্কবিতর্ক করিয়া যদি সভ্যদের অধি-

কাংশ কোন পরিবর্ত্তন বা বিনা পরিবর্ত্তনের পর প্রতিবারেই ঐ বিলের সপক্ষ হয়, তাহা হইলে রাজা বা রাণীর নিকট উহা প্রেরিত হইয়া থাকে। তিনি এই পাণ্ডুলিপি স্বাক্ষর করিলে পর ইহা দেশের আইন বলিয়া পরিগণিত হয়।

প্রত্যেক সমাজেই যে কেহ সভ্য ইচ্ছা হইলে কোন নূতন আইনের প্রস্তাব করিতে পারেন, কিন্তু মন্ত্রীরাই অধিকাংশ বিধির সূত্রপাত করিয়া থাকেন। মন্ত্রিবর্গ কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত কোন প্রধান বিধির পাণ্ডুলিপি সাধারণদের সমাজে যদি উপরি-উক্ত প্রকারে অনুমোদিত না হয়; অর্থাৎ যদি অধিকাংশ সভ্য উহার বিপক্ষতা করেন, তাহা হইলে মন্ত্রীরা নিজেদের পদ ছাড়িয়া দেন। এইরূপ ঘটিলে পার্লিয়ামেণ্ট সভা ভাঙ্গিয়া যায় এবং পুনর্ব্বার সাধারণদের সমাজের সভ্যেরা, নগর, জেলা ইত্যাদির অধিবাসীদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হন। নূতন পার্লিয়া-মেণ্টের সভ্যদের মধ্য হইতে আবার নূতন মন্ত্রিবর্গ নিযুক্ত করা হয়।

ইংরাজেরা রাজনীতি সম্বন্ধে দুই প্রধান দলে বিভক্ত। তাহাদের মধ্যে এক দলকে "লিবরল্" অর্থাৎ উন্নতিশীল ও অপরটিকে "কন্সর্বেটিব" অর্থাৎ রীতিরক্ষক বলে। লিবরল্রা রাজ্যব্যবস্থা সম্বন্ধে নানা প্রকার উন্নতি ও পরিবর্ত্তন করিতে চাহে এবং কুসংস্কারাবদ্ধ না হইয়া যতদূর সাধ্য সকল বিষয়ের উন্নত অবস্থা দেখিতে ভালবাসে। ইহারা শান্তি, মিতব্যয়িতা ও উন্নতি ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া জনসমাজে পরিচয় দেয়। ইহারা বিদেশীয়দের সহিত মিল করিয়া থাকিতে ভাল বাসে, নিজ জাতির ন্যায় অন্যান্য জাতিদেরও ভালমন্দ বিবেচনা

করে এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকদের সুখদুঃখে সুখী ও দুঃখী হয়। কন্সর্বেটিবরা কিন্তু এদেশের রাজ্যব্যবস্থাকে বর্ত্তমান অবস্থাতেই রাখিতে চাহে, উহার সম্বন্ধে কোন প্রকার উন্নতি বা পরিবর্ত্তন করিতে অত্যন্ত বিমুখ, এবং অন্য দেশ অপেক্ষা নিজ দেশেরই শ্রীবৃদ্ধি ও উপকার অনুপকার অধিক বুঝে।

এখানে ঐ দুইটি ভিন্ন আরো দুই একটি ছোট ছোট দল আছে, কিন্তু অধিকাংশ লোকেই লিবরল্ কিম্বা কন্সর্বেটিব্‌দের দলের অন্তর্ভূত। পার্লিয়ামেণ্টের অধিকাংশ সভ্য লিবরল্ কিম্বা কন্সর্বেটিব। পার্লিয়ামেণ্ট ভঙ্গ হইবার পর সাধারণদের সমাজের সভ্যেরা সকলেই আবার এক সময়ে মনোনীত হন। সেই সাধারণ নির্ব্বাচনের পর যদি লিবরল্ সভ্যের সংখ্যা কন্সর্বেটিবদের অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে লিবরলদের মধ্য হইতেই নূতন মন্ত্রীরা নিযুক্ত হইয়া থাকেন। সেই পার্লিয়া-মেণ্টে দুই সমাজেরই কন্সর্বেটিব সভ্যদিগকে "প্রতিবাধক" নাম দেয়; কারণ তাঁহারা সেই সময়কার মন্ত্রীদের প্রস্তাবিত অধিকাংশ বিধিগুলির প্রতিবন্ধকতা করিয়া থাকেন। সেই প্রকার কোন সাধারণ নির্ব্বাচনের পর যদি কন্সর্বেটিব্ সভ্যদের সংখ্যা অধিক হয়, তাহা হইলে সেই দল হইতেই মন্ত্রীরা নিযুক্ত হইয়া থাকেন; এবং সেই পার্লিয়ামেণ্টের লিবরল্ সভ্যেরা সেই সময়ে "প্রতিবাধক" নামে কথিত হন।

সচরাচর প্রতি ছয় কিম্বা সাত বৎসর পরে নূতন পার্লিয়া-মেণ্ট বসিয়া থাকে, এবং ঐ সময়ে সাধারণদের সমাজের সভ্যেরা পুনরায় মনোনীত হইয়া থাকেন; কিন্তু ঐ কাল পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে উপরিলিখিত কারণ বশতঃ যদি মন্ত্রীরা

নিজেদের কাজ ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে ছয় সাত বৎসর অপেক্ষা অল্প কালের মধ্যেও পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যদের আবার সাধারণ নির্ব্বাচন হয়। কিন্তু অন্ততঃ প্রতি সাত বৎসরে নূতন পার্লিয়ামেণ্টের জন্য সাধারণ নির্ব্বাচন হইতেই হইবে, কারণ এদেশের রাজ্যব্যবস্থার নিয়ম অনুসারে কোন পার্লিয়ামেণ্ট সাত বৎসরের বেশী বসিতে পারে না। এখানে সাধারণ নির্ব্বাচনের সময় যে কত ধুমধাম ও গোলমাল হইয়া থাকে তাহা বর্ণনা করা সহজ নয়, বিশেষ সেই সময়ে উপস্থিত না থাকিলে ভারতবর্ষীয়দের পক্ষে উহা যথার্থরূপে বোধগম্য হওয়া এক প্রকার অসাধ্য।

একজন বিখ্যাত ইংরাজ গ্রন্থকার কোন নগরের পার্লিয়া-মেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচনের নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য বাছিবার জন্য এ রকম বিষম বিরোধ এ নগরে আগে কখন হয় নাই। জন কন্সর্বেটিবদের প্রতিনিধি হইতে চাহিতেছেন, এবং স্মিথ তাঁহার বন্ধুদের অনুরোধে লিবরল্দের প্রতিনিধি হইতে স্বীকার করিয়াছেন। উভয় পদপ্রার্থী, কিছুদিন হইল, এক এক বিজ্ঞপ্তি-পত্র প্রকাশ করিয়া-ছেন। ইহাতে তাঁহারা নিজদের মতামত, পার্লিয়ামেণ্টে বড় বড় রাজনৈতিক বিষয় সম্বন্ধে কোন্ পক্ষের পোষকতা করি-বেন, এবং নগরবাসীদের শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়া রাজসভায় তর্ক-বিতর্ক করিবেন ইত্যাদি—অনেক কথা বলিয়াছেন। নগরের লোকদের মধ্যে ভয়ানক দলাদলির হাঙ্গামা পড়িয়াছে, সকলেই লিবরল্ এবং কন্সর্বেটিব এই দুই পক্ষের একটা না একটাতে যোগ দিয়াছে। লিবরল্রা নীল ফিতা পরে বা কোন রকম

নীল চিহ্ন ধারণ করে বলিয়া তাহারা নীলদল নামে খ্যাত এবং লাল চিহ্নের জন্য লোকে কন্সর্বেটিবদের লালদল বলে।

উভয় দলই নিজেদের পক্ষ বজায় রাখিবার নিমিত্ত প্রাণ-পণে চেষ্টা করিতেছে। কি সমাজে, কি বাজারে, যেখানে নীলেদের ও লালেদের মধ্যে দেখা হয়, সেইখানেই তুমুল ঝগড়া আরম্ভ হয়। যে কোনই কথা উঠুক না কেন নীলেরা যে পক্ষ লইয়াছে, লালেরা তার বিপরীত পক্ষ লইবে। উভয় দলই প্রায় প্রতিদিন সভা করিয়া এ ওর কুৎসা গাইতেছে আর নিজ নিজ গুণকীর্ত্তি করিতেছে। নগরে চারখানা সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়, তাহাদের মধ্যে দুটি লিবরল্‌দের পক্ষাবলম্বী এবং অন্য দুটি কন্সর্বেটিবদের হইয়া অপর দলের বিপক্ষতা করিতেছে। নগরের চারিদিকে লাল ও নীল নিশান উড়িতেছে এবং পথে ঘাটে সর্ব্বত্রই বড় বড় কাগজ মারা রহিয়াছে, ইহাতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নীল বা লাল অক্ষরে নগরবাসীদের জন কিম্বা স্মিথকে প্রতিনিধি করিয়া পাঠাইতে ডাকিতেছে। দোকানের জানালার দিকে চাহ বা বাড়ীর ছাদের উপর দেখ, ভাড়াগাড়ীর উপর বা মানুষের পিঠের উপর—যে দিকে তাকাও সেই খানেই ঐ রকম নীল বা লাল অক্ষরে ছাপা কাগজ দেখিতে পাইবে। নগরের সকল স্থানেই পদপ্রার্থীরা কিম্বা তাঁহাদের লোক সভা করিয়া বক্তৃতা করিতেছেন। আবার তাঁহারা নগরবাসীদের বাড়ী বাড়ী গিয়া নিজেদের পছন্দ করি-বার নিমিত্ত বুঝাইয়া বলিতেছেন।

এইরূপে প্রায় একমাস চলিয়া গেল, ক্রমে ক্রমে গোলমাল ভয়ানক বাড়িয়া উঠিল। অবশেষে নির্ব্বাচনের দিন আসিয়া

উপস্থিত হইল। অতি প্রাতঃকাল হইতেই নগরের মধ্যে তুমুল হট্টগোল পড়িল, সকলেই যেন দিশেহারা হইয়া যাহাতে জন কিম্বা স্মিথ নির্ব্বাচিত হন সর্ব্বান্তঃকরণে তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিল। দিবারম্ভ হইতেই ঢাক্, শিঙ্গা ও ভেরী বাজিতে লাগিল, মানুষের রৈ রৈ রব ও গাড়ী ঘোড়ার ঘড় ঘড় শব্দ নগরের সকল রাস্তায় প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল; মধ্যে মধ্যে কোথাও বা দুই দলের মধ্যে হাতাহাতি পর্য্যন্তও চলিতে আরম্ভ হইল। ক্রমে বেলা দুই প্রহর অতীত হইল,জন এবং স্মিথ উভয়েই নগরবাসীদিগকে শেষ কথা বলিলেন। প্রত্যেকেই বলিলেন যে, যাহারা তাঁহাকে সভ্য করিয়া পাঠাইবে বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছে, তাহাদের মত বুদ্ধিমান, স্বাধীনমনা, তেজস্বী ও সদাশয় ব্যক্তি ত্রিজগতে আর কোথাও নাই; বিপক্ষ দলের লোকেরা মূর্খ ও বুদ্ধিহীন, তাহাদের মাথার ঠিক নাই; এবং যাহাতে নগরের ও নগরবাসীদের উপকার হয়, যাহাতে নগরের ব্যবসা ও কারবার আরো ভাল হয়, যাহাতে নগরবাসীরা সুখে থাকে, তাহারই জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। উভয় দলেই অনেক গাড়ী ঘোড়া করিয়া মহা সমারোহের সহিত নগরের ভিতর দিয়া যাত্রা করিল; রাস্তার দুধারে লোকের ভিড়—কেহ বা বাহবা দিতেছে, কেহ বা চীৎকারস্বরে ধিক্কার করিতেছে।

অবশেষে নির্ব্বাচনের সময় আসিল। নির্ব্বাচকেরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া জন কিম্বা স্মিথের পক্ষে নিজ নিজ মত লিখিয়া দিতে আরম্ভ করিল। নগর গোলমালে তোলপাড় হইতে লাগিল; কোথাও বা গাড়ী করিয়া রাশি রাশি লোক সেখানে যাই-

তেছে, কোথাও বা দলে দলে হাঁটিয়া যাইতেছে। রাস্তায় লোকে লোকারণ্য, সকলেই যেন উন্মত্তপ্রায়—একদণ্ডও কেহ নিস্তব্ধ হইয়া থাকিতেছে না। চারিদিকে নীল বা লাল রং দৃষ্ট হইতেছে; মদের দোকানগুলিতে সকলের অপেক্ষা বেশি ঘটা, সেখানে যেমন জাঁকজমকের নিশান উড়িতেছে তেমন আর কোথাও দেখিতে পাইবে না। যে বাড়ীতে সকলে গিয়া নিজ মত লিখিয়া আসিতেছে, সে বাড়ীর চারিদিকে ভয়ানক ভিড়, অতি কষ্টে লোকে তাহার ভিতর যাইতেছে। ক্রমে আরো ভিড় হইল, আরো গোলমাল হইতে লাগিল; মানুষের রৈ রৈ রব দ্বিগুণতর হইয়া উঠিল।

এইবার সকলের মত লেখা শেষ হইল। হঠাৎ সমস্ত নীরব হইয়া গেল, সকলেই কি হইল জানিবার জন্য শ্বাস বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে, কোন্ দিকে কত লোক মত দিয়াছে তাহার গণনা শেষ হইলে, নগরের প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট, স্মিথের পক্ষে একশত জন লোক বেশি, অতএব স্মিথই নগরের প্রতিনিধিস্বরূপ পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য মনোনীত হইলেন, ইহা সর্ব্বসাধারণের নিকট ঘোষণা করিয়া দিলেন। আবার ভয়ঙ্কর কলরব শুনা গেল। স্মিথের দিকের লোকেরা চীৎকারস্বরে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল এবং বিপক্ষ দলের লোকেরা ক্ষুব্ধ হইয়া বিকৃতস্বরে গর্জনপূর্ব্বক অসন্তোষ প্রকাশ করিল। কোথাও কোথাও দুই দলের মধ্যে ঝগড়া ও মারামারি হইয়া গেল। ক্রমে কোলাহল থামিয়া আসিল, লোকের ভিড় ভাঙ্গিল ও সকলে পুনর্ব্বার নিজ নিজ কর্ম্মে মন দিল; এইরূপে নির্ব্বাচনও শেষ হইয়া গেল।

# অষ্টাদশ অধ্যায়।

## দৈনিক জীবন।

ইংলণ্ডে ধনী ও ভদ্রলোকদের এবং গৃহস্থ ও দরিদ্র লোকদের দৈনিক জীবনে অনেক প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় সকল ভদ্রলোক বেলা সাড়ে আট্টার সময় বিছানা হইতে উঠিয়া নয়টার সময় 'ব্রেকফাষ্ট' অর্থাৎ প্রাত-র্ভোজন করে। এই খাওয়াতে বেশি আড়ম্বর নাই; রুটি, মাখন, টোষ্ট, সিদ্ধ ডিম, মাছ, কখন কখন দু একটু মাংস এবং চা বা কাফি খাইয়া থাকে। প্রাতর্ভোজনের পর গৃহকর্ত্তা কর্ম্মে যায় আর গৃহিণী সংসারের কর্ম্ম দেখে এবং কখন বা নিজের পোষাক লইয়া ব্যস্ত থাকে। বেলা একটার সময় ইহারা 'লাঞ্চ' অর্থাৎ জলখাবার খায়; ভারতবর্ষের ইংরাজেরা এই আহারকে 'টিফিন' বলে। এই সময়ে ইহারা রুটি, মাখন, সামান্য মাংস, দুই এক গেলাস মদ ইত্যাদি আহার করে। পুরুষেরা প্রায় নিজ নিজ কর্ম্মস্থানে লাঞ্চ খাইয়া থাকে। লাঞ্চের পর স্ত্রীলোকেরা বাহিরে বেড়াইতে যায়, বাজার করে বা বন্ধুদের সহিত দেখা করিতে যায়। 'ডিনার' এদেশের প্রধান আহার, বড়মানুষেরা ও ভদ্রলোকেরা বেলা ছয়টা ও সাতটার মধ্যে এই ডিনার ভোজন করে। রাধুনী চার পাঁচ ঘণ্টা ধরিয়া নানারকমের সুখাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করে, তার পর চাকরাণী বা চাকর একটি বড় টেবিলের উপর পরিবারের সমস্ত পরিজনের জন্য ভোজন স্থান ঠিক করে। টেবিলের উপর

চাদর পাতিয়া কাঁটা, চাম্‌চে, ছুরী, গেলাস ইত্যাদি রাখে এবং অতি উত্তমরূপে সাজায়; তার পর ঠিক খাবার সময় হইলে, খাদ্যসামগ্রী আনিয়া একটি ঘণ্টা বাজাইয়া বাড়ীর সকল লোককে জানায় যে টেবিলের উপর ডিনার প্রস্তুত রহিয়াছে। তখন এক এক করিয়া কর্ত্তা, গৃহিণী, বালক, বালিকা সকলে আসিয়া টেবিলের চারিদিকে বসে এবং বসিবার পূর্ব্বে বাড়ীর কর্ত্তা 'গ্রেস' অর্থাৎ পরমেশ্বরের প্রসাদ বলে। প্রসাদ বলার পর ভোজন আরম্ভ হয়; এই খাওয়াতে যে কত সময় লাগে তাহার ঠিক নাই, কোন কোন পরিবার এক ঘণ্টার মধ্যে আহার শেষ করে, কেহ কেহ বা দুই ঘণ্টা ধরিয়া মদমাংসের শ্রাদ্ধ করে। এই ডিনার খাওয়ায় বড় ঘটা; সুপ, মাছ, ঝলসান বা ভাজা মাংস, আলু, শাকসব্জী, মিষ্টান্ন, ফল, মদ্য ইত্যাদি নানা রকম সুখাদ্য দ্রব্য খাইয়া থাকে। ডিনারের পূর্ব্বে বাড়ীর সমস্ত লোক হাত মুখ ধুইয়া ভাল পোষাক পরে। বড় মানুষদের বাড়ীতে এই সময়ে পোষাক পরার অতি ধুমধাম, শুনিয়াছি, ধনাঢ্য স্ত্রীলোকেরা ডিনারের জন্য সাজ করিতে কখন কখন দুই তিন ঘণ্টা সময় দিয়া থাকেন। ইহা শুনিয়া আমাদের হাসি পায় বটে কিন্তু বড় লোকদের বড় কথা, আর বিশেষ বেশবিন্যাস এদেশীয় স্ত্রীলোকদের জীবনের একটি প্রধান কর্ম্ম।

ডিনারের পর সমস্ত পরিবার বৈঠকখানায় বসিয়া গল্প বা গানবাজনা করে অথবা কাগজ বা বই পড়ে। বাপ, মা, উপযুক্ত ছেলে মেয়ে, শিশুসন্তান—সকলেই একসঙ্গে বসিয়া নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা কহিয়া পরস্পর আনন্দলাভ করিতেছে

দেখিলে সত্য সত্যই আমাদের দুর্ভাগ্য ভারতবাসীদের দৈনিক জীবন সুখবিহীন বলিয়া বোধ হয়।) ভারতবর্ষে এরূপ এক সঙ্গে খাওয়ার নিয়মও নাই আর একত্র বসিয়া গল্পাদি করার বন্দোবস্তও নাই। সেখানে বাবু একরকম আহার করেন, মাঠাকরুণ বাড়ীর ভিতরে লুকাইয়া লুকাইয়া ক্ষুধা তৃপ্তি করেন, বড় বড় ছেলেরা আবার আলাদা সময়ে হুট্ পাট্ করিয়া আহার শেষ করে; মেয়েবৌদের যাহা অনুগ্রহ করিয়া দেওয়া হয়, তাহাতেই তাহারা সন্তুষ্ট থাকে আর ছোট ছোট ছেলেরা ত ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। এক সঙ্গে গল্পকরার কথা কি বলিব, আমাদের দেশে সে পাঠ নাই বলিলেই হয়। রাত্রি নয়টার সময় এদেশের ধনী লোকেরা চা পান করিয়া থাকে, ইহার সঙ্গে কেহ কেহ দুই একখানা বিস্কুট ব্যতিরেকে আর কিছু খায় না। তারপর সকলেই প্রায় নিজ নিজ কর্ম্মে মন দেয়; এইরূপে দুই ঘণ্টা কাটিয়া গেলে অধিকাংশ লোকেই রাত্রি এগারটার সময় শুইতে যায়।

গৃহস্থ ও গরিব ইংরাজেরা বেলা ছয় সাতটার মধ্যে উঠিয়া অতি যৎসামান্য রুটি, মাখন, ডিম ইত্যাদি খাইয়া ব্রেকফাষ্ট শেষ করে। পুরুষেরা নিজ নিজ কর্ম্ম করিতে যায় আর স্ত্রীলোকেরা সংসারের কর্ম্মে ব্যস্ত থাকে, ইহারা নিজে অনেক কাজ করে, এবং একটু কম টাকাওয়ালা লোকদিগের ত চাকরাণী রাখিবার ক্ষমতাই নাই। গৃহস্থেরা বেলা একটা দুইটার সময় ডিনার খায়, দরিদ্রেরা ইহার অপেক্ষাও আগে খাইয়া থাকে। ডিনার দিনের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ভোজন হইলেও ইহাতে এদের বেশি আড়ম্বর নাই; এইসময়ে উহারা কেবল

ঝল্‌সান মাংস, সিদ্ধ আলু, দু একটু মিষ্টান্ন, বিয়ার নামক একরকম সামান্য মদ ইত্যাদি খাইয়া থাকে। অধিকাংশ শ্রমজীবীরা কর্ম্মস্থান হইতে বাড়ীতে ডিনার খাইতে আসে এবং খাওয়ার পর আবার কাজে যায়। স্ত্রীলোকেরা সংসারের কাজ যাহা বাকি থাকে তাহা শেষ করিয়া পোষাক করে, তারপর সেলাই করে বা কোন কাজে বাহিরে যায়। বেলা ছয় সাতটার সময় পুরুষেরা কর্ম্মস্থান হইতে ফিরিয়া আসিলে সকলে মিলিয়া চা, রুটি, মাখন ইত্যাদি খায়। এই চা পানের পর পরিবারের সকলে এক সঙ্গে বসিয়া গল্প করে বা কাগজ পড়ে এবং বিশ্রাম লয়। রাত্রি নয় দশটার সময় ইহারা 'সাপার' অর্থাৎ রাত্রিভোজন করিয়া থাকে; এই শ্রেণীর লোকেরা ডিনারের মত সাপারে মাংস, আলু, রুটি ইত্যাদি নিরেট জিনিস খায়। রাত্রিভোজনের পর ইহারা প্রায় দশটার সময় শুইতে যায়।

এইরূপে ইংলণ্ডের সমস্ত লোকে দৈনিক জীবনের কার্য্য শেষ করিয়া থাকে। এই সম্বন্ধে ইহাদের মধ্যে কোন অনিয়ম দেখা যায় না, এমন কি বাড়ীতে কোন বিপদ বা গোলমাল ঘটিলেও ইংরাজ সংসার প্রতিদিন একরকম ভাবে চলিয়া থাকে। এরূপ নিয়মিত খাওয়া দাওয়াতে যে কেবল শরীর ভাল থাকে তাহা নয়, ইহাতে অনেক সময় বাঁচে এবং সংসারে বিশৃঙ্খলা ঘটে না। ভারতবর্ষে সকল বিষয়ে নিয়ম না থাকার দরুণ অনেক পরিবারে সদাসর্ব্বদাই বড় গোলমাল হইয়া থাকে। আজ সময়ে ভাত রাঁধা হয় নাই বলিয়া বাবু রাগ করিয়া অনাহারে আফিসে গিয়াছেন, কাল বিকাল

বেলায় ঠিক সময়ে খাবার প্রস্তুত হয় নাই দেখিয়া বড় বাবু চটিয়াছিলেন—এইরূপ রাগারাগি ও অনিয়মের কথা বঙ্গ-পরিবারে অনেক সময়ে শুনিতে পাওয়া যায়। আর ভারত-বর্ষীয় স্ত্রীলোকদের খাওয়া দাওয়ার সময়ের ত কিছুই ঠিক নাই, কোন দিন বা দশটার সময়, কোন দিন বা আবার দুই প্রহরের সময় ভাত খাওয়া হয়। কিন্তু ইংরাজদের সংসারে সকল কর্ম্মের সময় ঠিক থাকাতে, ঐরূপ গোলমাল বা রাগারাগির কথা প্রায় কখনই শুনিতে পাই না।

ভারতবর্ষ হইতে প্রথম আসিয়া এদেশের কি ছোট, কি বড়, সমস্ত বাড়ীর দরজা বন্ধ দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্য হইতে হয়, মনে হয় লোকেরা বুঝি বাড়িতে চাবি দিয়া অন্য কোন দেশে বেড়াইতে গিয়াছে। কিন্তু তাহা নয়, সকল বাড়ীর সদর দরজা বন্ধ রাখা এদেশের নিয়ম; বোধ হয় এদেশ শীতল এবং ইহা অধিক নিরাপদ ও নির্জ্জন বলিয়াই ইংরাজ জাতি এরূপ পছন্দ করে। প্রত্যেক বাড়ীর দরজায় ঘা মারিবার জন্য হাতুড়ির মত একটা লোহার জিনিস লাগান আছে, তাহাকে "নকার" বলে। অনেক বাড়ীতে নকার ও ঘণ্টা দুই থাকে, কোন লোকের বাড়ীতে যাইবার বা গৃহবাসীদের ডাকিবার আবশ্যক হইলে দরজায় ঘা মারিতে বা ঘণ্টা বাজাইতে হয়। পাছে কোন গোলমাল হয় এই জন্য ভিন্ন ভিন্ন লোকের আলাদা আলাদা রকমের ঘা মারিবার নিয়ম আছে। কোন ভদ্রলোক বা বন্ধুবান্ধব কাহারও বাড়ী গেলে তিন চার বার দরজায় আঘাত করেন; ডাকওয়ালা চিঠি আনিলে তাড়াতাড়ি দুবার ঘা মারে; এবং দোকানদার,

চাকর, চাকরাণী ইত্যাদি লোকেরা দরজায় কেবল একবার ঘা মারিয়া থাকে। গৃহস্থিত লোকেরা ভিতরে বসিয়াই কোন্ রকমের লোক আসিয়াছে তাহা বুঝিতে পারে এবং তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়া শীঘ্র দ্বার খুলিয়া দেয়।

ইংলণ্ডে মধ্যবিত্ত লোকদের বাড়ীতে বসিবার ঘর, খাবার ঘর, পরিবার অনুসারে পাঁচ ছয়টা শোবার ঘর, রান্নাঘর ও কাপড় ধোবার ঘর থাকে। তাহা ভিন্ন সদর দরজার সম্মুখে একটি ছোট দালান, কয়লার ঘর, ও বাসনের ঘর এবং বাড়ীর পশ্চাৎদিকে একটি ছোট বাগান থাকে। এখানে বাড়ী নির্ম্মাণ করিবার সময় কোথায় কোন ঘর হবে এবং কোথায় কত স্থানের আবশ্যক তাহা সব ঠিক করিয়া গোড়া থেকেই ঘরগুলি আলাদা আলাদা রকমে প্রস্তুত করে, সেজন্য বাড়ীর মধ্যে কোন স্থান মিথ্যা নষ্ট হয় না বা ঘর লইয়া কোন গোলমাল হয় না। বড় মানুষদের বাড়ীতে ঐ সকল ঘর ভিন্ন বড় বৈঠকখানা, পড়িবার ঘর, তামাক খাইবার ও পোষাকের ঘর, মদ রাখিবার স্থান এবং দাসদাসীদের ঘর থাকে। অনেক বাড়ীতে ফুলের গাছ রাখিবার জন্য একটি কাচের ঘর আছে, তাহাকে কন্সর্বেটরী বা গরম ঘর বলে। আজ কাল অনেক বাড়ীতে স্নান করিবার ঘরও থাকে। ইংরাজদের মধ্যে স্নানের বন্দোবস্ত নাই। এখন অন্যান্য জাতিদের দেখিয়া ধনীলোকেরা স্নান করিতে শিখিয়াছে, কিন্তু শীতের জন্যই হউক বা অভ্যাসবশতই হউক, এদেশের ছোট লোকেরা অতিশয় অপরিষ্কার। উহারা ছমাসে একবারও সমস্ত শরীর পরিষ্কার করে কি না সন্দেহ। এদেশের ধনী-

লোকদের বাড়ী ভিন্ন গৃহস্থদের বাড়ীতে স্নানঘর দেখাই যায় না। আজকাল লণ্ডনে ও বড় বড় নগরে সর্ব্বসাধারণের স্নানের সুবিধার জন্য কতকগুলি সাধারণ স্নানঘর আছে। সেখানে সকলে গিয়া ইচ্ছামত স্নান করিতে পারে। কিন্তু ঐস্থানে স্নান করিতে অতিশয় খরচ পড়ে; প্রথম শ্রেণীতে স্নান করিবার জন্য স্নানঘর অনুসারে এক টাকা হইতে প্রায় ছয় আনা পর্য্যন্ত আর শেষ শ্রেণীতে ছয় আনা হইতে দুই আনা পর্য্যন্ত দিতে হয়।

আমাদের দেশের মত এদেশের বাড়ী বড় বড় নয়; অনেক বাড়ী এক সঙ্গে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া থাকে, বলিয়া আপাততঃ অতিশয় বড় বলিয়া মনে হয়, কিন্তু সাধারণ বাসগৃহগুলি পনর হাত হইতে ত্রিশ হাতের বেশি প্রশস্ত নয়। এদেশের বাড়ীগুলির বাহিরটা দেখিতে ভাল নহে, চারিদিকের দেয়ালে চুণকাম করে না এবং সবুজ বর্ণ খড়খড়ে বা জানালাও নাই। বড় বড় বাড়ী ব্যতীত অন্যান্য বাড়ী সব ইট ও কাঠ দ্বারা নির্ম্মিত, জানালাগুলি কেবল কাচের।

বাড়ীর ভিতর ভাগ দেখিতে মন্দ নয়। প্রত্যেক বাড়ীতে একটি করিয়া সিঁড়ি নীচে হইতে বরাবর উপরে চলিয়া গিয়াছে; অধিকাংশ বাড়ীর সিঁড়ি কাঠের তয়েরি, কেবল বড় বড় অট্টালিকার সিঁড়িগুলি পাথরের ও উত্তমরূপে নির্ম্মিত। সমস্ত ঘরের মেজেতে কাঠের তক্তা মারা এবং ঘরের দেয়ালগুলা ছবিকাটা কাগজ দিয়া ঢাকা। সকল ঘরেরই এক পাশের দেয়ালের গায়ে এক একটি আগুনের জায়গা আছে, শীতকালে তাহাতে আগুন জ্বলে। অগ্নিস্থানের উপরে, দেয়া-

লের গায়ে একটি পটি বসান থাকে, ইংরাজীতে উহাকে "ম্যাণ্টল্ পিস্" বলে, ভাল ভাল ঘরের ঐ পটি মার্ব্বল পাথর নির্ম্মিত। আমাদের দেশের মত এখানে, কিছু কাজ না থাকিলে, কড়িকাঠ বা বরগা গণিবার যো নাই, সব ঘরের ছাদ প্লেন, কোন কোনটার মাঝখানে ফুলকাটা থাকে। এদেশে ঘরের ছাদ তয়েরি করিবার সময় প্রথমে কড়িকাঠ বাসায়, তারপর বরগা ও টাইল ইত্যাদির পরিবর্ত্তে উপরে নীচে দুই দিকেই তক্তা মারিয়া দেয় এবং ভিতর দিকের ছাদে চুণ ও বালি দিয়া চোস্ত করিয়া দেয়। বাড়ীর মধ্যে কেবল ঘরের ছাদগুলি চূণকাম করা। বাড়ীর দরজাগুলা আমাদের দেশের মত দুভাগে বিভক্ত নয়, কেবল এক খানা বড় কপাট বসান। দরজার নীচে চৌকাঠ নাই আর শিকল ও হুড়কার বদলে পিতলের হাতল ও গাচাবি থাকে, কেবল বাড়ীর সদর ও বাগানের দিকের দরজায় লোহার হুড়কা বা বড় বড় ছিটকিনি আছে। বাড়ীর ছাদ কেবল ছোট ছোট কড়িকাঠের তয়েরি, আর তার উপর স্লেট বসান; বাঙ্গালা দেশের মত টাইলও পাতে না, খোয়াও পিটিয়া বসাইয়া দেয় না। ইংলণ্ডের বাড়ী গুলা বাহির হইতে দেখিতে বেশ মজবুদ্ বটে, কিন্তু ভিতরে কিছু দিন বাস করিলেই সেগুলা যে কত অপক্ক তাহা বুঝা যায়। বোধ হয় আমাদের ভারতবর্ষের মত একটা প্রচণ্ড ঝড় বহিলে এখানকার সমস্ত বাড়ী দুই এক ঘণ্টার মধ্যে হুড়্মুড়্ করিয়া পড়িয়া যায়। সাধারণ বাড়ীর দেয়াল অতি সরু সরু, বনিয়াদ অতি কম গভীর, কড়িকাঠ বড় পাতলা, আর ইট, খোয়া ও চুণ সুর্‌কির পরিবর্ত্তে কেবল কাঠের শ্রাদ্ধ করে।

আমাদের দেশের মত এখানে হাঁকাহাঁকি করিয়া চাকর চাকরাণীদের ডাকিবার বন্দোবস্ত নাই। বাড়ীর প্রতি ঘরেই অগ্নিস্থানের কাছে দেয়ালের গায়ে একটি পিতলের হাতল লাগান থাকে; ঐ হাতলগুলির বাড়ীর নীচের তালায় অনেকগুলা ঘণ্টার সহিত তার দিয়া যোগ আছে। প্রতি ঘরের ভিন্ন ভিন্ন ঘণ্টা, সুতরাং কেহ কোন ঘর হইতে সেই হাতল নাড়াইলেই চাকর বা চাকরাণী ঘণ্টার শব্দ বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ সেই ঘরে গিয়া উপস্থিত হয়। ইহাতেও ইংরাজেরা সন্তুষ্ট নহে, বিজ্ঞানের নূতন নূতন আবিষ্কারের সঙ্গে ইহাঁরা নিজেদের আরাম বাড়াইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। আজকাল অনেক বাড়ীতে ঐরূপ ঘণ্টার পরিবর্ত্তে বৈদ্যুতিক ঘণ্টা দেখিতে পাওয়া যায়; ঘরের ভিতরে দেয়ালের গায়ে একটা বোঁটার মত কাচের জিনিস টিপিলেই নীচে ঘণ্টা বাজিয়া উঠে।

এদেশের বাড়ীর ভিতরের সজ্জা ও আসবাব দেখিলেই, ইংরাজেরা যে কেমন সুখস্বচ্ছন্দে থাকিতে ভালবাসে আর ইংলণ্ডে কত বাবুয়ানা বাড়িতেছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। বড়মানুষেরা সকল দেশেই বিলাসদ্রব্যপ্রিয়, কিন্তু এখানে অতি সামান্য গৃহস্থের বাড়ীতেও কার্পেট বা ভাল গালিচা, গদিমোড়া কৌচ ও চৌকী, বড় মেহগনি কাঠের টেবিল, পিয়ানো, ভাল দেরাজ, বড় বড় আর্শি, ছবি, গ্যাসের ঝাড় ইত্যাদি নানাপ্রকার দামী ও আরামের জিনিস দেখা যায়। তাহা ভিন্ন ছোট খাট অনেক রকম দ্রব্যে বাড়ীগুলি একেবারে ঠাসা থাকে। এমন কি একজন অতি সামান্য ছুতার বা কামারের বাড়ী গেলে দেখিতে পাইবে, তাহার বসিবার ঘরের

মেজেতে গালিচা পাতা, জানালায় ভাল পর্দা টাঙ্গান আর টেবিল, গদিমোড়া কৌচ ও চৌকি, শেল্ফ, ছবি, ঘড়ি ইত্যাদি আসবাব রহিয়াছে। ঘরটি বেশ পরিষ্কার আর অতি পরিপাটীরূপে সাজান। এদেশের গরিব লোকেরা বাড়ী সাজান বিষয়ে তাহাদের উপরকার লোকদের অনুকরণ করিয়া থাকে, উহারা আবার উহাদের অপেক্ষা ভাল অবস্থার লোকদের অনুকরণ করে। এইরূপে এদেশে অতি সামান্য লোকদের মধ্যেও বাবুয়ানা ঢুকিয়াছে এবং আমাদের দেশে যেগুলিকে বিলাসদ্রব্য বলিয়া মনে করি, এখানে দরিদ্র লোকেরাও সেগুলিকে অতি দরকারি বলিয়া ভাবে। অধিক বলিব কি দুই একজন সামান্য লোকের বাড়ী দেখিলে আমাদের দেশের বড়মানুষদের বাড়ী অপেক্ষা ভাল ও আরামদায়ক বলিয়া বোধ হয়। এখানে একটা দশ ঘরওয়ালা বাড়ী ইংরাজী রকমে ভাল করিয়া সাজাইতে প্রায় ছয় হাজার টাকা খরচ পড়ে।

ইংরাজেরা সকল বিষয়ে কেমন আরাম ও সুখস্বচ্ছন্দ বুঝে তাহা দেখাইবার জন্য ইহাদের রান্নাঘরের বিষয় সংক্ষেপে লিখিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এদেশের অধিকাংশ রান্নাঘর মাটির নীচে এবং উহাতে বেশি বাতাস বা আলো যায় না; তথাপি এই রান্নাঘর আমাদের দেশের অনেক বাড়ীর শোবার ঘর অপেক্ষাও পরিষ্কার। ইহাতে মাটির বা ইটের উনুন নাই, একদিকে দেয়ালের গায়ে রাঁধিবার সুবিধার মত করিয়া লোহার নির্ম্মিত আগুনের স্থান আছে। তাহাতে কাগজ ও ছোট ছোট কাঠ দিয়া কয়লার আগুন জ্বালাইতে হয়, আর

দেয়ালের ভিতরের ধোঁয়ানল দিয়া উঠিয়া সব ধোঁয়া উপর-দিকে বাহির হইয়া যায়। কি গরিব, কি বড়মানুষ সকলেরই সংসারের বন্দোবস্ত অতি চমৎকার। যে যেমন মানুষ তার রান্নাঘরে সেই রকম, ও কখন কখন তাহার অপেক্ষাও বেশি জিনিস থাকে, এবং নিতান্ত ছোট লোকের বাড়ী ভিন্ন সে-গুলিকে যথাসাধ্য পরিষ্কার রাখিয়া দেয়। এখানকার রান্নাঘরেই বা তার অতি নিকটে সব জিনিস থাকে, কোন আবশ্যক দ্রব্যের জন্য উপর নীচে করিতে হয় না। অধিকাংশ বাড়ীর রান্নাঘরের মেজেতে পুরাতন গালিচা পাতা থাকে, আর টেবিল, চৌকী, ও অন্যান্য আসবাব থাকে। দেয়ালের গায়ে তাক্ ও টানা আছে, তাহাতে সমস্ত কাচের বাসন ও রাঁধিবার জিনিসপত্র সাজান থাকে। ঘরের এক কোণে একটি জলের কল ও তাহার নীচে জল যাইবার জন্য একটি ছোট বৌবাচ্চার মত জায়গা আছে। ঘরে ঝুল নাই, দেওয়ালে তেলের দাগ নাই বা মেজেতে কাদা নাই; সমস্ত দ্রব্য অতি পরিপাটীরূপে সাজান, আর যেখানকার যেটি ঠিক সেখানে সেটি রহিয়াছে। অনেক বাড়ীর রান্নাঘরে কৌচ, দেরাজ, ছবি, বই পর্য্যন্তও দেখিতে পাওয়া যায়। এদেশে গরিব ও গৃহস্থ লোকেরা এই রান্নাঘরেই খাইয়া থাকে। ইংরাজেরা যতই শারীরিক অপরিষ্কার হউক না কেন, উহাদের এই সকল সামান্য বিষয়েও নিয়ম ও পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া ইংরাজজাতিকে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

ইংলণ্ডের অধিকাংশ দ্রব্য ভারতবর্ষের অপেক্ষা বেশি দামী। একে ত এদেশ একটা অতি ছোট দ্বীপ, তার পর

এখানে খনিপূর্ণ মাঠ, বড় মানুষদের শিকারভূমি, গরু, ভেড়া চরিবার জন্য পড়া জমি অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। আবার ইংলণ্ডের মাটিকে উর্ব্বরা ও ফলবতী করিতে অনেক যত্ন ও পরিশ্রমের আবশ্যক হয়; সুতরাং এখানে যে সকল জিনিস আক্রা হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি। শুনিয়াছি, পঞ্চাশ বৎসর আগে ইংলণ্ডে রুটী প্রভৃতি সামান্য জিনিসের দাম এখনকার অপেক্ষা তিন চারি গুণ অধিক ছিল। তখন বিদেশ হইতে কোন দ্রব্য আনিলে ভয়ানক শুল্ক দিতে হইত, কাজে কাজেই বিদেশীয় দ্রব্য অতি শস্তা হইলেও ঐ শুল্কের জন্য ইংলণ্ডে বেচিয়া কোন লাভ করিতে পারিত না। ক্রমে ইংরাজেরা সেই শুল্ক উঠাইয়া দিল; তাহার পর হইতে বিদেশ হইতে অনেক জিনিসের আমদানী হইতে লাগিল। এদিকে ইহারাও নূতন কলের সাহায্যে ও আড়াআড়িবশতঃ সকল জিনিস আগেকার অপেক্ষা শস্তায় বেচিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে খাবার জিনিসগুলি অনেক শস্তা হইয়া আসিল। তথাপি সব দাম মিলাইয়া দেখিলে ইংলণ্ডের প্রায় সকল দ্রব্য আমাদের নিকট দুর্মূল্য বলিয়া বোধ হয়। আজ-কাল বিদেশ হইতে গম, আলু, ডিম প্রভৃতি অনেক প্রকার খাদ্যদ্রব্যের আমদানী হওয়াতে জিনিসের সচ্ছলতা হইয়াছে। বাস্তবিক ইংলণ্ডে যত লোকের বাস আর ইহাতে যে রকম অন্ন দ্রব্য জন্মায়, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনে হয় যে, যদি বিদেশের সহিত ইংলণ্ডের সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়া যায় তাহা হইলে এদেশে ছয় মাসের মধ্যে দুর্ভিক্ষ আসিয়া উপস্থিত হয়।

এখানে শস্যের মধ্যে গম, যব ও ওট প্রচুর পরিমাণে

উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সকল ভিন্ন দুই তিন রকম মটর, বর্বটী ইত্যাদিও জন্মায়, আর চাউল, মসুর ডাল, সার্গু প্রভৃতি প্রায় সকল গরম দেশের জিনিস আসিয়া বা আমেরিকা হইতে আইসে। এখানে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল চাউলের সের প্রায় সাত আনা আর মোটা চাউলের তিন আনা। ইহা শুনিয়া ভারত-বর্ষীয়েরা চমকিয়া যাইবেন বটে, কিন্তু সমুদায় ভাবিয়া দেখিলে এদেশের পক্ষে উহা বেশী দাম বলিয়া বোধ হয় না। একে ভারতবর্ষ কিম্বা আমেরিকা—অনেক দূর হইতে আইসে, তার পর আবার ইহারা কত যত্ন ও পরিষ্কার করিয়া রাখে— দোকান থেকে চাউল কিনিয়া আনিয়া না বাছিয়া বা ধুইয়া একেবারে রাঁধিতে পারা যায়, ইহাতে যে কত সময় ও কষ্ট বাঁচে তাহার ঠিকানা নাই। এদেশে নানাপ্রকার উদ্ভিজ্জ জন্মে এবং বিদেশ হইতেও অনেক তরিতরকারির আমদানী হয়। আলু, বাঁধা কপি, পেঁয়াজ ইত্যাদি দরকারী জিনিস প্রায় বার মাস পাওয়া যায়। গ্রীষ্মকালে এখানে কলাইশুঁটী, নূতন আলু, মূলা, কপি, শিম, ইত্যাদি অনেক রকম আমাদের দেশের শীতকালের জিনিস জন্মে। ভাল আলুর সের ছয় সাত পয়সা, একটা বাঁধা কপির দাম পাঁচ পয়সা, কিন্তু কখন কখন ইহা অপেক্ষাও শস্তা পাওয়া যায়। আমাদের দেশের ফলের সঙ্গে এদেশের ফলের তুলনাই হয় না, তবে এখানে বার মাসই দু চার রকম ছোট ছোট সুস্বাদু ফল পাওয়া যায়। ফলের মধ্যে ষ্ট্রবেরি, পেয়ার, আঙ্গুর, আপেল, বেদানা ইত্যাদি প্রধান। স্পেন হইতে রাশি রাশি কমলালেবু আসিয়া থাকে। এখানে সব ফলেরই দাম বড়

বেশী, কিন্তু তেমনি আবার এমন দ্রব্য নাই যে এখানে পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষের আনারস, কলা, নারিকেল, আক প্রভৃতি অনেক ফল লণ্ডনে দেখিতে পাই; এইগুলি আমেরিকা হইতে আইসে, ভয়ানক দাম এবং খাইতেও সুস্বাদু নহে।

যাহা হউক এদেশের অনেক জিনিসের দাম বেশী হইলেও এখানে বাজার করিতে বড় সুখ। ইংরাজেরা যেমন টাকা বুঝে সেইরূপ সময়েরও আদর করে। আমাদের দেশের মত এখানে দরকসার বন্দোবস্ত নাই। সে দেশে একটা সামান্য জিনিস কিনিতে গেলে তার দাম কমাতে কমাতে প্রাণ বেরিয়ে যায়। প্রায় এক ঘণ্টা দরকসাকসি করিয়া এক টাকা থেকে জিনিসটা ছয় আনায় আসিয়া দাঁড়াইল, তবুও ঐ দামে কিনিয়াও মনে শান্তি হইল না, হয় ত অনেক সময়ে ঠকিয়া বাড়ী যাইতে হয়। ইহাতে উভয়দিকেই যে কত সময় নষ্ট হয় ও মাথা দিক্ হইয়া যায় তাহা কেহই বিবেচনা করিয়া দেখে না। এখানে "দর বলিব কি দাম বলিব" এ সব কথা কখন শুনিতে পাওয়া যায় না। সর্ব্বদাই ঠক্ দোকানদারের ভয়ে ত্রস্ত হইয়া থাকিতে হয় না কিম্বা দুই পয়সার জিনিসের জন্য তাহার সহিত কোমর বাঁধিয়া যুদ্ধ করিতে হয় না। বাড়ীর অতি নিকটেই রাস্তার দুধারে সব রকম দোকানের ছড়াছড়ি। কোন জিনিসের দরকার হইলে একটা দোকানে গেলে, দোকানদার অতি ভদ্রভাবে সেই রকম দুচারটা জিনিস দেখাইল, তোমার যেটি পছন্দ হয় ঠিক দাম দিয়া সেইটি কিনিলে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে চুকিয়া গেল, কোন বাগ্‌বিতণ্ডা করিতে হয় না, আর কোন ঝঞ্ঝাটও নাই। আবার দোকানগুলি

এমন পরিষ্কার ও চমৎকার করিয়া সাজান যে, যতই ধনী হউন না কেন, কেহই ইংলণ্ডের দোকানের ভিতর যাইতে ঘৃণা করিবেন না। আমাদের দেশে একটা মুদীর দোকানে যাওয়া দূরে থাকুক, দেখিলেই ভক্তি উড়িয়া যায়। একে ত সমস্ত জিনিস খোলা ও অপরিষ্কার, তাহাতে আবার তেলের ভাঁড় হইতে তেল গড়াইতেছে, নুণের পাত্র হইতে জল চুইয়া পড়িতেছে, গুড়ের কলসীতে এক রাশি মাছি বসিয়াছে—দেখিলে কোন ভদ্রলোকেরই দোকানের ভিতর পা দিতে ইচ্ছা করে না। এখানে মুদী বল, মেছো বল, শাকসবজীওয়ালা বল, আর তেলওয়ালাই বল--সকলেরই দোকানের পরিচ্ছন্নতা ও পরিপাটী দেখিয়া আহ্লাদ হয়। এদেশে ভদ্র, অভদ্র, ধনী বা নির্ধন কোন গৃহিণীই নিজে গিয়া বাজার করিতে অপমান বোধ করে না। এখানকার নিয়ম এই যে, কোন দ্রব্য কিনিলে দোকানদারেরা তাহা বহিয়া বাড়ীতে দিয়া আইসে, সেজন্য জিনিস বহিবার নিমিত্ত কোন ভদ্র স্ত্রীকে কষ্ট পাইতে হয় না। রুটী, দুধ, আলু, শাকসবজী, মাংস ইত্যাদি প্রতিদিনের খাবার জিনিস, দোকানদারেরা এক একটি হাত-টানা বা ঘোড়ার গাড়ী করিয়া নিয়মিতরূপে প্রতি ব্যক্তির বাড়ীতে দিয়া যায়।

এখানকার সচরাচর খাদ্যদ্রব্যগুলি দামী হইলেও অতি উত্তম ও সুস্বাদু। এক একখানা সামান্য বড় রুটীর দাম দশ পয়সা, কিন্তু এরূপ পরিষ্কার ও সুস্বাদু পাঁউরুটী আমাদের দেশের ভাল ভাল ইংরাজী হোটেলেও পাওয়া যায় না। এখানে অতি চমৎকার মাখন পাওয়া যায় এবং শীতের দেশ বলিয়া

উহা অনেকদিন পর্য্যন্ত ভাল থাকে। এ মাখন আমাদের বঙ্গদেশের মত ধপধপে সাদা নয়, একটু একটু হল্‌দে; মাখনের সের এক টাকা বার আনা হইতে দুই টাকা চারি আনা পর্য্যন্ত। বোম্বাইতে অনেকটা ইংরাজী রকমের মাখন পাওয়া যায়, কিন্তু কলিকাতায় এরূপ মাখন কখন দেখি নাই। এদেশের দুধে অনেক ঘি থাকে, বোধ হয় সেইজন্যই ঐরূপ ভাল মাখন তয়েরি হয়। দুধের সের সচরাচর চোদ্দ পয়সা। আমাদের দেশের মত ইংলণ্ডে ঘি পাওয়া যায় না; রাঁধিবার জন্য ইহারা চর্ব্বিই বেশী ব্যবহার করে, কখন কখন তেল বা মাখন দিয়াও রাঁধে। এখানে অনেক রকম চিনি দেখিতে পাই, সচরাচর লোকে যে চিনি ব্যবহার করে, তাহা আমাদের দেশের রোলার মত সাদা ও পরিষ্কার কিন্তু ছোট ছোট ডেলা, দাম প্রায় ছয় আনা সের। রাঁধিবার জন্য এক রকম লাল্‌চে গুঁড়া চিনি ব্যবহার করে, উহা আমেরিকা হইতে আইসে, দাম প্রায় পাঁচ আনা সের। এদেশে একরকম জঘন্য গুড় পাওয়া যায়; এখানকার মধু কিন্তু চমৎকার, দামও তেমনি ভয়ানক। ভারতবর্ষ হইতে হলুদ, লঙ্কা, ধনে, ছোট এলাচ প্রভৃতি অনেক রকম মসলা আসিয়া থাকে, কিন্তু সেগুলা অতিশয় দুর্ম্মূল্য, প্রায় সিকি ছটাক ডালচিনির দাম চার আনা। এদেশের নুণ কিন্তু বড় শস্তা—তিন পয়সা সের। ভারতবর্ষের মত এখানে বিদেশীয়েরা ভয়ঙ্কর শুল্ক বসাইয়া গরিবের নুণ পর্য্যন্তও মারে না।

আমাদের দেশের মত অমন চমৎকার ও অনেক রকমের মাছ এখানে পাওয়া যায় না। গ্রীষ্মকালে রুই মাছের মত 'স্যামন' নামে এক প্রকার বড় ও সুস্বাদু মাছ পাওয়া যায়,

দাম প্রায় দেড় টাকা সের। দু চার রকম ছোট ছোট মাছ আছে, কিন্তু অধিকাংশই আমাদের নিকটে স্বাদহীন আর সকল গুলিই অতি আক্রা। বেশী দাম বলিয়াই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক ইহারা মাছ বড় কম খায়। মুক্তো ইংরাজ কেবল মাংসের জন্য হাঁই ফাঁই করিয়া বেড়ায়। এখানে অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাঁকড়া ও গল্দা চিঙ্গড়ি দেখিয়াছি, এক একটা বড় কাঁকড়া দেখিতে কচ্ছপের মত। ইংরাজেরা ভেড়া, গরু ও শোরের মাংস অধিক খাইয়া থাকে। ভেড়ার মাংস অতিশয় নরম ও সুস্বাদু, এমন কি চার পাঁচ মিনিটের মধ্যে ভাজিয়া খাওয়া যায়—সের প্রায় এক টাকা চারি আনা। গরুর মাংসই ইংরাজদের জাতীয় খাদ্য, শুনিয়াছি ইংরাজী বীফ সকল দেশের অপেক্ষা ভাল। শোরের মাংস অতি শস্তা বলিয়া গরিব লোকেরা উহারই ধ্বংস করিয়া থাকে। মুর্গী, হাঁস, খরগোস প্রভৃতি অনেক গৃহপালিত পশুপক্ষী পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলি অতি বড়মানুষী খাদ্য। আমাদের দেশে যে মুর্গীর দাম চার আনা, এখানে একটা তত বড় মুর্গী দু টাকার কমে পাওয়া যায় না

বোধ হয় এতক্ষণে পাঠক পাঠিকারা বুঝিয়াছেন যে, এদেশে অল্প টাকায় থাকা যায় না। সকল দেশে নগর অপেক্ষা পল্লীগ্রামে খাদ্যসামগ্রী শস্তা পাওয়া যায়, কিন্তু এখানে অধিকাংশ দ্রব্য বিদেশ হইতে আসাতে নগরগুলিতেই জিনিসের সচ্ছলতা অধিক। সুতরাং পল্লীগ্রামে জমী ও বাড়ী সুলভ হইলেও সহর অপেক্ষা অধিক শস্তায় থাকা যায় না। আর এই জঘন্য শীতল ও পরিবর্ত্তনশীল জলবায়ুর দেশে পোষাক

একটা প্রধান খরচের মধ্যে ধর্ত্তব্য। ইংলণ্ডে মোটামুটি হিসাবে কেবল খাওয়া, পরা ও ঘরভাড়াতে একজন দরিদ্র লোকের মাসে পনর টাকা হইতে চল্লিশ টাকা পর্য্যন্ত খরচ পড়ে। একজন গৃহস্থ মাসে পঞ্চাশ হইতে এক শ টাকা খরচ করিয়া থাকে, আর মধ্যবিত্ত রকমে থাকিতে হইলে মাসে এক শ হইতে এক শ পঞ্চাশ টাকার কমে চলে না। উহার উপর যত অধিক টাকা ব্যয় করিবে, তত বড়মানুষ বলিয়া পরিচিত হইবে। পাঁচ ছয় জন মিলিয়া কিম্বা এক পরিবারের মত থাকিলে উহা অপেক্ষা অল্প খরচ পড়ে। অবশ্য লেখা-পড়ার বা অন্য কোন উপরি খরচ এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নাই।

---

# ঊনবিংশ অধ্যায়।

## ব্রিটিস পরিশ্রম-কারুকর্ম্ম-বাণিজ্য-শ্রমজীবি-লোক।

ইংরাজেরা পরিশ্রমের জন্য পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই বিখ্যাত; ইহা এই জাতির একটি সর্ব্বপ্রধান গুণ বলিয়া পরিগণিত হয়। অতীত ইতিহাস পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইংরাজদের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সকল অতি স্পষ্টরূপে ইহাদের পরিশ্রমের সাক্ষ্য দান করিতেছে, আবার বর্ত্তমানকালে ব্রিটিস পরিশ্রম সর্ব্বস্থানে উদাহরণস্বরূপ বিরাজমান রহিয়াছে। ইহারা এই পরিশ্রমের প্রভাবেই অরণ্যবাসী ও অসভ্য জাতি হইতে ক্রমে এত অল্পকালের মধ্যে পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান সভ্য

জাতিদের পদবীতে আরূঢ় হইয়াছে; এবং সাধারণ লোকের শ্রমশীলতার দ্বারাই ইংলণ্ডের মহত্ত্বের মূল রোপিত হইয়াছিল। সংক্ষেপে ইংরাজদের ধন, স্বাধীনতা ও সাম্রাজ্য—সমস্তই এই শ্রমগুণ হইতে উৎপাদিত হইয়াছে। প্রত্যেক ব্যক্তির অকুণ্ঠিত-ভাবে কঠিন কর্ম্মসমূহের নির্ব্বাহ হইতে সমগ্র জাতির শ্রীবৃদ্ধি-সাধন হইয়াছে, এবং ভূমিকর্ষক, আবশ্যক দ্রব্যের প্রস্তুতকারী, অস্ত্রশস্ত্র ও কলবলের আবিষ্কারক ও নির্ম্মাতা, পুস্তকলেখক এবং শিল্পকার—এই সকলের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম ঐ শ্রীবৃদ্ধির প্রধান উপাদান। দৃঢ় পরিশ্রম যেমন এই জাতির শোণিতস্বরূপ, সেইরূপ ইহা আবার ইংরাজদের দূষ্য বিষয়ের নিরাকরণের প্রধান উপায় হইয়াছে। ইহারা অন্য কোন জাতি অপেক্ষা কোন বিষয়ে হীন হইলে যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়া তাহার প্রতিকার করে, এবং দেশের বিধিব্যবস্থায় কোন প্রকার দোষ দেখিলে শ্রমকাতর না হইয়া তাহার অপনোদন করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে।

বহুসংখ্যক ইংরাজের অটল পরিশ্রমের কথা শুনিলে আমরা অবাক হইয়া যাই। অনক পুস্তকে পড়িয়াছি যে, শত শত ইংরাজ অতি সামান্য দরিদ্র ও নীচ শ্রেণীর লোকদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াও কেবল নিজ পরিশ্রমবলে ধনবান্ ও ও যশস্বী হইয়াছিলেন। যে ধূমকল আবিষ্কৃত হইয়া পৃথিবীর বহু জাতির এত উপকার করিতেছে এবং যাহার বলে ইংরাজেরা কারুকর্ম্ম, বাণিজ্যাদি প্রধান কর্ম্ম সকল অনায়াসে ও অবিলম্বে সম্পাদন করিতেছে, সেই পরম হিতকর বাষ্পযন্ত্র কয়েক জন সামান্য শ্রমজীবী ইংরাজ দ্বারা প্রথম উদ্ভাবিত হয়। নিউ-

কমেন, স্মিটন, জেম্‌স ওয়াট প্রভৃতি প্রসিদ্ধ আবিষ্কারকগণের মধ্যে জীবনারম্ভে কেহবা কামার ছিল, কেহ আবার ছুতার বা সামান্য মজুর ছিল। এদেশের বর্ত্তমান সুবিখ্যাত লোকদের মধ্যে অনেকে কেবল শ্রমবলে উন্নত পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। কোন কোন ইংরাজ গ্রন্থকার, একখানি পুস্তক অতি উত্তম-রূপে লিখিয়া কৃতকার্য্য হইবার মানসে, অনবরত কুড়ি পঁচিশ বৎসর তাহার জন্য দৃঢ় পরিশ্রম করিয়া থাকেন। কেহ কেহ কোন নূতন কলের আবিষ্কারের জন্য প্রায় সমস্ত জীবন ও অর্থ তাহাতে ব্যয় করেন। সচরাচর ব্যবসায়, কারুকর্ম্মে এবং অন্যান্য শ্রমসাধ্য কার্য্যে ইহাদের যেরূপ একাগ্রচিত্তে পরি-শ্রম করিতে দেখা যায় এরূপ অন্য কোন জাতি করিতে পারে কি না সন্দেহ। বাস্তবিক জলবায়ুর জন্যই হউক অথবা স্বাভাবিক গুণবশতই হউক, ইংরাজেরা কখন অলস-ভাবে থাকিতে পারে না।

শ্রমশীলতাই এই ইংরাজ জাতির শিক্ষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় হইয়াছে। ইহারা কত মূর্খ অবস্থা হইতে এখন কেমন জ্ঞান-বান্ হইয়াছে; পরিশ্রমই এই মহৎ পরিবর্ত্তনের একমাত্র মূল। কোন কোন কবি কহিয়া থাকেন যে, ক্লেশ ও পরিশ্রম স্বর্গে প্রবেশ করিবার কেবল একই উপায়। বাস্তবিকই মানুষের নিকট নিজ পরিশ্রমের ফল অপেক্ষা কোন ফল অধিক সুস্বাদু নহে। পরিশ্রমের দ্বারাই এই পৃথিবী মানুষের বাসোপযোগী হইয়াছে এবং উহা দ্বারাই মানুষ সভ্যতা লাভ করিয়াছে। অনেকে অলস অবস্থাকে পরম সুখকর এবং পরিশ্রমকে অতি-শয় দুঃখকর বলিয়া ভাবেন, কিন্তু তাঁহারা একটু বিবেচনা

করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, যেমন শিরা, ধমনী, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির চালনা বিরহে শরীর অকর্ম্মণ্য হইয়া যায় সেইরূপ বিনা পরিশ্রমে মানুষ অপদার্থ হইয়া পড়ে। পরিশ্রম পরমেশ্বর-দত্ত প্রসাদ। ইংরাজেরা এই প্রসাদ পাইয়াই সকল প্রকার কঠিন ও ক্লেশাবহ কর্ম্ম করিতে অগ্রসর হয়, এবং ইহারই কল্যাণে ইহারা বাণিজ্য ও কারুকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া কত জাতিকে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। বাণিজ্যের নিমিত্তই ইংরাজেরা প্রথমে ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছিল এবং এই বাণিজ্যের প্রভাবেই পৃথিবীর সর্ব্বাংশে আজি ইংরাজ-পতাকা উড্ডীয়মান হইতেছে। আবার দেখ পরিশ্রমের অভাবে আমরা ভারতবর্ষীয়েরা কিরূপ হীনাবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছি। আমরা অলসভাবে থাকিয়া ধন, মান প্রভৃতি সমস্তই হারাইয়াছি এবং এই অলসতা ও ঔচ্ছল্যবশতই আমরা সকল সভ্য জাতির পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছি। ভারতবর্ষের বাণিজ্য ও কারুকর্ম্ম প্রায় সমস্তই বিদেশীয়দের হস্তগত, এবং বিদেশীয়েরা ক্রমাগত ভারতের অন্তঃশোণিত চুষিয়া খাইতেছে দেখিয়াও আমাদের মনে আনশঙ্কার হয় না। আমরা এতদূর জড়াবস্থায় রহিয়াছি !!

ইংরাজেরা অল্প অল্প করিয়া কারুকর্ম্মে কেমন উন্নত হইয়াছে জানিলে অতিশয় আশ্চর্য্য হইতে হয়। যখন ফ্রান্স, স্পেন, হলাণ্ড, বেল্‌জিয়ম প্রভৃতি ইউরোপের অন্যান্য দেশে পশমের মোজা, দস্তানা ইত্যাদির কারখানা খোলা হইয়াছিল ও ক্রমে ঐ কারুকর্ম্মের উন্নতি হইতেছিল, সেই সময়ে এবং তাহার অনেক বৎসর পরেও ইংলণ্ডে কেবল কৃষি ভিন্ন অন্য

কোন জীবিকার উপায় ছিল না। তখন ইংরাজেরা দেশজ দ্রব্য সকল বিনিময় করিয়া বিদেশীয়দের নিকট হইতে পশমের কাপড় কিনিত কিম্বা পশম কিনিয়া হাতে অতি অল্প কাপড় প্রস্তুত করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিত। পরে খৃষ্টধর্ম্মের প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইলে পশ্চিম ইউরোপের অনেক পরিশ্রমী অধিবাসী ধর্ম্মপরিবর্ত্তন বশতঃ উৎপীড়িত হইয়া তাহাদের স্বদেশ ছাড়িয়া পলাইতে বাধ্য হইয়াছিল। ইংলণ্ডে আশ্রয় পাওয়াতে তাহারা অতি আহ্লাদ সহকারে নিজেদের কারখানা সকল এদেশে স্থাপিত করিয়াছিল এবং আতিথ্যের পরিশোধ দিবার জন্য ইংরাজদিগকে ঐ সমস্ত নূতন বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়াছিল। ইংরাজ-কারুকর্ম্মের এই প্রথম সূত্র-পাত। ক্রমে ধূমকলের আবিষ্কার হয়, তাহার সাহায্যে এবং পরিশ্রম ও কার্য্যক্ষমতার প্রভাবে ব্রিটিস কারুকর্ম্ম আজকাল অদ্বিতীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এদেশের শিল্পকর্ম্মের মধ্যে তুলার কারখানাই প্রধান। ভারতবর্ষ ও আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে কার্পাসের আমদানী হয় এবং ইংরাজেরা সেই তুলাতে কাপড় প্রস্তুত করিয়া নানা-দেশে পাঠায়। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের শেষে গ্রেট ব্রিটেন ও আয়র্লণ্ডে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় দুই হাজার সাত শত তুলার কারখানা ছিল এবং তাহাতে প্রায় চারি লক্ষ আশি হাজার লোক নিযুক্ত ছিল। তাহাদের মধ্যে প্রায় এক লক্ষ আটাশি হাজার পুরুষ আর অবশিষ্ট স্ত্রীলোক। মাঞ্চেষ্টর এই কার্পাসের কারখানার প্রধান আড্ডা। তুলার কারখানার পর ঊর্ণাবস্ত্র ও পশমী দ্রব্যের কারখানা প্রধান। পূর্ব্বোক্ত বৎসরের শেষে এদেশে

আঠার শত পশমের এবং প্রায় সাত শত উর্ণাবস্ত্রের কারখানা ছিল আর এই সমুদায়ে প্রায় দুই লক্ষ আশি হাজার লোক খাটিত। তুলা সমস্তই বিদেশ হইতে আইসে, কিন্তু অধিকাংশ কাঁচা পশম ইংলণ্ডেই পাওয়া যায়। ইংলণ্ডের উত্তরে লিড্‌স নগর এই পশমী কারখানার প্রধান স্থান। পরিধেয় ও আবশ্যক বস্ত্রের মধ্যে রেশমী কাপড়, পাটের জিনিস, মোজা, লেস প্রভৃতি অন্যান্য অনেক দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

এদেশের বড় বড় কারখানার কর্ত্তারা এক একটি সম্রাটের ন্যায়। রাজাদের মত ইহাদেরও রাশীকৃত ধন, নানা প্রকার কল্পনা, বৃহৎ কর্ম্মভার, বিপদাশঙ্কা, গৌরব ও অভিমান দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারাও ভূমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে দূত ও প্রতিনিধি পাঠাইয়া থাকে; নিকটস্থ ও দূরস্থিত দেশের অধিবাসীদের অবস্থা ও অভাব প্রভৃতি সম্বন্ধে অহরহঃ সমস্ত সংবাদ রাখে; বহুসংখ্যক শ্রমজীবী লোকদের উপর কর্ত্তৃত্ব করে ও তাহাদের সুখদুঃখ পর্য্যালোচনা করে, ইচ্ছা হইলে রাশি রাশি লোকের উপকার করিতে পারে; সংক্ষেপে ইহারা মানবপরিশ্রমের অধিপতিস্বরূপ। ইহাদের কারবারের আয়ব্যয় সম্বন্ধে সচরাচর এক কোটি, দুই কোটি টাকার কথা শুনা যায় এবং এক একটা গুদাম ঘরের স্তূপাকার দ্রব্য দেখিলে স্বপ্নবৎ বলিয়া বোধ হয়। ভারতবর্ষ, চীন, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, মিসর, দক্ষিণ আমেরিকা—পৃথিবীর এমন কোন স্থান নাই যেখানে ইহাদের দালাল বা প্রতিনিধি দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহারা, প্রত্যেক দেশের লোকেরা কি প্রকার দ্রব্য ব্যবহার করে ও কি রকম জিনিস চাহে, তাহার খবর লইয়া

ইংলণ্ডে লিখিয়া পাঠায় আর এখানে ইহারা কলে সেই সমস্ত বস্তু প্রস্তুত করিয়া সেই সেই দেশে রপ্তানী করে। ভারতবর্ষে আমরা সর্ব্বদাই নূতন নূতন বিলাতী সামগ্রী দেখিতে পাই এবং সেখানে এখন দেশীয় কাপড় উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। ইহার কারণ, চতুর ইংরাজেরা সেদেশের ব্যবহৃত দ্রব্য সকলের নমুনা আনাইয়া এখানে অবিকল সেইগুলি প্রস্তুত করিয়া ভারতবর্ষে পাঠায়। যদিও এই সকল কলের দ্বারা নির্ম্মিত দ্রব্য আমাদের দেশের হাতের তৈয়েরি কাপড়, শাল ও অন্যান্য শিল্পজাত সামগ্রীকে পরাস্ত করিতে পারে নাই, তথাপি ইহারা কলে ঐগুলি এত শস্তায় প্রস্তুত করে যে দরিদ্র ভারতবাসীরা ক্রমে ক্রমে দেশীয় বস্ত্র ছাড়িয়া একেবারে বিলাতী কাপড় ধরিয়াছে।

ইংরাজদের কারবারের কথা শুনিলে যথার্থই বাক্‌শূন্য হইয়া যাইতে হয়। ঊর্ণাবস্ত্রের গুদামঘরগুলি এক একটি পাহাড়ের মত। লিড্‌স নগরে একটি গুদামঘর আছে, তাহার সম্মুখভাগ প্রায় চারি শত হাত লম্বা এবং এত উচ্চ যে পশমের গাঁটুরিগুলা বাষ্পীয় যন্ত্র দ্বারা তুলিয়া রাখিতে ও নামাইতে হয়। মাঞ্চেষ্টরে একটি তুলার কারখানায় তিন লক্ষ মাকু ব্যবহৃত হয়। লিখিত আছে যে কেবল মাঞ্চেষ্টরে সূতা কাটা ও কাপড় বোনা হইতে মাসে বার কোটি টাকা লাভ হয়; কেবল এক কোম্পানী মাসে দুই লক্ষ টাকা লাভ করে এবং পাঁচ হাজার লোক খাটায়! এই সকল কারবারের মূলধন অসীম, সমস্ত বন্দোবস্ত অতি চমৎকার এবং কলবল অতি উৎকৃষ্ট; আর কর্ম্মচারীরা অত্যন্ত পরিশ্রমী ও নিপুণ।

কারখানার কলের যত মজুর, সর্দ্দার, কেরাণী প্রভৃতি সমস্ত লোক অতিশয় অটলভাবে ও নিয়মিতরূপে কাজ করে।

পূর্ব্বেই এদেশে লোহা ও পাথুরিয়া কয়লার প্রভাবের কথা লিখিয়াছি। বোধ হয় এই দুইটি খনিজ দ্রব্য না থাকিলে ইংলণ্ড এখন যেরূপ সম্পত্তিশালী তাহার শতাংশের একাংশ হইতে পারিত না. যেহেতু সমস্ত কলবল এই লোহা ও কয়লার উপর সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করিতেছে। এদেশে সর্ব্বশুদ্ধ চৌদ্দটি পাথুরিয়া কয়লার মাঠ আছে, তাহার মধ্যে ইংলণ্ডের উত্তর প্রান্তের মাঠগুলি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এক একটি মাঠ প্রায় দশ বার ক্রোশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং খনিতে পূর্ণ, আর খনিগুলি অতি গভীর। পাথুরিয়া কয়লা তুলিবার জন্য সর্ব্বশুদ্ধ চারি শত ত্রিশটা ভিন্ন ভিন্ন গর্ত্ত আছে এবং ইহাতে যে কত লোক নিযুক্ত আছে তাহার ঠিকানা নাই। লোহা ভিন্ন টিন, তামা প্রভৃতি ধাতুও ইংলণ্ডে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। মাঞ্চেষ্টরের তুলার কারখানার মত বর্মিংহাম বড় বড় লোহা ও পিতলের কারখানায় পরিপূর্ণ। লোহার সমস্ত জিনিস এখানে অতি উত্তমরূপে প্রস্তুত হয় আর বিলাতী পেরেক কব্জা ইত্যাদি আবশ্যক দ্রব্য পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বস্থানেই পাওয়া যায়। লোহার কারবারে যে কত লক্ষপতি লোক ব্যাপৃত আছেন, তাহার সংখ্যা নাই; এক এক জন লোহার দ্রব্যের ব্যবসায়ী আমাদের দেশের রাজাদের অপেক্ষাও ধনী। এখনকার ইংলণ্ডের একজন রাজমন্ত্রী সামান্য স্ক্রুর কারবারে অতিশয় ধনবান হইয়াছেন এবং এই স্ক্রুর প্রভাবেই তিনি এত প্রভাবশালী। বোধ হয়

বিলাতী ছুরী কাঁচির উপর অনেকেই শেফিল্‌ডের নাম পড়িয়া থাকিবেন; ঐ নগর সকল প্রকার ধারাল জিনিসের কারখানার স্থান বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। উল্লিখিত দ্রব্যসমূহ ভিন্ন কল, জাহাজ, আসবাব, কাঁচের বাসন প্রভৃতি কত প্রকার সামগ্রী যে ইংলণ্ডে প্রস্তুত হয়, তাহার বিষয় সবিশেষ লিখিতে হইলে তিন চারি খানা বড় বড় পুস্তক রচনা করিতে হয়।

কারুকর্ম্মের ন্যায় বাণিজ্য ইংরাজ জাতির অর্থোপার্জ্জনের অপর একটি প্রধান উপায়। বাণিজ্যে ইংরাজেরা অদ্বিতীয়; পৃথিবীতে এখন কোন বন্দর নাই যেখানে ব্রিটিস জাহাজ ভাসিতেছে না। লণ্ডনের "ডক" অর্থাৎ জাহাজের আড্‌ডাগুলির নিকট দাঁড়াইয়া দেখিলে মনে হয়, যেন সমস্ত পৃথিবী হইতে ধন ভাসিয়া ইংলণ্ডের পদতলে আসিতেছে। লণ্ডনে ঐ প্রকার ছয়টি ডক আছে; সকলগুলিই অতিশয় বৃহৎ এবং দেখিবামাত্র প্রকাণ্ড অর্থ-ভাণ্ডার বলিয়া প্রতীয়মান হয়। প্রত্যেক ডকই এক একটি প্রশস্ত বন্দরের ন্যায় এবং প্রায় সকল সময়েই উহা বহুসংখ্যক জাহাজে পরিপূর্ণ থাকে। পাশে দাঁড়াইয়া দেখ, সকল দিকেই নৌকা ভাসিতেছে আর জাহাজের পর জাহাজ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে; সেগুলি জলের ভিতর হইতে মাথা তুলিয়া সকলকে যেন ইংরাজদের পরিশ্রম-ক্ষমতা ও বাণিজ্য-প্রভাবের পরিচয় দিতেছে। কোনটা অষ্ট্রেলিয়া হইতে আসিয়াছে—ভিতরে প্রায় আশি হাজার মণ মাল; কোনটা বা ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছে, কোনটা বা আফ্রিকা কিম্বা আমেরিকা হইতে নানাপ্রকার জিনিস আনিয়াছে; কোনটিতেই নব্বই হাজার মণের কম

মাল নাই। এখানে পৃথিবীর চারি দিক্ হইতে প্রত্যাবৃত্ত বাণিজ্যতরীসকল দেখিয়া কোন্ ব্যক্তি না ইংরাজদের পরিশ্রমের কথা ভাবিয়া বিস্ময়াপন্ন হয়? লিখিত আছে, প্রতি বৎসর গড়ে চল্লিশ হাজার জাহাজ এই ডকগুলিতে আইসে এবং এককালে পাঁচ ছয় হাজার জাহাজ কেবল লণ্ডনের ডকে বা টেম্‌স নদীর উপর থাকে। এই সমস্ত জাহাজ নানা দেশ হইতে যে কত অর্থ চুষিয়া আনিতেছে তাহা মনে হইলে শরীর লোমাঞ্চিত হয়।

লণ্ডন ও লিবরপুল ইংলণ্ডের বহির্বাণিজ্যের প্রধান স্থান। এখানে যে সলক দ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানী হয়, তাহাদের মধ্যে শস্য, ময়দা, তুলা, পশম, চিনি, চা, কাফি, কাঠ ইত্যাদি প্রধান; এবং যে সকল দ্রব্য ইংলণ্ড হইতে নানাদেশে রপ্তানী করা হয়, তাহাদের মধ্যে তুলা ও পশমের কাপড়, সূতা, লোহা ও ইস্পাতের দ্রব্য, কয়লা ও নানাপ্রকার অস্ত্র ও যন্ত্র প্রধান। এই সকল দ্রব্য আনিবার ও লইয়া যাইবার নিমিত্ত সর্ব্বশুদ্ধ কুড়ি হাজার পালতোলা জাহাজ আছে এবং তাহাতে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার লোক কর্ম্ম করে। প্রায় তিন হাজার কলের জাহাজ আছে এবং তাহাতে প্রায় আটষট্টি হাজার লোক নিযুক্ত থাকে। এই সকল ভিন্ন ইংরাজদের বহুসংখ্যক রণতরী আছে এবং সেগুলিতে রাশি রাশি লোক কাজ করে।

বোধ হয় এই সমুদায় পড়িয়া পাঠক পাঠিকারা এদেশে এত ধনিলোকের সদ্ভাব ও তাহাদের প্রচুর অর্থের কারণ এখন বুঝিতে পারিয়াছেন। এদেশে এক এক জন ব্যবসায়ী যত অর্থ উপার্জ্জন করেন, ভারতবর্ষের অনেক ধনিলোকের আয়

একত্রিত করিলে তাহার সমান হয় কি না সন্দেহ। আবার ইংরাজদের টাকায় অন্যান্য কত দেশে কারখানা, কুঠী ইত্যাদি স্থাপিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত রেলওয়ে-কোম্পানীর মূলধন ইংরাজদের; রুসিয়া, তুরস্ক, আফ্রিকা, কানেডা, ব্রেজিল প্রভৃতি নানাদেশে ইংরাজদের টাকা খাটি-তেছে। সমস্ত লণ্ডনে অনূন দুই শত ব্যাঙ্ক আছে এবং এদেশের প্রায় সকল নগরেই অন্ততঃ দুই তিনটি করিয়া ব্যাঙ্ক দেখিতে পাওয়া যায়। এই ব্যাঙ্কগুলি টাকার ভাণ্ডার; এই-খানে পৃথিবীর চারিদিক হইতে রাশি রাশি অর্থ আসিয়া সঞ্চিত হয় এবং এখান হইতেই আবার পৃথিবীর চারিদিকে অনেক অনেক টাকা গিয়া থাকে। এদেশে কি জমীদার, কি ব্যবসায়ী কি দোকানদার, কি ডাক্তার, কি ব্যারিষ্টার, কি গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী—সকলেই নিজেদের উপার্জ্জিত অর্থ ব্যাঙ্কে জমা রাখে। এই টাকা হইতেই আবার সমস্ত কারবার, ব্যবসায়, কারুকর্ম্ম, কোম্পানী ইত্যাদি চলিয়া থাকে। এদেশে কখন টাকা মিথ্যা পড়িয়া থাকে না; 'জলে যে জল বাঁধে' তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ ইংলণ্ডেই দেখিতে পাওয়া যায়।

এখানে যে কত বড়মানুষ আছে, তাহা দুই একটা প্রধান নগরের রাস্তায় বেড়াইলে জানিতে পারা যায়। লণ্ডনের কোন কোন দিকে একটা গাড়ী করিয়া দুই তিন ক্রোশ বেড়াইলে দেখিতে পাই যে দুই ধারে ক্রমাগত বহুসংখ্যক বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকার মধ্য দিয়া যাইতেছি; গৃহগুলি শির উচ্চ করিয়া গর্ব্বিতভাবে দাঁড়াইয়া তাহাদের অধিকারীদের আয়ের পরিচয় দিতেছে। এই সকল গৃহস্বামীদের মধ্যে

কেহ মাসে দুই তিন হাজার টাকার কম উপার্জ্জন করেন না। প্রতি বাড়ীতেই আস্তাবল, গাড়ী ঘোড়া, সইস, কোচম্যান, ও দাসদাসী আছে; সকল বাড়ীগুলিই অতি মূল্যমান আসবাব ও দ্রব্যে পরিপূর্ণ। এখানকার ডাক্তার, ব্যারিষ্টার প্রভৃতি ব্যক্তিরা অন্যান্য দেশের অপেক্ষা অধিক উপার্জ্জন করেন। আমাদের দেশের একজন সামান্য ডাক্তারকে দুই বা চার টাকা দিয়া বাড়ী আনা যায়, এখানে সেই রকম একজন ডাক্তারের দর্শনী বার টাকার কম নয়। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রি-জের এক একজন প্রধান অধ্যাপক মাসে দুই তিন হাজার টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। শুনিয়াছি রাজকবি টেনিসন্ রাজভাণ্ডার হইতে অতি অল্পই বেতন পান, কিন্তু ইনি কেবল কবিতা লিখিয়া কখন কখন মাসে পাঁচ হাজার টাকা উপার্জ্জন করেন। টাইম্‌স নামক সর্ব্বপ্রসিদ্ধ ইংরাজী সংবাদপত্রের অধিকারী এক একটি উৎকৃষ্ট রচনার জন্য উহার লেথককে এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত দিয়া থাকেন। আমাদের দেশে যে কেরাণী মাসে ত্রিশ টাকা মাহিনা পায়, এখানে একজন সেই রকম কেরাণী মাসে অন্ততঃ দেড় শত টাকা বেতন পায়। এদেশে আবার লোকের যেমন আয়, ব্যয়ও তদনুরূপ; সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, এখানকার অতি ধনী হইতে অতি দরিদ্র পর্য্যন্ত সকলেরই নিয়ম এই যে, যার যত আয় তাহাকে তত ব্যয় করিতেই হইবে। এই সমুদায় অর্থের বিষয় পড়িয়া পাঠক পাঠিকারা মনে করিবেন না যে এদেশে সবই সোনা; মনে থাকে যেন সকল দ্রব্যেরই উল্টা ও সোজা দুই দিক আছে।

ইংলণ্ডে ছোট বড় বহুসংখ্যক কারুগৃহ, কর্ম্মশালা ইত্যাদি পরিশ্রম-স্থান রাশি রাশি লোককে আহার দিয়া থাকে; পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখানকার নিয়ম অতি চমৎকার; শ্রমজীবীরা অতিশয় পরিশ্রমী ও বিশ্বাসী এবং তাহারা নমুনা দেখিয়া সুচতুররূপে সকল জিনিসের উত্তম নকল প্রস্তুত করে। একটা লোহার কারখানাতে ভাল ও চতুর কর্ম্মচারীরা মাসে প্রায় আশি, নব্বই টাকা উপার্জ্জন করে; ছোট ছোট মজুরেরা পর্য্যন্ত মাসে চল্লিশ টাকা করিয়া মাহিনা পায়। স্ত্রীলোক ও বালক বালিকারা মাসে প্রায় পঁচিশ টাকা করিয়া রোজগার করে। লাংকেশিয়রে তুলার কারখানাতে এক একজন যুবক মজুরের মাসে পঞ্চাশ টাকা আয়। এদেশের সকল শ্রমজীবীরাই ভারতবর্ষীয় কেরাণীদের মত বা তাহাদের অপেক্ষা অধিক মাহিনা পায়। এমন কি এদেশে যাহারা মেতুয়া ইত্যাদির কর্ম্ম করে তাহারাও মাসে প্রায় পনর, ষোল টাকার কম রোজগার করে না।

ঐরূপ অধিক উপার্জ্জন করিলেও এখানকার দরিদ্র লোকদের মধ্যে টাকা পয়সা বা জিনিসের সচ্ছলতা দেখা যায় না। তাহার কারণ কেবল অমিতব্যয়িতা। একে ইহারা ব্যয়শীল, তাহাতে এদেশে অধিকাংশ দ্রব্য দুর্ম্মূল্য, সেজন্য সংসারের ব্যয় অতিশয় অধিক। আমাদের দেশের যে প্রকার লোকে মাসে আট টাকা পাইয়া সুখস্বচ্ছন্দে সংসার নির্ব্বাহ করে, এখানে সেই প্রকার লোক মাসে পঁচিশ টাকা পাইয়াও অতি কষ্টে জীবন কাটায়। কয়লা, আলো, মদ, ও মাংসে এদেশে অনেক খরচ পড়ে, এবং গরিব লোকেরা পর্য্যন্ত মদ ও মাংস

ভিন্ন কেবল উদ্ভিজ্জ খাইয়া জীবন ধারণ করিতে পারে না, সুতরাং ইহারা অত টাকাতেও যে কুলাইতে পারিবে না তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি। ইহা ভিন্ন ইংলণ্ডে বাল্যবিবাহের রীতি না থাকিলেও শ্রমজীবীদের সন্তানের অভাব নাই। প্রত্যেকেরই গৃহে গড়ে চার পাঁচটি সন্তান দেখিতে পাওয়া যায়, এই শীতল ও পরিবর্ত্তনশীল জলবায়ুর দেশে সকলের আহার ও পোষাক যোগাইতে দরিদ্র শ্রমজীবীদের প্রাণ বহির্গত হয়।

এই মজুরদের অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য এখানে এখন নানা প্রকার উপায় অবলম্বিত হইতেছে। ইহারাও রাজনীতি বিষয়ে শিক্ষা পায় এবং শিখিতে উৎসাহ দেখায়। অনেক স্থানে এই অল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিত শ্রমক্লান্ত লোকেরা একত্র হইয়া সমাজ করিয়া থাকে এবং রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে পরস্পর তর্ক করে ও সমস্ত রাজ্যের খবর রাখে। ইহাদের জন্য সর্ব্বসাধারণের যত্নে কতকগুলি পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে, সেখানে ইহারা বিনাব্যয়ে অনেক রকম পুস্তক ও সংবাদপত্র পড়িতে পায়। অতি অল্প পয়সায় বিদ্যা-শিক্ষার জন্য এখানে অনেক স্থান আছে, সেখানে শ্রমজীবীরা সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার সময় গিয়া বিবিধ বিদ্যা শিক্ষা করে। কেবল বিদ্যা নয়, গান, বাজনা, ছবি আঁকা, পশম বোনা, সেলাই, পোষাক প্রস্তুত করা ইত্যাদি অনেক শিল্পকর্ম্মে শ্রমজীবী স্ত্রীলোক ও পুরুষ সমভাবে শিক্ষা পাইয়া থাকে।

---

# বিংশ অধ্যায়।

## শেষ কথা।

এদেশে কত নূতন দ্রব্য দেখিলাম, কত নূতন বিষয় জানিলাম, কত নূতন জ্ঞান উপার্জ্জন করিলাম, কিন্তু যতই অধিক দেখিতেছি, যতই অধিক জানিতেছি, যতই অধিকদিন এখানে রহিতেছি ততই আমাদের ভারতের কথা মনে পড়িয়া আমার হৃদয় অধিকতর দহিতেছে। এদেশ আর সে দেশ যতই মিলাইয়া দেখিতেছি ততই দুইটি দেশের মধ্যে অসীম প্রভেদ বুঝিতে পারিতেছি ও ভারতের হীনাবস্থা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইয়া মনঃকষ্টে পীড়িত হইতেছি। কখন বা একেবারে হতাশ হইয়া পড়িতেছি, মনে হয় যে, ভারতের দুঃখমোচন আর কদাপিও হইবে না; আবার কখন বা কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হয়; বোধ করি, আমার মনে যেরূপ ভাবের উদয় হইতেছে তাহা স্বদেশীয় অনেক ব্যক্তিরও মনে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, আমার ন্যায় অনেকে দেশের দুরবস্থা দেখিয়া অন্তর্দাহে পুড়িতেছেন, অতএব তাঁহারা স্বদেশ ও বিদেশের ভাল মন্দ স্পষ্টরূপে জানিয়া কোন দিন দেশের হিতসাধনে অগ্রসর হইবেন।

ইংলণ্ডের বিদ্যা; বাণিজ্য, পরিশ্রম ও স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে যাহা লিখিয়াছি তাহা পড়িলেই প্রত্যেক ভারতবাসী জানিতে পারিবেন, ইংলণ্ড ভারত হইতে কত উন্নত। সেই প্রকার আবার এদেশীয় সমাজ, গার্হস্থ্য-জীবন, প্রতি ব্যক্তির স্বাধীনতাপ্রিয়তা, দেশানুরাগ, আত্মসম্মান ইত্যাদি পড়িয়া তাঁহারা

দেখিবেন, ইংরাজ জীবন ভারতীয় জীবন হইতে কত প্রভিন্ন। আমরা আর্য্যাবর্ত্তবাসী হিন্দুদের সন্তানসন্ততি—যাঁহারা অতি আদিমকালে গ্রীকদের পূর্ব্বেও সভ্যতা, ধর্ম্ম ও শিক্ষার জন্য বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছিলেন; যাঁহারা পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয় ধার্ম্মিক, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন, এমন কি যখন পৃথিবীর সমস্ত সভ্যজাতির মধ্যে ক্রীতদাসের প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল, তখন কেবল হিন্দুরাই দাস ক্রয় করত মনুষ্যকে চিরজীবনের মত বদ্ধ করিয়া রাখাকে ঘৃণাসূচক রীতি ভাবিয়া তাহা হইতে বিরত ছিলেন; যাঁহাদের বীর-কীর্ত্তি ও গৌরব পৃথিবীর দিক্‌দিগন্তে ঘোষিত হইয়াছিল; যাঁহাদের প্রাচীন অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্র দেখিয়াই অন্যান্য সভ্য জাতিরা এখন নূতন নূতন বিষয়ের কল্পনা ও আবিষ্কার করিয়া খ্যাতি লাভ করিতেছে—আমরা সেই হিন্দুদের সন্ততি, তবে আজ আমাদের এদশা কেন? আজ আমরা তেজ, বল, ধন, মান, স্বাধীনতা ও সমুদায় সুখ হারাইয়া নিজ দেশে হীনবেশে ভ্রমিতেছি কেন? আজ আমরা হিন্দুদের কীর্ত্তিস্তম্ভ কাশী, প্রয়াগ ও মথুরা ইত্যাদি নগর ভুলিয়া কলিকাতাকে অধিক মান্য করি কেন? কেন ইহা সকলেই জানেন, তথাপি কেহ ইহার উত্তর দিতে ইচ্ছুক নহেন অথবা উত্তর শুনিতে চাহেন না, অথচ নিজের দোষে আমাদের যে এপ্রকার অবস্থা ঘটিয়াছে তাহা কেহ অস্বীকার করিবেন না। এই ইংরাজদের দুই হাত, দুই পা ও সমস্ত শরীরের গঠন কোন অংশেই ভারতবাসীদের অপেক্ষা বিভিন্ন বা উৎকৃষ্ট নহে, তবে আজ আমরা ইহাদের অধীন, ইহা আমাদের দোষ নয় ত কি?

যে হিন্দুরমণীরা স্বামীদের রণভূমিতে যাইতে উত্তেজনা করিয়া ধর্ম্মরক্ষার জন্য অগ্নিকুণ্ডে আত্মপ্রাণ বিনষ্ট করিতে কুণ্ঠিত বা কম্পিত হইতেন না, যাঁহাদের বীরদর্প এক সময়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হইত, যাঁহারা ধর্ম্ম, সতীত্ব ও বীরত্বের আদর্শস্বরূপ ছিলেন,আজ আমরা তাঁহাদের তনয়া হইয়া পরাধীনভাবে পদদলিত হইতেছি, ইহা ভারতসন্তানের দোষ না বলিয়া আর কাহার দোষ বলিব? আজ ভারতমহিলাদের ধর্ম্ম ও বীরত্বের গৌরব কোথায়? আজ "আমাদের অলঙ্কার বেচিয়া সৈন্যদের আহার সংগ্রহ কর" বলিয়া মিথ্যা গহনায় জলাঞ্জলি দেওয়া কোথায়? আজ ভারততনয়দিগকে কাপুরুষের ন্যায় অলসভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাঁহাদের মনে অগ্নি প্রজ্বলিত করাইবার নিমিত্ত আমাদের উত্তেজনা কোথায়? এখন আমাদের কিছুই নাই, নিজ দোষে সমস্ত হারাইয়াছি। কালসর্পের ন্যায় অনৈক্য আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। ঐ অনৈক্যের জন্যই ভারতবর্ষ এত ছিন্ন ভিন্ন হইয়া মুসলমানের পর এখন ইংরাজদের কবলে পতিত হইয়াছে, আবার একতার জন্যই এই অতি ক্ষুদ্র দ্বীপবাসী লোকেরা বৃহদাকার হিন্দুস্থানকে পরাজয় করিয়া উহার উপর আধিপত্য বিস্তারিয়া স্বচ্ছন্দে রাজ্য করিতেছে। এই অনৈক্যবশতই আমরা এখন একেবারে নির্ধন ও নির্বীর্য্য হইয়া পড়িতেছি এবং পরাধীন থাকায় সভ্য হইয়াও অসভ্য বলিয়া পরিগণিত হইতেছি। পুত্তিকা নামক ক্ষুদ্রকায় কীটেরা একসঙ্গে মিলিত হইয়া বৃহৎ বৃহৎ বল্মীক নির্ম্মাণ করে এবং মানুষে ঐ বল্মীকের উপর কোন উপদ্রব করিলে, উহারা দলে দলে আসিয়া,

নিজেদের অপেক্ষা এত বৃহৎকায় মানুষ দেখিয়া ভীত না হইয়া তাহাদের অত্যাচারের প্রতিশোধ দিতে অগ্রসর হয়। কিন্তু আমরা একপ্রকার শরীরবিশিষ্ট মানুষ হইয়াও একতা বিরহে প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখে পদক্ষেপ করিতে সঙ্কুচিত হই।

এক সময়ে হিন্দুরা পৃথিবীর সমস্ত জাতিদের নিকট সভ্যতা ও জ্ঞানের আকর বলিয়া পূজিত হইত, কিন্তু এখন স্বাধীন জাতিরা পরাধীন ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগকে অসভ্য, নিস্তেজ ও কাপুরুষ বলিয়া অতিশয় অবজ্ঞা করিয়া থাকে। আমরা রক্তমাংসের দ্বারা নির্ম্মিত মানুষ হইয়াও অকাতরে ঐ অব-মাননা সহ্য করি বা উহাতে ভ্রুক্ষেপও করি না, ইহা কি আমাদের দোষ নয়? বিশেষ সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালীরা সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ও বিদ্বান্ হইলেও তাঁহারা অতিশয় ভীরু ও নির্বীর্য্য, তাঁহাদের এ প্রকার বুদ্ধি ও শিক্ষার আবশ্যক কি? ভারতের অন্য কোন অংশের লোকেরা বাঙ্গালীদের সদৃশ বিদেশীয়দের পদতলে দলিত বা শ্বেতাঙ্গীদের মুখদর্শনে কম্পিত হয় না।

ইহাঁরাই আবার স্ত্রীলোকদের প্রতি অতি কঠোর আচরণ করিয়া থাকেন। শিক্ষিত বঙ্গযুবকেরা উপাধিগ্রহণে ব্যস্ত ও নিজ নিজ সুখ অন্বেষণে রত; পিঞ্জরাবদ্ধা বঙ্গবাসিনীদের নিঃশব্দ অশ্রুপাত তাঁহাদের চক্ষু আকর্ষিতে অক্ষম। আজ যদি আমরা, যেমন ইংরাজ মহিলারা পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য মনো-নীত করিবার ক্ষমতা পাইবার জন্য অতিশয় চেষ্টা ও গোল-যোগ করিতেছে, সেইরূপ স্ত্রীস্বাধীনতার জন্য প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ে আঘাত করিতে পারিতাম; আজ যদি

আমরা স্ত্রীলোকের অবলা ও নম্র নাম বিসর্জ্জন দিয়া, অন্তরের বেগ গোপনে না রাখিয়া, তাঁহাদের সম্মুখে চীৎকারস্বরে কোলাহল করিতাম; তাহা হইলে হয় ত বঙ্গবাসীদের কর্ণ আমাদের যন্ত্রণারবে আকৃষ্ট হইত। কিন্তু আমরা বহুদিন পরাধীনা থাকিয়া স্বাধীন জীবনের সমস্ত তেজ ও শক্তি হারাইয়াছি, সেই জন্যই আমরা এখন ইংরাজমহিলাদের ন্যায় সকল বিষয়ে পুরুষের সমকক্ষ হইবার জন্য প্রাণপণ শক্তিতে চেষ্টা করিতে অপারগ।

এদেশে এত প্রকার আমোদজনক দৃশ্য আছে, কিন্তু আমি সর্ব্বাপেক্ষা স্ত্রীলোক ও পুরুষের সভা, স্ত্রীলোক ও পুরুষের এক সঙ্গে খেলা, প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রীলোকদের শ্রেণীবদ্ধ হইয়া স্কুলে যাওয়া—এই সকল দেখিতে অধিক ভালবাসি। সকলেই কেমন ভাইভগিনীর ন্যায় একত্রে বেড়াইতেছে, খেলিতেছে, হাসিতেছে, ইহা দেখিলে কোন্ ভারতরমণীর মন আহ্লাদে না পরিপ্লুত হয়? আবার ইহাদের সুখ দেখিয়া আমাদের দুঃখ ভুলিবার পরিবর্ত্তে উহা দ্বিগুণতর হইয়া উঠে। এখানে চারিদিকে ইংরাজমহিলাদের মুখে যত স্বাধীনতার ছবি নিরীক্ষণ করি, তত সেই অধীনতাপীড়িত ভারত-ললনাদের বিনম্র বদনের মলিন কান্তি ধীরে ধীরে আমার অন্তরে জাগরূক হয়।

অনেক জাতির বল থাকে না, বুদ্ধি ও একতা থাকে না, কিন্তু দৃঢ় স্বদেশানুরাগের প্রভাবে তাহারা নিজেদের হীনাবস্থা হইতে উদ্ধারসাধন করিয়াছে। কিন্তু স্বদেশপ্রিয়তা কাহাকে বলে, আমরা তাহা জানি না। দেশের দুরবস্থা দেখিয়াও অক্ষুন্নভাবে দিনযাপন করি এবং স্বদেশের প্রতি অত্যাচার দেখিয়াও

আমরা চঞ্চল হইয়া নিজ নিজ বিলাস পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হই না। সকলেই পশুর ন্যায় আত্মসুখে রত, ভারতের হিতাহিতে একেবারে জ্ঞানশূন্য; কিসে দেশের উন্নতি হয় বা কিসে দেশের অপকার হয় তাহা আমরা কখন একাগ্রচিত্তে পর্য্যালোচনা করি না।

উপসংহারকালে বক্তব্য এই যে, এখন পুরাকালের কথা লইয়া মিথ্যা বাগাড়ম্বর করার অপেক্ষা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের বিষয় চিন্তা করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। পুরাকালের ইতিবৃত্ত হৃদয়ঙ্গম করিয়া বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে সতর্কভাবে চলা যথার্থ জ্ঞানীর কর্ম্ম। স্বদেশ ও বিদেশ একত্র মিলাইয়া আমাদের যথার্থ বর্ত্তমান অবস্থা বুঝিতে পারি; কি উপায়ে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা উন্নত হইতে পারে, এবং ভবিষ্যতেই বা কিসে ভাল হইবে তাহাই আমাদের নিরন্তর বিবেচনা ও অবলম্বন করা উচিত। সমস্ত সভ্য ও সমৃদ্ধিশালী জাতির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাহাদের মধ্যে ক্রমাগত পরিবর্ত্তন হইয়াছে; তাহারা অল্প অল্প করিয়া কত বদলাইয়াছে এবং ক্রমে উন্নত হইয়া অবশেষে কত রূপান্তর ধারণ করিয়াছে। আবার দেখা যায়, যে জাতির মধ্যে কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, বহুকাল প্রায় এক অবস্থাতেই রহিয়াছে তাহার ক্রমে অবনতি ও পতন হইয়াছে। যেমন মানুষ, জন্তু, বৃক্ষ ইত্যাদি পরিবর্ত্তনশীল সেইরূপ সমস্ত জাতিরও পরিবর্ত্তন একটি প্রধান ধর্ম্ম। অতএব আমাদের দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থার নিরাকরণের একমাত্র উপায়—পরিবর্ত্তন ও উন্নতি।

অনেকে "স্বাধীন হইব স্বাধীন হইব," বলিয়া নাচিয়া

বেড়ান এবং লোকদের মনে মিথ্যা উত্তেজনা দিয়া থাকেন; কিন্তু আমাদের প্রথমে বিবেচনা করা উচিত, আমরা স্বাধীনতা পাইবার উপযুক্ত হইয়াছি কি না ও সেই স্বাধীনতা বজায় রাখিতে পারি কি না, আর বিশেষ আমাদের সেই স্বাধীনতা লাভ করিবার শক্তি আছে কি না। কার্য্যসিদ্ধির পূর্ব্বে কার্য্যসিদ্ধির উপায় উদ্ভাবন ও অবলম্বন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরা যে জাতিকে পদচ্যুত করিতে চাহি তাহাদের গুণগুলি আমাদের আছে কিনা, এবং যে বল, বিদ্যা ও কৌশলের প্রভাবে তাহারা আমাদের উপর অধিষ্ঠিত হইয়া রাজত্ব করিতেছে সে সকল আমাদের অন্তর্গত কিনা তাহাই প্রথমে উত্তমরূপে বিবেচনা করা বিধেয়। যদি সে সমুদয় গুণ আমাদের না থাকে, তাহা হইলে মিথ্যা আড়ম্বর না করিয়া, সমস্ত কুসংস্কার ও অনিষ্টকারী পুরাতন রীতির প্রতি আসক্তি ত্যজিয়া, যাহাতে সেই সদ্‌গুণগুলি লাভ করিতে পারি তাহাই আমাদের প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত।

বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সকলই পরিত্যাগ করিয়া এই বিদেশে বাস করিতেছি, অনেক কষ্টে প্রিয় মাতৃভূমিকে বিদায় দিয়া আসিয়াছি; আবার যে সেই প্রিয় আত্মীয়বন্ধু ও সেই প্রিয় জন্মস্থান দেখিতে পাইব তাহার কিছুমাত্রও আশা নাই। বহুদিন হইতে অনেক প্রকার চিন্তা ও ভাবনা দ্বারা আমার মন আলোড়িত হইতেছে এবং সময়ে সময়ে অন্তঃকরণের উদ্বেগ ও যন্ত্রণাকে দমন করিয়া রাখিতে পারি না; বিদেশে আসিবার পর অবধি সেগুলি দ্বিগুণ কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে, এই জন্যই তাহার কিয়দংশ এই পুস্তকে প্রকাশ করিয়া

নিজ মনকে সান্ত্বনা দিতেছি। যদি এই পুস্তকের কোন অংশ স্বদেশীয়দের নিকট কটু বলিয়া বোধ হয়, আশা করি তাঁহারা, যাহার অন্তরে যত অধিক লাগে সে তত অধিক জোরে বলে, এই কথাটি মনে রাখিয়া উহা ক্ষমা করিবেন। অনেকে উত্তম ভাষায় এই প্রকার পুস্তক লিখিতে পারিতেন, ভাল কথায় মনের ভাব প্রকাশিতে পারিতেন, কিন্তু এ বিদেশ-বাসিনী বঙ্গমহিলার যেরূপ মনঃকষ্ট ও অন্তর্দাহ হইতেছে সেরূপ আর কাহারও হইবে না। পাঠকপাঠিকাগণ মন্দ ভাগগুলি ত্যাগ করিয়া ইহাতে যদি কিছু ভাল থাকে তাহাই বাছিয়া লইবেন। এই পুস্তক পাঠে যদি এক ব্যক্তিরও মনে কোন নূতন ভাবের উদয় হয় বা স্বদেশ ও বিদেশের কথা জাগরূক হয়, তাহা হইলে আমার সমস্ত পরিশ্রম সফল বোধ করিব।

---

এইত জননি! স্বাধীন ব্রিটনে
এসেছি, লইয়া কত আশা মনে,
ভেবেছিনু পাব চিরশান্তি ধনে,
কিন্তু মা ভারত! সুখ কোথায়?
শুনি যত হেথা স্বাধীনতা-গান,
দেখি চারিদিকে প্রফুল্লিত প্রাণ,
তত হৃদি মম হয়ে শত খান
তব অশ্রুজলে ভাসিয়া যায়।
এই যে ব্রিটন তব কন্যাসম
অতি ক্ষুদ্রদেশ, কিন্তু পরাক্রম,

বল, বীর্য্য, তেজে কাঁপায় ভূতল ;
ভয়ে সশঙ্কিত মানব সকল
দেখিয়া ইহার সাহসী সুতে।
কিন্তু কেহ নাহি আমাদের ডরে,
দেখি বীর্য্যহীন তাড়ায়ে সুদূরে,
লয় মা ! তোমার ধনরত্ন হরে
পরায়ে শিকল তোমার হাতে।
তাই ভাবি এই তেজোময় প্রাণ,
এ অতুল সুখ উচ্চ ধন মান,
ঘৃণা হয় হায় ! রাখিতে এপ্রাণ
হীন অধীনতা-কলঙ্কময়।
যদি তুমি হতে সুরূপে বঞ্চিত
শুধু বালুময় মরুভূমি মত,
তাহা ছিল ভাল অধীনতা চেয়ে
কি কাজ জীবনে মানহীন হয়ে,
কেবল দুর্ব্বলে পর-লাথি সয়।
কিম্বা ভাল ছিল যদি মা ! সকলে
থাকিতাম অন্ধ ঘোর তমোজালে,
জুলুদের মত অসভ্য হইয়ে
শুধু স্বাধীনতা-রত্ন সাথে লয়ে,
পাইতে হত না এ হেন ক্লেশ।
কি কাজ লভিয়ে বিদ্যা জ্ঞানরাজি,
কি কাজ সভ্যতা, চারু বেশে সাজি
নাহি পাই যদি সে অমূল্য ধন

যে গৌরবে শ্রেষ্ঠ সমগ্র ভুবন,
শুধু হৃদয়ের যাতনা শেষ।
তোমার কেলেশ পাই দেখিবারে
বহুদূর হতে আরো ভাল করে,
কিন্তু তাহে হায়! যাতনা প্রবল
দ্বিগুণ প্রভাবে বাড়িছে কেবল,
এযে মা! অসহ্য বাঙ্গালী-জীবনে।
তাই ভাবি পুনঃ, যদি একেবারে
থাকিতাম ডুবে অজ্ঞান-সাগরে,
তা হলে ত আজ লয়ে ভগ্নমন
কাঁদিতে হত না বসি অনুক্ষণ
থাকিয়া সুদূরে স্বাধীন ব্রিটনে।
এই দেখি হেথা ধন রাশি রাশি,
ব্রিটন মাঝারে, যেন সব ভাসি,
ভারত হইতে পড়েছে আসিয়া,
চিরকাল মত দরিদ্রা করিয়া,
আর কভু তাহা যাবে না ফিরে।
পুন দেখি অই পতাকা অদূরে
রাজবাটী পরে উড়ে গর্ব্বভরে,
ভিতরে অই যে মহারাণী বসে
শাসিছে ব্রিটন, ভারত স্ববশে,
পরি কোহিনুর মুকুট উপরে
কিন্তু কোহিনুর তব মণি হয়ে
কেমনে আসিল ইংলণ্ড-হৃদয়ে,

এই কথা যবে ভাবি মনে মনে
স্মরি সে ঘটনা ইতিহাস সনে,
অমনি হৃদয় উথলে উঠে।
ব্রিটন-ঈশ্বরী উপরে তোমার
করে না ত মাতঃ! কোন অবিচার,
তবু যে সে কথা পারি না ভাবিতে,
রণজিৎ-মণি তাঁহার মাথাতে,
ভাবিলে শিরায় শোণিত ছুটে।
আবার অই যে ব্রিটন-তনয়
পাইয়ে অমূল্য স্বাধীন হৃদয়,
চলে দর্পভরে, যেন মহাবীর
ভীম, দুর্যোধন কিম্বা কর্ণ ধীর,
সদাই মগন গভীর সুখে।
হোথায় অই যে শ্বেতাঙ্গ-মহিলা
বেড়ায় সগর্ব্বে আনন্দে বিহ্বলা,
অধীনতা-বেড়ী তাদের চরণ
স্পর্শিতে পারে না, দেখি অনুক্ষণ
সাহসের জ্যোতি রমণীমুখে।
কিন্তু তবু সেই বিশাল উরসে
খুঁজি যদি উচ্চ হিমালয়পাশে,
কিম্বা বিন্ধ্যগিরি, কুমারী সমীপে,
পাই না দেখিতে হেন বীর্য্য তাপে,
সমগ্র ভারত কালিমাময়।
কাঁদিছে পঞ্জাব একদিকে বসি,

হোথা মহারাষ্ট্র কাঁদে দিবানিশি,
আবার বাঙ্গালা বসিয়া নির্জ্জনে
কাঁদিছে দেখিয়া শিক্ষিত সন্তানে,
ভাবিছে সকলে বসিয়া কেমনে
মাতার এঘোর যাতনা সয়?

কোথায় আবার সতী সাধ্বীগণে
জানে না কিছুই অশ্রুপাত বিনে,
বৈধব্য-পীড়নে ব্যাকুল হইয়ে
নির্জ্জন কুটীরে কাঁদিছে বসিয়ে,
যে দারুণ শোক বালিকা-জীবনে
পশিয়া হরেছে সুখ আশা-ধনে
তবু যে বন্ধন কাটিতে নারে।

আবার কোথাও ভারত-ললনা
ভাবিছে নীরবে, সদা ক্ষুণ্ণমনা,
অধীনতা-পাশে আবদ্ধ সদাই,
ভাবিয়া সতত পাগলের প্রায়,
কিন্তু তাহাদের এহেন যাতনা
কয়জনে ভাবে? কেহ বা দেখে না
সদা আচ্ছাদিত ভয়, কুসংস্কারে।

অই যে আবার সজল নয়নে
ভারত-তনয় যুঝে দুঃখসনে,
নাহি ধন, মান, অশ্রু বিনা হায়!

কে হবে মা! বল, এখন সহায়
এঘোর দুর্দ্দিন বিপদ সময়,
কিন্তু কতকাল কাঁদিবে আর?
সাত শত বর্ষ ভাসে অশ্রুজলে,
থাকিয়া স্বদেশে বিদেশী-কবলে,
দেখিতে পারি না যাতনা তোমার
শুধু দুঃখ-অগ্নি ভারত মাঝার,
ফেটে যায় প্রাণ ভাবি সে কেলেশ
ভারতবাসীর দীন হীন বেশ,
আর যে পারি না ধরিতে হৃদয়,
ভাবি আমাদের কি ঘোর সময়,
জ্বলিছে কেবল অন্তর আমার॥

*Banerjee Press, 119, Old Boytakhana Bazar Road, Calcutta.*